হেমেন্দ্রকুমার রায়

রচনাবলী

হেমেন্দ্রকুমার রায়

রচনাবলী

২৫

সম্পাদনা

গীতা দত্ত

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
কলেজ স্ট্রিট মার্কেট ।। কলকাতা সাত

সূচিপত্র

জগৎশেঠের রত্নকুঠি

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

ঘটনার রহস্য

দোতলার বৈঠকখানা। আসনে আসীন দুই বন্ধু—ভাব যাদের গলায় গলায়। জয়ন্ত ও মানিকের কথা বলছি। চলছিল আলোচনা। সরকারি পুলিশের গোয়েন্দা-বিভাগের বিখ্যাত কর্মচারী সুন্দরবাবু সম্প্রতি 'পেনশন' নিয়েছেন, তাই নিয়েই আলোচনা।

মানিক মত প্রকাশ করলে, 'জয়ন্ত, এইবার আমাদের গোয়েন্দাগিরির শখ বোধহয় শিকেয় উঠল।'

জয়ন্ত বললে, 'কেন?'

—'আমাদের বেশির ভাগ মামলা আসত সুন্দরবাবুর মারফতেই। তিনি নিলেন অবকাশ, এখন আমাদের সে শখ কে মেটাবে?'

—'মেটাবে আমাদের খ্যাতি। তুমি কি ভেবেছ এতদিন ধরে আমরা কি কেবল ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়ালুম? মোটেই নয়, মোটেই নয়! শৌখিন হলেও দেশ আর দশের কাছে আমরা এখন অপরিচিত নই। পুলিশে সুন্দরবাবু না থাকলেও আমাদের অলস হয়ে বসে থাকতে হবে বলে মনে করি না। ওই শোনো! সিঁড়িতে কোনো বৃহৎ মূর্তির পদশব্দ! বোধহয় নাম করতেই সশরীরে সুন্দরবাবুর আবির্ভাব আসন্ন!'

ঠিক তাই! বিপুল ভুঁড়ির ভার নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ঘরে ঢুকেই সুন্দরবাবু হাঁপাতে হাঁপাতে একখানা চেয়ারের উপর ধুপ করে বসে পড়লেন এবং এই অনুচিত অতিরিক্ত ভারের বিরুদ্ধে চেয়ারখানা সশব্দে প্রতিবাদ করে উঠল!

মানিক সহাস্যে বললে, 'ভো সুন্দরবাবু! আপনার নাম করার সঙ্গে-সঙ্গেই আপনি নিজে আবির্ভূত হয়ে ইংরেজি প্রবাদটার সত্যতা প্রমাণিত করলেন!'

মানিকের রসনাকে সুন্দরবাবু বরাবরই ভয় করে আসছেন। সন্দিগ্ধস্বরে বললেন, 'হুম! কী প্রবাদ?'

'জানেন না? 'Talk of the devil and he will appear!' অর্থাৎ কিনা, দৈত্য-দানবের কথা তুললেই তার উদয় হয়!'

সুন্দরবাবু রেগে চোখ কটমট করে বললেন, 'শুনলে তো জয়ন্ত, শুনলে তো? তোমার নচ্ছার দুর্মুখ বন্ধুর কথা শুনলে তো? আমি ডেভিল?'

মানিক বললে, 'আহাহা, খামোকা খেপে যান কেন সুন্দরবাবু? 'ডেভিল'

বলতে কেবল ভূত, অসুর, শয়তান বোঝায় না, পাজি, নরপিশাচ, বিশ্বাসঘাতককেও ডেভিল বলে।'

সুন্দরবাবু রুদ্ধরোষে দুই হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করে বললেন, 'তাই নাকি? তাহলে তোমার মতে আমি ওর মধ্যে কোনটি?'

মানিক সুন্দরবাবুর নাগালের বাইরে সরে বসে বললে, 'আবার নতুন কৌঁসুলি বা ব্যারিস্টারকেও ডেভিল নামে ডাকা হয়। এক রকম খাবারেরও নাম ডেভিল, তাও তো আপনার জানা আছে?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'তোমাকে আর শেখাতে হবে না, ডেভিল আমি অনেক খেয়েছি, মাংসের পুর দেওয়া ডিমের কথা কে না জানে!'

মানিক বললে, 'উঁহু, সে ডেভিল নয়, এ হচ্ছে আর এক রকম খাবার, বোধহয় আপনি কখনও খাননি—আমাদের মধু রাঁধতে জানে।'

বরাবরের মতো আজও নতুন খাবারের নামে সুন্দরবাবুর ঘনীভূত ক্রোধ দ্রবীভূত হবার উপক্রম করলে। কারণ জয়ন্তদের খানসামা মধু যা রাঁধতে পারে, তিনিও যে তা ভোজন করতে পারেন, সে কথাটা ভোজনবিলাসী সুন্দরবাবুর অজানা ছিল না। বেশ-একটু নরম হয়ে তিনি বললেন, 'খাবারটা কী শুনি?'

—'খুব মশলা দেওয়া ভাজা মাংস বলতেও ডেভিল বোঝায়। খাসা খাবার। আস্বাদ নেবার ইচ্ছা আছে নাকি? মধুকে ডাকব?'

এরপর আর ক্রোধ প্রকাশ করা মনুষ্যোচিত নয়। সুন্দরবাবু বিগলিত কণ্ঠে বললেন, 'আহা, তা মন্দ কী?'

মানিক কত সহজে সুন্দরবাবুকে চটাতে ও পটাতে পারে তাই দেখে জয়ন্ত মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

এমন সময়ে মধুর প্রবেশ।

সুন্দরবাবু আহ্লাদিত কণ্ঠে বলে উঠলেন—'এই যে মধু! ঠিক সময়েই এসেছ হে—স্বাগত, স্বাগত!'

এমন অভাবিত অভ্যর্থনার কারণ বুঝতে না পেরে মধু জিজ্ঞাসু চোখে জয়ন্তের দিকে তাকালে।

জয়ন্ত বললে, 'মধু, তোমাকে দেখে সুন্দরবাবু বলছেন—স্বাগত, অর্থাৎ তোমার আগমন শুভ হোক। কেন, তা শুনতে চাও?'

মধু বললে, 'তা শুনব না কেন? কিন্তু তার আগে বলে রাখি, একটি ছোকরাবাবু আপনার সঙ্গে জরুরি দরকারে দেখা করতে এসেছেন।'

—'ছোকরাবাবু? জরুরি দরকারে? কোথায়?'

—'নীচেয়। মস্ত একখানা মোটরগাড়ি করে এসেছেন। বড়োলোকের ছেলে—জামায় মুক্তোর বোতাম, হাতে সোনার ঘড়ি, আঙুলে সোনার আংটি।'

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, 'শ্রীমধুসূদন, একনজরেই এতটা লক্ষ করে ফেলেছ? আমাদের সহবাসে তুমিও একটি ক্ষুদ্র গোয়েন্দা হয়ে উঠেছ দেখছি। যাও, বাবুটিকে উপরে পাঠিয়ে দাও।'

মধুর প্রস্থান। মানিকের মুখের পানে সুন্দরবাবুর হতাশভাবে দৃষ্টিপাত।

মানিক আশ্বাস দিয়ে বললে, 'মাভৈঃ! মধু তো বাড়ি ছেড়ে পলায়ন করছে না, যথাসময়েই আমাদের আরজি পেশ করব।'

ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে একটি সুবেশী সুশ্রী যুবক, তার বয়স বাইশ-তেইশের বেশি হবে না, চোখের সপ্রতিভ দৃষ্টি দেখলেই বোঝা যায়, জনতার ভিতরেও সে নিজের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে।

দরজার কাছে দাঁড়িয়েই যুক্তকরে নমস্কার করে সে বললে, 'আমি জয়ন্তবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

জয়ন্ত বললে, 'আমিই জয়ন্ত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আপনার পরিচয় জানবার সুযোগ আমার হয়নি।'

যুবক বললে, 'আপনি চন্দ্রনাথ অ্যান্ড কোম্পানির নাম শুনেছেন?'

—'শুনেছি বই কি! বিখ্যাত চা-ব্যবসায়ীর প্রতিষ্ঠান।'

—'কেবল চা নয়, আমাদের প্রতিষ্ঠান আরও অনেক কিছু নিয়ে কারবার করে। চন্দ্রনাথ আমার ঠাকুরদার নাম। বর্তমানে আমি সেই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম মালিক। আমার নাম বীরেন্দ্রকুমার বাগচি।'

—'বসুন বীরেনবাবু। আপনি আমার কাছে এসেছেন কেন?'

—'গোলকধাঁধায় পড়ে।'

—'কী রকম?'

—'আমাদের বাড়িতে হঠাৎ এমন একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছে, যার মধ্যে অর্থ বা অনর্থ কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না। অথচ বেশ বুঝতে পারছি যে এর সঙ্গে আছে কোনো বিচিত্র রহস্যের সম্পর্ক!'

জয়ন্ত বললে, 'বীরেনবাবু, আপনি আমার কৌতূহলকে উদ্দীপ্ত করে তুললেন। বোঝা যাচ্ছে, যে ঘটনার কথা উল্লেখ করলেন তা খুন বা ডাকাতি বা চুরি-চামারি নয়, কারণ ওদের মধ্যে অর্থ আর অনর্থ দুইই থাকে। কিন্তু রহস্যের সম্পর্কটা কোথায়, বুঝতে পারছি না।'

বীরেন মাথা নেড়ে বললে, 'আমিও পারছি না। তাই তো বললুম আমি

গোলকধাঁধায় পড়েছি। শোনা আছে ধাঁধার জবাব দেওয়া আপনার পেশা—'

জয়ন্ত বাধা দিয়ে বললে, 'ভুল বীরেনবাবু, ভুল! ধাঁধার জবাব দেওয়া আমার পেশা নয়, আমার নেশা—অর্থাৎ আমার শখ!'

—'বেশ, তাই! ভ্রম-সংশোধনের জন্যে ধন্যবাদ। এখন দয়া করে আমার কথা শুনবেন কি?'

—'নিশ্চয়ই! দয়া না করেও শুনব। বলুন আপনার কাহিনি।'

বীরেন চেয়ারের উপরে নড়েচড়ে ভালো করে বসে তার কাহিনি শুরু করলে:

'কারবারের জন্যে আমাকে কলকাতাতেই বাস করতে হয় বটে, কিন্তু আমার পৈতৃক বসতবাড়ি বা বাস্তুভিটা আছে মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জের অনতিদূরে। নবাবি আমলে তৈরি সেকেলে মস্তবড়ো বাড়ি, এখন সংস্কার অভাবে সদরমহল ছাড়া প্রায় সবটাই অব্যবহার্য হয়ে পড়ে আছে। কালেভদ্রে আমাদের কারুর দেশে যাবার শখ হলে কেবল সদরমহলটাই ব্যবহার করা হয়, কাজেই সেদিকটায় মাঝে মাঝে রাজমিস্ত্রিদের হাত পড়ে। অন্য সময়ে সদরমহলও তালাবন্ধ থাকে। বাড়িখানা স্থানীয় এক ভদ্রলোকের জিম্মায় আছে—সম্পর্কে তিনিও আমাদের কুটুম্ব।

দিনদশেক আগে যদুনাথ বসু নামে এক ভদ্রলোক কলকাতার আপিসে আমার সঙ্গে দেখা করে জানালেন, মাসতিনেকের জন্যে তিনি আমাদের দেশের বাড়ি ভাড়া নিতে চান।

আমি রাজি হলুম না। কিন্তু যদুবাবু অতিশয় জেদাজেদি করতে লাগলেন। বললেন তিনি মাসিক পাঁচ শত টাকা হিসাবে তিন মাসের দেড় হাজার টাকার অগ্রিম ভাড়া আমার হাতে জমা দিতে প্রস্তুত আছেন।

আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, পাড়াগাঁয়ে একখানা সেকেলে বাড়ির জন্যে তিনি এত টাকা ভাড়া দিতে চান কেন?

তখন তাঁর মুখ থেকেই জানতে পারলুম, তিনি হচ্ছেন পূর্ববঙ্গের জমিদার। চিকিৎসার জন্যে রুগ্‌ণ মাকে নিয়ে কলকাতায় এসেছেন। চিকিৎসকরা পরামর্শ দিয়েছেন, মাকে নিয়ে যেতে মফস্‌সলের গঙ্গার ধারে কোনো জায়গায়।

আমাদের বাড়ি মুর্শিদাবাদের গঙ্গাতীরে বটে, কিন্তু যুক্তিটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা মনে হল। কলকাতার আরও কাছে গঙ্গার ধারে তো কত ভালো ভালো বাড়ি রয়েছে। যাক, এসব নিয়ে আমি আর বেশি মাথা ঘামালুম না। এই লোভনীয় প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলুম। যদুবাবু আমাকে দেড় হাজার টাকার একখানা চেক দিয়ে বাড়ি ভাড়া নিয়ে চলে গেলেন।

সেইদিনই সন্ধ্যার সময়ে আর এক ব্যাপার! একখানা বেনামা চিঠি পেলুম। তাতে জানানো হয়েছে: প্রতাপ চৌধুরিকে যেন মুর্শিদাবাদের বাড়ি ভাড়া দেওয়া না হয়, সে সাংঘাতিক লোক।

সবিস্ময়ে ভাবতে লাগলুম, বাড়ি ভাড়া নিয়েছে তো যদুনাথ বসু, কিন্তু কে প্রতাপ চৌধুরি? আর এই বেনামা চিঠিই বা কে লিখলে? কেন লিখলে? আমি যে বাড়ি ভাড়া দিচ্ছি, এ কথাই বা সে কেমন করে জানতে পারলে?

তিন দিন পরে বিস্ময়ের উপরে বিস্ময়! যেদিন চেক পেয়েছিলুম তার পরদিন থেকেই দুর্গাপূজার জন্যে ব্যাংক বন্ধ ছিল, চেক ভাঙাতে পারিনি। ব্যাংক খুললে পর জানতে পারলুম আমাকে একখানা ভুয়ো চেক দেওয়া হয়েছে, যদুনাথ বসুর নামে ব্যাংকে এক পয়সাও জমা নেই!

এভাবে ঠকে রেগে আগুন হয়ে আমি দেশে রওনা হলুম। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখলুম আমাদের বসতবাড়িতে জনপ্রাণী নেই। শুনলুম কয়েকজন গুন্ডার মতো লোক সেখানে দু-দিন ধরে খুব হইহল্লা করে আবার কখন সরে পড়েছে কেউ তা জানে না।

বাড়ির একটা তালাবন্ধ ঘরে ঠাকুরদার আমলের কতকগুলো আসবাবপত্তর একালে অব্যবহার্য বলে গুদামজাত করা ছিল। সেই সঙ্গে একটা দেয়ালের সঙ্গে গাঁথা প্রকাণ্ড আলমারির ভিতরে ছিল একগাদা সেকেলে কেতাব ও কাগজপত্র। কারা তালা ভেঙে সেই ঘরে ঢুকে কেতাব ও কাগজপত্রগুলো বার করে ঘরময় ছড়িয়ে ফেলে রেখে গিয়েছে! নিশ্চয় যদুদেরই কীর্তি!

ঠাকুরদার হাতে লেখা একখানা ছেঁড়া খাতাও পেয়েছি। তাতেও সব অদ্ভুত কথা লেখা! বোধহয় ঠাকুরদার গল্প-টল্প লেখার অভ্যাস ছিল! খালি গল্প নয় পদ্যও!'

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

নরকঙ্কাল ও ভীষণ গর্জন

বীরেন চুপ করলে। জয়ন্তও স্তব্ধ হয়ে ভাবতে লাগল।

সুন্দরবাবু বললেন, 'ভারী গোলমেলে ব্যাপার তো! খামোকা যদু নামধেয় ব্যক্তির আবির্ভাব, অকারণে দেড় হাজার টাকা অগ্রিম দাদন দিয়ে তিন মাসের জন্যে একখানা পাড়াগাঁয়ে সেকেলে বাড়ি ভাড়া নেওয়া, ভুয়ো চেক ঘাড়ে

চাপানো, তারপর দু-দিন সেই বাড়িতে কাটিয়েই ফুড়ুৎ করে হঠাৎ পলায়ন, এ সবই যেন মহা পাগলামির কাণ্ড! বীরেনবাবু, আপনি কোনো আস্ত পাগলের পাল্লায় পড়েছিলেন, এ নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ে সময় নষ্ট করবেন না।'

মানিক বললে, 'কিন্তু আমার মন কেমন খুঁত খুঁত করছে! সন্দেহ হচ্ছে এত সহজে ব্যাপারটা বোধহয় উড়িয়ে দেওয়া যায় না।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কেন, তোমার সন্দেহের কারণ কী?'

—'যদুর দল তালা ভেঙে বাড়ির বন্ধ ঘরে ঢুকেছিল কেন? আলমারি থেকে কেতাবগুলো টেনে বার করেছিল কেন? নিশ্চয় তারা কিছু খুঁজছিল!'

জয়ন্ত বললে, 'আমিও মানিকের কথায় সায় দি। যদু আলমারির ভিতরে হস্তচালনা করেছিল একটা কিছু খোঁজবার জন্যেই। কেবল আলমারি কেন, খুব সম্ভব সে বাড়ির অন্যান্য ঘরেও খোঁজাখুঁজি করতে ছাড়েনি।'

বীরেন বললে, 'কিন্তু বাড়ির অন্যান্য ঘরে এমন কিছুই ছিল না, যা দেখে চোরের লোভ হতে পারে। আলমারির বইগুলো নিয়ে ছেলেবেলায় আমিও ঘাঁটাঘাঁটি করেছি। তার মধ্যে ছিল বটতলায় ছাপা কতকগুলো সেকেলে বই— আরব্য উপন্যাস, পারস্য উপন্যাস, চাহার দরবেশ, উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্তকথা প্রভৃতির সঙ্গে রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত আর ওই শ্রেণির অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ আর তাড়া তাড়া বাজে কাগজপত্র। ব্যাস, আর কিছুই নয়!'

জয়ন্ত বললে, 'ওই সঙ্গে আপনার ঠাকুরদার নিজের হাতে লেখা একখানা খাতাও ছিল বললেন না?'

—'হ্যাঁ, ছিল। ছেলেবেলায় সেকেলে জড়ানো হাতের লেখা পড়বার আগ্রহ হয়নি, সম্প্রতি পড়ে দেখেছি। খাপছাড়া খোশগল্প ছাড়া আর কিছুই নয়। সম্প্রতি আরও একটা জিনিস লক্ষ করেছি। খাতাখানা আগে ছেঁড়া ছিল না, এখন দেখছি মাঝখান থেকে একখানা কাগজ কে ছিঁড়ে নিয়েছে।'

—'কী করে বুঝলেন?'

—'পত্রাঙ্ক দেখে।'

জয়ন্ত বললে, 'সন্দেহজনক, সন্দেহজনক! বীরেনবাবু, খাতাখানা একবার দেখতে পেলে ভালো হত।'

নিজের হাতব্যাগের মধ্যে হস্তচালনা করে বীরেন বললে, 'অনায়াসেই দেখতে পারেন। যদি কাজে লাগে এই ভেবে সে খানা আমি সঙ্গে করেই এনেছি'—এই বলে এক্সারসাইজ বুকের আকারে বাঁধানো একখানা পাতলা খাতা বার করে জয়ন্তের হাতে সমর্পণ করলে।

জয়ন্ত খাতাখানা খুলে আগাগোড়া পাতা উলটে প্রথমে ভাসা ভাসা চোখ বুলিয়ে গেল। টানা টানা জড়ানো লেখা, কিছু কষ্ট করে পড়তে হয়। সে বললে, 'দ্যাখো মানিক, ৪০ পত্রাঙ্কে খাতা শেষ। বিষয়বস্তু দেখছি পাঁচ অংশে বিভক্ত। প্রথমে গৌরচন্দ্রিকা বা ভূমিকার মতো একটুখানি অংশ। তার পরের অংশের নাম দেওয়া হয়েছে 'আভাস'। তৃতীয় অংশে কী ছিল জানবার উপায় নেই, ২১ থেকে ২৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে। চতুর্থ অংশের নাম 'ইতিহাস'। পঞ্চম অংশে 'উপসংহার'—একটি পুঁচকে পদ্য বা ছড়া। এখন আগে ভূমিকাটুকু শোনো।'

জয়ন্ত পড়তে লাগল:

'যেখানে ঘটনাক্ষেত্র, তার নাম এখানে বলব না, লেখায় প্রকাশ করলে গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা। আমার সঙ্গী কৈলাস চৌধুরি এখন পরলোকে বটে, কিন্তু তার কুচরিত্র পুত্র ইহলোকে বিদ্যমান থেকে কেমন করে কিছু আভাস পেয়ে আমাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তুলেছে, এমনকি আমাকে ভয় দেখাতেও ছাড়ছে না। আমার একমাত্র ইচ্ছা, সমস্ত গুপ্তকথা জানবে কেবল আমার পুত্র। যদি সে কখনও অভাবে পড়ে, এই গুপ্তকথা তার কাজে লাগবে, তার দুশ্চিন্তা দূর করবে। অন্তিমকাল উপস্থিত হলে সমস্ত গুপ্তকথাই তার কাছে ব্যক্ত করব। যদি সে সময় না পাই, তাহলেও আমার বিশেষ ভাবনার কারণ নেই। আমার পুত্র বুদ্ধিমান, তার জন্যেই তোলা রইল এই খাতাখানা। এই বিবরণ মন দিয়ে পাঠ করলেই সমস্ত রহস্য সে সমাধান করতে পারবে।'

পড়া থামিয়ে জয়ন্ত শুধোলে, 'বীরেনবাবু, আপনার ঠাকুরদাকে আপনি দেখেছেন?'

—'আমার বয়স পাঁচ বৎসর পূর্ণ হবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁকে ছায়া ছায়া মনে পড়ে মাত্র।'

—'আপনার বাবার মুখে আপনি এই খাতাখানার কথা শোনেননি?'

বীরেন সকৌতুকে হেসে উঠে বললে, 'বাবা? আমার বাবা পড়বেন গল্পের পাণ্ডুলিপি? মশাই, বাবাকে আমি জীবনে কোনো ছাপানো নভেলের পাতাই ওলটাতে দেখিনি! নিজের কারবারের বাইরে আর কোনো কথাই তাঁর মনে ঠাঁই পেত না।'

জয়ন্ত আবার কিছুক্ষণ ধরে চুপ করে কী ভাবতে লাগল। তারপর বললে, 'আচ্ছা বীরেনবাবু, আপনার ঠাকুরদা মৃত্যুর আগে বা মৃত্যুশয্যায় আপনার বাবাকে এই খাতা সম্বন্ধে কোনো কথা বলে যাননি?'

সজোরে মাথা নেড়ে বীরেন বললে, 'কিছু না, কিছু না। মশাই, ওই খাতার ভিতরে ঠাকুরদার নিজের কোনো কথাই নেই, ওর সবটাই হচ্ছে ডাহা গালগল্প। আর মৃত্যুশয্যায় ঠাকুরদা কোনো কথা বলে যাবেন কী, মরবার সময়ে তিনি কোনো কথা বলবার অবসরই পাননি।'

—'তার মানে?'

—'তার মানে হচ্ছে, ঠাকুরদা তাস খেলতে খেলতে হঠাৎ বুকের অসুখে মারা পড়েছিলেন। খেলার আসর থেকে তুলে তাঁর মৃতদেহকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়।'

জয়ন্ত নিজের রুপোর শামুকদানি থেকে একটিপ নস্য নিয়ে খুশি গলায় বললে, 'খানিকটা আবছা কাটল বলে মনে হচ্ছে। হৃদরোগে হঠাৎ মৃত্যু, কোনো কথা বলাই সম্ভব হয়নি—বটে, বটে, বটে!'

বীরেন কৌতূহলী কণ্ঠে বললে, 'আপনি কী বলতে চান জয়ন্তবাবু?'

জয়ন্ত হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললে, 'আপাতত আপনার কৌতূহল চরিতার্থ করবার সময় হয়নি। এখন খাতার দ্বিতীয় অংশে কী 'আভাস' পাওয়া যায় দেখা যাক।' সে আবার পাঠ শুরু করলে:

'বাল্যকালে আমার জীবনে ঘটেছিল একটি স্মরণীয় ঘটনা।

প্রতিবেশীদের মধ্যে আমার সবচেয়ে দহরম-মহরম ছিল কৈলাস চৌধুরির সঙ্গে। সে ছিল আমার নিত্যসঙ্গী—খেলাধুলায় ও আহারে-বিহারে আমরা সর্বদাই মানিকজোড়ের মতো একসঙ্গে থাকবার চেষ্টা করতুম।

কৈলাসের সঙ্গে একবার তার মাতুলালয়ে বেড়াতে গেলুম। জায়গাটা আমাদের বাড়ি থেকে দশ-বারো মাইল তফাতে। সেখানে আমরা হাটে-বাটে-মাঠে ছুটোছুটি করে, মার্বেল-ডাংগুলি খেলে ও গঙ্গার এপারে-ওপারে সাঁতার কেটে তিন দিন কাটিয়ে দিলুম মহা আনন্দে। তারপরেই ঘটল পূর্বোক্ত ঘটনা।

গাঁয়ের প্রান্তে একটা মাঠে একদল ছেলে ফুটবল খেলছিল। এ দেশে ফুটবল খেলার রেওয়াজ তখন নতুন শুরু হয়েছে। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সাগ্রহে খেলা দেখতে লাগলুম।

হঠাৎ এক বিপত্তি! মাঠের একদিকে গঙ্গাতীরে ছিল একখানা ভাঙাচোরা পোড়ো বাগানবাড়ি। এবং তার পিছনে ছিল একটা জলশূন্য পুরানো ইঁদারা। ফুটবলটা ঝুপ করে গিয়ে পড়ল একেবারে সেই ইঁদারার ভিতরে।

তখন আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল চতুর্দিক। ইঁদারার ভিতরে নজর চলে না। ছেলের দল খানিক হইচই করে মাঠ ছেড়ে চলে গেল।

আমি বললুম, 'কৈলাস, বলের জন্যে ওরা কাল সকালে নিশ্চয় আবার ফিরে আসবে। কিন্তু তার আগে আমরাই আজ কুয়োয় নেমে বলটাকে তুলে আনব।'

কৈলাস শিউরে উঠে বললে, 'বাপ রে, এই অন্ধকারে? পাগল নাকি?'

চিরকালই সবাই আমাকে ডানপিটে ও বেপরোয়া বলে জানে। আমি কিন্তু একটুও দমলুম না, বললুম, 'বেশ তোকে কুয়োয় নামতে হবে না, তুই খালি খানিকটা মোটা দড়ি আর একটা দেশলাই জোগাড় করে আন দেখি! তুই কেবল উপরে দাঁড়িয়ে থাকবি, কুয়োর ভিতরে নামব একলা আমিই। ফাঁকতালে একটা আস্ত ফুটবল লাভ, এমন সুযোগ ছাড়তে আছে!'

যেমন কথা, তেমনি কাজ। এল দড়ি ও দেশলাই। ভরসন্ধ্যাবেলায় দড়ি বেয়ে নেমে গেলুম ইঁদারার গহ্বরে।

ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। পায়ের তলায় কী কতকগুলো খড়মড় খড়মড় করে উঠল। দেশলাইয়ের প্রথম কাঠি জ্বেলে কেবল এইটুকু দেখলুম, ইঁদারার গায়ে গাঁথা রয়েছে একজোড়া হাতলওয়ালা লোহার দরজা। তারপর কাঠি নিবে গেল।

দ্বিতীয় কাঠি জ্বেলে নীচের দিকে তাকিয়েই সচমকে দেখি কতকগুলো মাংসহীন নরকঙ্কাল পড়ে রয়েছে আমার পায়ের তলায়। তারপর আলো নেবার সঙ্গে সঙ্গেই শুনলুম যেন কোনো অপার্থিব বিভীষণের মারাত্মক ফোঁসফোঁসানি!

সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। মনে হল পরমুহূর্তেই সেই ভয়াবহ বিষাক্ত হিস হিস শব্দ যেন আমার চোখের সামনেই মূর্তিমান হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে! কর্পূরের মতো উবে গেল আমার সমস্ত সাহস, দারুণ আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে প্রাণপণে দড়ি ধরে কোনোরকমে উপরে এসে উঠলুম।

সব শুনে কৈলাস চোখ কপালে তুলে বললে, 'চুলোয় যাক ফুটবল! ওখানে আছে গুপ্তধন আর যকের পাহারা! গুপ্তধনের লোভে ওখানে গিয়ে যকের হাতে যারা মারা পড়েছে, তুই দেখেছিস তাদেরই কঙ্কাল!'

॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥

জগৎশেঠের গুপ্তধন

জয়ন্ত বললে, 'খাতার দ্বিতীয় অংশ শেষ হল। তৃতীয় অংশ আমাদের হাতে নেই। চতুর্থ অংশের নাম 'ইতিহাস'। এইবারে সেটুকু পাঠ করা যাক।'

আবার পড়া শুরু হল:

'সারা পৃথিবীকে যিনি ঋণদান করতে পারেন, তাঁরই উপযোগী উপাধি হচ্ছে 'জগৎশেঠ'। দিল্লির সম্রাট মহম্মদ শাহ ১৭২৪ খ্রিস্টাব্দে ওই উপাধি দিয়েছিলেন মুর্শিদাবাদের মহাজন ফতেচাঁদকে।

কিন্তু ফতেচাঁদ মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা হলেও বাঙালি ছিলেন না। তাঁর পূর্বপুরুষ হিরানন্দ শাহা সুদূর রাজস্থান থেকে পাটনায় এসে ব্যবসায় শুরু করেন এবং তেজারতি কারবারে প্রভূত সম্পত্তির মালিক হন।

হিরানন্দের সাত ছেলে। তাঁদের একজনের নাম মানিকচাঁদ। তিনি স্বাধীনভাবে ব্যাবসা করবার জন্যে বাংলার তখনকার রাজধানী ঢাকায় গিয়ে হাজির হন এবং নবাব-দরবারে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। পরে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ পশ্চিমবঙ্গে এসে ভাগীরথীতটে নতুন রাজধানী স্থাপন করে নিজের নামানুসারে তার নাম রাখেন মুর্শিদাবাদ। নবাবের প্রিয়পাত্র মানিকচাঁদও নতুন রাজধানীতে এলেন। নবাব-দরবারে তাঁর প্রভাব ক্রমেই বেড়ে উঠতে থাকে। তাঁর পরামর্শে মুর্শিদাবাদে নবাবি টাঁকশাল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনি হন নবাবের অর্থসচিব ও কোষাধ্যক্ষ। ১৭১৫ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির বাদশাহ তাঁকে 'শেঠ' উপাধি দান করেন।

এই মানিকচাঁদের বংশধররা পরে কেবল নবাব-বংশের নয়, স্বাধীন বাংলা দেশেরও উত্থান ও পতনের অন্যতম কারণরূপে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

মানিকচাঁদ ছিলেন অপুত্রক। ভ্রাতুষ্পুত্র ফতেচাঁদ হন তাঁর দত্তকপুত্র। তিনি দিল্লিতে থেকে অংশীদাররূপে কারবার দেখতেন। কিন্তু ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে মানিকচাঁদের মৃত্যু হলে তিনিও মুর্শিদাবাদে চলে আসেন। এর দুই বৎসর পরেই তিনি জগৎশেঠরূপে ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে ধনিক বা পুঁজিপতি বলে সুপরিচিত হন।

মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যুর (১৭২৭ খ্রিঃ) পর সুজাউদ্দিন নবাব হয়ে ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এই সময়টাই হচ্ছে জগৎশেঠ ফতেচাঁদের জীবনে সবচেয়ে গৌরব ও সৌভাগ্যের যুগ। তিনি কেবল সুবিপুল ধনাগারের অধিকারী ছিলেন না, নবাব-দরবারে ও দেশ-বিদেশে তাঁর সম্মান, খ্যাতি ও প্রতিপত্তিও ছিল অতুলনীয়। কিন্তু সুজাউদ্দিনের মৃত্যুর পর ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে সরফরাজ খাঁর সিংহাসন লাভের সঙ্গে সঙ্গেই জগৎশেঠকে প্রথম ষড়যন্ত্রে যোগ দিতে হল।

তরুণ নবাব সরফরাজ ফতেচাঁদের পুত্রবধূর অসীম রূপলাবণ্যের কথা শুনে নির্বোধের মতো তাঁকে স্বচক্ষে দেখবার বাসনা প্রকাশ করলেন,—এটুকু তাঁর খেয়াল এল না যে, হিন্দুদের অসূর্যম্পশ্যা কুলললনার পক্ষে সেটা হচ্ছে অতিশয় অপমানকর প্রস্তাব!

ফতেচাঁদ ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে আলিবর্দি খাঁয়ের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন এবং তার ফলে গিরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে সরফরাজের মৃত্যু ও ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে আলিবর্দির সিংহাসনপ্রাপ্তি।

এই ঘটনার চার বৎসর পরে ফতেচাঁদ ইহলোক ত্যাগ করলেন। তাঁর দুই পৌত্র—মাধব রায় ও স্বরূপচাঁদ। মাধব রায় জগৎশেঠ উপাধির সঙ্গে বেশির ভাগ সম্পত্তির অধিকারী হলেন এবং বাকি সম্পত্তির সঙ্গে স্বরূপচাঁদ নবাব-দরবার থেকে পেলেন 'রাজা' উপাধি। বাংলা দেশে তখন ইংরেজ ও ফরাসিরাও প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করছিলেন, সুচতুর জগৎশেঠরা তাঁদেরও লক্ষ লক্ষ টাকা ধার দিয়ে তুষ্ট রাখতে ভুললেন না। এইভাবে সব দিক সামলে ব্যাবসা চালিয়ে তাঁরা দিনে দিনে অধিকতর আর্থিক উন্নতির পথে এগিয়ে চললেন।

তারপরেই আলিবর্দির মৃত্যু ও ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে সিরাজের সিংহাসন লাভ এবং তাঁর সঙ্গে জগৎশেঠের বিরোধ। নূতন নবাবের কাছে অপমান ও লাঞ্ছনা লাভ করে জগৎশেঠ আবার মীরজাফর ও ইংরেজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। ফল, পলাশির যুদ্ধ ও সিরাজের পতন এবং বাংলার সর্বনাশ।

জগৎশেঠরা আবার পূর্বগৌরবের পদে উন্নীত হয়ে নিজেদের স্বর্ণভাণ্ডারের পরিধি আরও বাড়িয়ে তুললেন বটে, কিন্তু তখনই ভিতরে ভিতরে তাঁদের উপরে শনির দৃষ্টি পড়তে শুরু হল। তারপর অকর্মণ্য মীরজাফরকে বঞ্চিত করে ইংরেজরা ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে রাজ্যের ভার অর্পণ করলেন মীরকাশিমের হস্তে। নতুন নবাবকে নিয়ে জগৎশেঠরা সুখী হতে পারলেন না, তাঁরা আবার চক্রান্তে যোগ দিলেন। কিন্তু এবারে তাঁরা আর শেষ রক্ষা করতে ও নিয়তিকে ফাঁকি দিতে পারলেন না, বিপদ ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে উঠছে দেখে মীরকাশিম তাঁদের বন্দি করে ফেললেন (১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে)। তাঁদের বন্ধু ইংরেজদের বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁরা আর মুক্তিলাভ করতে পারলেন না।

তারপর উদয়নালার যুদ্ধ; মীরকাশিমের পরাজয় এবং জগৎশেঠ ও অন্যান্য বন্দিদের নিয়ে মীরকাশিমের মুঙ্গেরে প্রস্থান; বক্সারের যুদ্ধ; মীরকাশিমের শেষ পরাজয় (১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে) এবং জগৎশেঠ প্রভৃতিকে গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করে হত্যা।

মীরজাফর আবার বাংলার নবাব হন এবং নতুন জগৎশেঠ কুশলচাঁদও (নিহত জগৎশেঠ মাধব রায়ের বড়োছেলে) আবার ব্যবসায়ে নিযুক্ত হন। তিনিও ইংরেজদের কাছ থেকে প্রচুর সাহায্য লাভ করেও শেঠবংশের পূর্বগরিমা আর ফিরিয়ে আনতে পারেননি। বাংলার ভুয়ো নবাবির সঙ্গে জগৎশেঠদেরও জাঁকজমক

ম্লান হয়ে এসেছিল, বাংলার স্বাধীনতাহরণে সাহায্য করে তাঁরাও আত্মরক্ষা করতে পারলেন না।

বুদ্ধিমান কুশলচাঁদ বুঝে নিয়েছিলেন যে, জগৎশেঠদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল নয়—তাঁদের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। দুঃসময়ের জন্যে তিনি প্রস্তুত হতে লাগলেন।

তাঁর আদেশে একটি গুপ্তকুঠি নির্মিত হল এবং নিজের সম্পত্তির কতক অংশ তিনি সেইখানে লুকিয়ে রাখলেন।

সেই রত্নকুঠির কাহিনি আজও লোকের মুখে মুখে ফেরে, কিন্তু তার ঠিকানা কেউ জানে না। কুশলচাঁদ হঠাৎ মারা পড়েন, তাই গুপ্তধনের সন্ধান নিজের উত্তরাধিকারীর কাছে দিয়ে যেতে পারেননি।

শেষ পর্যন্ত কুশলচাঁদ যা ভয় করেছিলেন তাই সত্য হয়ে দাঁড়ায়। ক্রমেই শেঠদের অর্থ ও প্রতিপত্তি কমে এলেও কুশলচাঁদের মৃত্যুর পর আরও দুইজন জগৎশেঠের নাম শোনা যায়—হারেকচাঁদ ও ইন্দ্রচাঁদ।

ইন্দ্রচাঁদের পুত্র গোবিন্দচাঁদ 'জগৎশেঠ' উপাধি থেকেও বঞ্চিত হন এবং পিতার সম্পত্তিও বোকার মতো দুই হাতে উড়িয়ে দিয়ে ইংরেজের অন্নদাসরূপে শেষ-জীবন কাটাতে বাধ্য হন। তাঁর পুত্র কৃষ্ণদাসকেও দেশদ্রোহী জগৎশেঠদের কাছে উপকৃত ইংরেজরা বৃত্তি দান করতেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর সে বৃত্তিও বন্ধ হয়।

জগৎশেঠের আধুনিক বংশধররাও মুর্শিদাবাদে বাস করেন, কিন্তু লুপ্ত হয়েছে তাঁদের আর্থিক গৌরব। হয়তো তাঁরাও প্রবাদে গুপ্তধনের কাহিনি শ্রবণ করেন, কিন্তু তার সত্যতা নিরূপণ করবার উপায় তাঁদের হাতে নেই—আবিষ্কার করতে পারলে এখন এ গুপ্তধনের মালিক হবে যে কোনো ব্যক্তি।'

জয়ন্তের পাঠ সাঙ্গ হল। কিছুক্ষণ নীরবতার পর সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম! সব তো শোনা হল! খানিকটা ভণিতা, খানিকটা গালগল্প, খানিকটা গাঁজা-মেশানো ইতিহাস! বীরেনবাবু ঠিকই ধরেছেন—তাঁর ঠাকুরদার গল্প বানানোর অভ্যাস ছিল!'

জয়ন্ত বললে, 'উপসংহারে একটি পদ্যও আছে, সেটাও চেঁচিয়ে পড়া যাক!' বলে সে পড়তে লাগল:

বোকায় ধোঁকা দেবার তরে বুদ্ধিসাগর মন্থি'
গোলকধাঁধার গ্রন্থ রচি আমি নতুন গ্রন্থী।
কিন্তু আমি ঠিক জানি তাই,
গুপ্তপথে রপ্ত সবাই!
সর্বজনের সামনে লুকোয় সহজ পথের পন্থী।

বিন্দু বারি সিন্ধু হলে যায় না দেখা বিন্দুকে,
ইন্দু আছে মেঘের আড়ে, নিন্দে তবু নিন্দুকে।
মানসনয়ন যে খুলে চায়
সত্য মানিক সেই খুঁজে পায়,
মূর্খ শুধু রত্ন খোঁজে মস্ত লোহার সিন্দুকে!

সুন্দরবাবু চোখ পাকিয়ে বললেন, 'এ যে বাবা দস্তুরমতো হেঁয়ালি!'

বীরেন বললে, 'প্রায় অতি-আধুনিক কবিতার মতো!'

মানিক বললে, 'খাপছাড়া পদ্য-টদ্য নিয়ে আপাতত মাথা ঘামাবার দরকার নেই। জয়ন্ত, তুমি কী মনে করো, বীরেনবাবুর দেশের বাড়িতে যে রহস্যময় ঘটনা ঘটেছে, তার সঙ্গে এই খাতার লেখার কোনো সম্পর্ক আছে?'

জয়ন্ত বললে, 'এইবারে তাই নিয়েই আলোচনা করতে হবে।'

মধু একখানা খাম হাতে করে ঘরে ঢুকে বললে, 'বাবু, একটা অদ্ভুত লোক এসে আপনার নামে এই চিঠিখানা দিয়ে গেল।'

—'অদ্ভুত লোক?'

—'হ্যাঁ বাবু। পরনে সন্ন্যাসীর মতো গেরুয়া কাপড়, মাথায় জটা, একমুখ দাড়িগোঁফ!'

জয়ন্ত খাম ছিঁড়ে চিঠিখানা পড়েই লাফ মেরে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'কোথায় সে?'

—'বাবু, চিঠিখানা আমার হাতে গুঁজে দিয়েই সে হনহন করে চলে গেল!'

চিঠিতে কেবল লেখা ছিল, 'সাবধান, সাবধান,—সাক্ষাৎ-শয়তান প্রতাপ চৌধুরিকে সাবধান।'

॥ চতুর্থ অধ্যায় ॥

কে প্রতাপ চৌধুরি?

মানিক বললে, 'কী আশ্চর্য! কে এই সাক্ষাৎ-শয়তান প্রতাপ চৌধুরি? বার বার তার কথা তুলে আমাদের সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে কেন?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আরও একটা অদ্ভুত প্রশ্ন হচ্ছে, কে এই অদ্ভুত লোকটা? পরনে সন্ন্যাসীর মতো গেরুয়া কাপড়, মাথায় জটা, একমুখ দাড়িগোঁফ!'

বীরেন বললে, 'আমার বিশ্বাস, এই লোকটাই বেনামা চিঠি লিখে আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল!'

জয়ন্ত বললে, 'এই গেরুয়াবস্ত্রধারী রহস্যময় লোকটা কে তা জানি না, কিন্তু প্রতাপ চৌধুরি সম্বন্ধে হয়তো কিছু আন্দাজ করতে পারি।'

বীরেন বললে, 'পারেন নাকি?'

—'হ্যাঁ। আমার আন্দাজ হয়তো মিথ্যা নয়। আপনার ঠাকুরদা চন্দ্রনাথবাবুর লেখা পড়ে আমরা জেনেছি যে, তিনি যখন ইঁদারায় নেমেছিলেন তখন তাঁর সঙ্গী ছিলেন কৈলাস চৌধুরি। আর এক জায়গায় তিনি বলছেন, কৈলাস চৌধুরির কুচরিত্র পুত্র গুপ্তরহস্যের আভাস পেয়ে তাঁকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করছে আর ভয় দেখাচ্ছে। খুব সম্ভব তারই নাম প্রতাপ চৌধুরি।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কিন্তু গুপ্তরহস্যটা কী?'

জয়ন্ত গম্ভীরভাবে বললে, 'জগৎশেঠের রত্নকুঠি।'

—'আরে ধেৎ, তুমিও কি ওই রূপকথাটা বিশ্বাস করো?'

—'করি। জগৎশেঠ কুশলচাঁদের গুপ্তধনের কথা আমিও ঐতিহাসিক কাহিনিতে পাঠ করেছি।'

—'ইতিহাস আর কাহিনি এক কথা নয়।'

—'তা নয়। কিন্তু সেকালের ধনীদের মধ্যে গুপ্তধন রাখার প্রথাটা খুবই চলিত ছিল। আর বীরেনবাবুর ঠাকুরদার লেখা পড়লে এই সন্দেহই দৃঢ় হয় যে, তিনি গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছিলেন। তা নইলে তিনি এ কথা বলতেন না যে, লেখার মর্মোদ্ভেদ করতে পারলে তাঁর পুত্রের অর্থাভাব দূর হয়ে যাবে।'

মানিক বললে, 'ধরলুম কৈলাস চৌধুরির ছেলেরই নাম হচ্ছে প্রতাপ চৌধুরি। হয়তো সত্য-সত্যই তার চরিত্র হচ্ছে সাক্ষাৎ-শয়তানের মতো ভয়াবহ। কিন্তু তার সম্বন্ধে আমাদের সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে কেন? এ মামলাটা নিয়ে এখনও আমরা তদন্তে নিযুক্ত হইনি। সে আমাদের অস্তিত্ব জানতে পারবে কেমন করে?'

জয়ন্ত শুধোলে, 'বীরেনবাবু, আপনি যে আমাদের সাহায্য গ্রহণ করতে চান, এ কথা কি আর কারুর কাছে প্রকাশ করেছেন?'

বীরেন সবেগে মাথা নেড়ে বললে, 'নিশ্চয়ই নয়! আজ সকাল পর্যন্ত জানতুম না যে, আমি আপনাদের কাছে এসে ধরনা দেব!'

—'তাহলে অন্য কোনো পক্ষের লোক আপনার পিছনে পিছনে ছায়ার মতো লেগে আছে। আপনি যে আমাদের কাছে এসেছেন, এর মধ্যেই সে খবর তারা পেয়ে গেছে। জানেন তো, অপরাধীদের কাছে আমরা অপরিচিত নই?'

বীরেন বললে, 'এ কথায় আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। কারা তারা?'

—'হয়তো তথাকথিত যদুনাথ বসুর দল। হয়তো যদুনাথ হচ্ছে প্রতাপ চৌধুরিরই ছদ্মনাম!'

মানিক বললে, 'যদুনাথ বসু বা প্রতাপ চৌধুরির কথা বলতে পারি না, তবে এমন আর একজন লোকও বীরেনবাবুর প্রত্যেক গতিবিধির খবর রাখে, যে প্রতাপ চৌধুরির বন্ধু নয়।'

জয়ন্ত বললে, 'তুমি বেনামা পত্রলেখকের কথা বলছ?'

—'হ্যাঁ।'

—'আমিও তোমার মতে সায় দি। আমরা এখনও কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইনি, কিন্তু ব্যাপারটা যে গোড়াতেই অতিরিক্ত মাত্রায় ঘোরালো হয়ে উঠল! আপাতত আমাদের এই প্রতাপ চৌধুরি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। বীরেনবাবু, আপনি প্রতাপ চৌধুরিকে চেনেন?'

—'না। তবে লোকের মুখে শুনেছি, চুরি, জুয়াচুরি, রাহাজানি, খুনখারাবিতে সে একজন অদ্বিতীয় ব্যক্তি। একবার কোথায় কী অপরাধ করে সে পনেরো বছরের জন্যে জেলে গিয়েছিল, কিন্তু বছরখানেক যেতে না যেতেই জেল ভেঙে পালিয়ে গিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে আছে।'

সুন্দরবাবু হঠাৎ টেবিলের উপরে প্রচণ্ড জোরে এক ঘুসি বসিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন, 'জয়ন্ত! মানিক! এই সেই 'সোনার আনারস' মামলার প্রতাপ চৌধুরি নয় তো? আমরাই তাকে গ্রেপ্তার করেছিলুম, পনেরো বৎসর কারাবাসের আদেশ পেয়ে এক বছরের মধ্যেই জেল থেকে সে পালিয়ে যায় আর সঙ্গে করে নিয়ে যায় তার দলের আর-একজন লোককেও।'

মানিক বললে, 'তারও নাম মানিকচাঁদ। সে-ও এক মারাত্মক অপরাধী, আমাদের প্রায় মৃত্যুপথে পৌঁছে দিয়েছিল, সুন্দরবাবুর জন্যে কোনোক্রমে প্রাণে বেঁচে গিয়েছি!'

জয়ন্ত বললে, 'হুঁ, সব মনে পড়ছে! প্রতাপ চৌধুরি সেই সময়েই আমাকে বলেছিল, কোনো কারাগারই তাকে ধরে রাখতে পারবে না, তার সঙ্গে আবার আমাদের দেখা হবে।'

মানিক বললে, 'ও বাবা, সে যে এক মহা ধড়িবাজ ব্যক্তি! সেবারে তার হাত থেকে আমরা বাঘরাজাদের গুপ্তধন ছিনিয়ে নিয়েছিলুম। গ্রেপ্তার হবার পর সে আমাদের বলে গিয়েছিল—'আপাতত এই গুপ্তধন তোমাদের জিম্মায় রেখে গেলুম। যথাসময়ে এর সঠিক হিসাব দাখিল করতে হবে।' এখন সে

জেলের বাইরে এসেছে। এইবারে আবার কি তার দেখা পাব?'

জয়ন্ত বললে, 'সে আবার দেখা দেবে কি দেবে না জানি না। কিন্তু সে যদি এই প্রতাপ চৌধুরি হয়, আর আমরা যদি বীরেনবাবুর মামলার ভার গ্রহণ করি, তাহলে আমাদেরই তাকে খুঁজে বার করতে হবে।'

সুন্দরবাবু মস্তক আন্দোলন করে বললেন 'হুম! সে বুঝি সহজ কথা? গেলবারেই দেখেছি, প্রতাপ চৌধুরিটা মেঘনাদের মতো আড়ালে থেকে এমন কায়দায় যুদ্ধচালনা করে যে, কেউ তাকে ধরতে-ছুঁতে পারে না!'

জয়ন্ত বললে, 'কিন্তু তার যুদ্ধচালনায় কৌশলটা আমরা জেনে নিয়েছি, সুতরাং এবারে আর বেশি বেগ পেতে হবে বলে মনে হয় না।'

আচম্বিতে সকলকে চমকে দিয়ে রাস্তার ধারের জানলার গরাদের উপরে ঠকাং করে কী-একটা এসে পড়ে ছটকে গেল অন্য দিকে এবং পরমুহূর্তে জেগে উঠল কামানগর্জনের মতো একটা কানফাটানো ভীষণ শব্দ ও সঙ্গে সঙ্গে থরথর করে বাড়িঘর কাঁপতে লাগল! হু হু করে পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল সমস্ত দৃশ্য! সম্মিলিত কণ্ঠে তীব্র আর্তনাদ! জনতার উচ্চ কোলাহল! এ যেন পরম শান্তির মধ্যে বিনা মেঘে বজ্রপাত!

॥ পঞ্চম অধ্যায় ॥

হোটেলখানায় সন্ন্যাসী

এই অভাবিত ও আকস্মিক উৎপাত স্তম্ভিত করে দিলে সকলের দেহ এবং মন। জানালা দিয়ে হু হু করে ঘরের ভিতরে এসে ঢুকল বারুদের গন্ধমাখা রাশিকৃত ধোঁয়া, সকলে ফ্যালফ্যাল করে সেইদিকে তাকিয়ে রইল কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো।

বাইরের থেকে সামনে ভেসে আসছে আর্তনাদ, হট্টগোল, বহু লোকের দ্রুত পদশব্দ।

কে চিৎকার করে বললে, 'শিগগির ফোন করে দাও! অ্যাম্বিউল্যান্সের ব্যবস্থা করো!'

সর্বাগ্রে নিজেকে সামলে নিলে জয়ন্ত। দৌড়ে জানালার কাছে ছুটে গিয়ে পথের দিকে করলে দৃষ্টিপাত। এদিকে-ওদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, 'বোমা! আমাদের জানালা লক্ষ্য করে কেউ বোমা ছুড়েছে!'

সুন্দরবাবু চোখ পাকিয়ে বলে উঠলেন, 'হুম! হুম! হুম!'

—'কিন্তু আমাদের জোর কপাল। বোমাটা ঘরের ভিতরেও আসেনি, জানালার গরাদের গায়ে ধাক্কা লেগেও তার বিস্ফোরণ হয়নি, পথের উপরে আছড়ে পড়বার পর সেটা ফেটে গিয়েছে!'

মানিক বললে, 'এই বন্ধ ঘরের ভিতরে বোমা ফাটলে আমরা কেউ আর বাঁচতুম না!'

—'তা হয়তো বাঁচতুম না। কিন্তু তা হয়নি বলে ভগবানকে ধন্যবাদ দাও।'

সুন্দরবাবু রুমাল বার করে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, 'রাখে কৃষ্ণ মারে কে, রাখে কৃষ্ণ মারে কে?'

জয়ন্ত বললে, 'কিন্তু কৃষ্ণ যাদের রক্ষা করলেন না, তাদের অবস্থাটা দেখে আসা দরকার। চলুন, নীচেয় নেমে তদারক করে আসি।'

রাজপথের উপরে প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে রক্ত আর রক্ত! এখানে-ওখানে বইছে যেন রক্তের রাঙা লহর! তারই মধ্যে ছটফট করছে তিনটে রক্তাক্ত, ছিন্নভিন্ন দেহ। আর একটা দেহ একেবারে আড়ষ্ট ও নিস্পন্দ। সে বীভৎস দৃশ্য চোখ মেলে দেখা যায় না—বীরেন শিউরে উঠে 'উঃ' বলে হাতে চোখ ঢেকে মাটির উপরে বসে পড়ল।

রাজপথের দিকে বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে সুন্দরবাবু বললেন, 'দ্যাখো জয়ন্ত, দ্যাখো! বোমা ফেটে পথের উপরে কত বড়ো একটা গর্ত হয়েছে—ওরে বাস রে বাস!'

মানিক বললে, 'অত্যন্ত শক্তিশালী বোমা!'

জয়ন্ত বলে, 'কিন্তু ছুড়লে কে, সেইটেই এখন জানা দরকার।'

পথে লোকে লোকারণ্য, ছুটোছুটি, ভীত চিৎকার! কেউ স্থির হয়ে কারুর কথা শুনছে না, নানাজনে নানাপ্রকার মত জাহির করছে!

ওধারের ফুটপাতে ছিল একখানা চায়ের দোকান, জয়ন্তের জিজ্ঞাসার উত্তরে সে বললে, 'হ্যাঁ স্যার, ব্যাপারটা আমি দেখেছি! একখানা ছুটন্ত মোটর থেকে একটা লোক হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে আপনার বাড়ির দোতলার জানালার দিকে বলের মতো একটা জিনিস ছুড়ে মারলে—'

সুন্দরবাবু বাধা দিয়ে বললেন, 'কীরকম মোটর? ট্যাক্সি?'

—'না, লাল রঙের প্রাইভেট মোটর।'

—'সিডান বডি?'

—'না, খোলা গাড়ি।'

—'নম্বর?'

—'আরে মশাই, নম্বর দেখবার সময় কি পেয়েছি? তারপরেই ভীষণ শব্দ আর বিষম হুলুস্থুল—আঁতকে উঠে সেইদিকেই তাকিয়ে রইলুম।'

—'তুমি তো ভারী বোকা লোক হে! কেন তুমি আঁতকে উঠলে, কেন তুমি নম্বরটা টপ করে দেখে নিলে না?'

—'মশাই গো, এখানে থাকলে আপনিও তখন আমারই মতন বোকামি করতেন!'

—'কক্ষনো নয়, কক্ষনো নয়, আমি সে পাত্রই নই!'

জয়ন্ত বললে, 'যাক গে ও-কথা। তারপর কী হল বলো।'

—'তারপর মুখ ফিরিয়ে সেই লাল মোটরখানা আর দেখতে পেলুম না। গাড়িখানা একবারও থামেনি, তিরের মতো ছুটে মিলিয়ে গিয়েছে।'

সুন্দরবাবু গজগজ করে বললেন, 'যাবেই তো, মিলিয়ে যাবেই তো! তুমি নম্বর দেখবে বলে সে তো আর দাঁড়িয়ে থাকবে না!'

চায়ের দোকানের মালিক হঠাৎ সচমকে বলে উঠল, 'দেখুন, দেখুন!'

—'দেখব? কী দেখব?'

—'সেইরকম একখানা লাল মোটর আবার এইদিকে ছুটে আসছে!'

—'হুম, বলো কী?'

—'না, না, গাড়িখানা খানিকটা এসেই আবার মোড় ফিরে পাঁই পাঁই করে সরে পড়ল!'

সুন্দরবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ট্যাক্সি! ট্যাক্সি!'

মানিক বললে, 'মিছে চেঁচিয়ে গলা ভাঙবেন কেন সুন্দরবাবু? কোথাও ট্যাক্সি নেই, লাল মোটরের পিছু ধরা অসম্ভব!'

বীরেন বললে, 'হ্যাঁ, লাল মোটরখানা আড়ালে চলে গেছে—আর ওর নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'ফাঁকি দিলে যে, ফাঁকি দিলে! হায় হায় হায় হায়!'

জয়ন্ত বললে, 'দূর থেকে কারুকে চিনতে পারলুম না বটে, তবে এটুকু আমার চোখ এড়ায়নি যে, গাড়ির ভিতরে ছিল তিনজন আরোহী আর তাদের একজনের দেহে ছিল সাহেবি পোশাক।'

—'কিন্তু জয়ন্ত, ওখানা বোধহয় অপরাধীদের গাড়ি নয়। তাহলে পালিয়ে গিয়ে আবার ফিরে আসত না।'

—'গাড়িখানা সন্দেহজনক। নইলে এইদিকে আসতে আসতে হঠাৎ অন্য পথ ধরে এত তাড়াতাড়ি সরে পড়ল কেন?'

মানিক বললে, 'আমার বোধ হয় অপরাধীরা দেখতে এসেছিল তাদের বোমা লক্ষ্যভেদ করেছে কি না!'

—'আমারও সেই বিশ্বাস। তারপর ঘটনাস্থলে আমাদের বহাল তবিয়তে বর্তমান দেখে চটপট চম্পট দিয়েছে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কী দুঃসাহসী অপরাধী!'

—'এই মামলার সঙ্গে ফেরারি আসামি প্রতাপ চৌধুরির কোনো সম্পর্ক আছে কি না জানি না, কিন্তু তার দুঃসাহসের প্রমাণ আগেও কি আপনি পাননি সুন্দরবাবু?'

সুন্দরবাবু সায় দিয়ে বললেন, 'পেয়েছি বই কি, পেয়েছি বই কি! ওই দ্যাখো, পুলিশ এসে পড়েছে—সঙ্গে সঙ্গে অ্যাম্বিউল্যান্সের গাড়িও!'

জয়ন্ত বললে, 'আসুন, আমরা চুপি চুপি সরে পড়ি।'

—'কিন্তু সরে পড়বে কোথায়? বোমা ছুড়েছে তোমার বাড়ির উপরে, পুলিশ তোমাকে খুঁজবেই।'

—'সে সব পরের কথা। এখন আর-একটা দৃশ্য দেখুন।'

—'দৃশ্য? আবার কী দৃশ্য?'

—'চিত্তাকর্ষক দৃশ্য। একটু দূরে তাকিয়ে দেখুন, আমাদের পাড়ায় হোটেলবাড়ির ছাদের ধারে দাঁড়িয়ে এক বিচিত্র মূর্তি! পরনে গেরুয়া কাপড়, মাথায় জটা, একমুখ দাড়িগোঁফ। এই লোকটাই কি খানিক আগে মধুর হাতে বেনামা চিঠি সমর্পণ করে গেছে?'

—'হুম!'

—'আচ্ছা, আমি খবরাখবর নিয়ে আসি, আপনারা বাড়ির ভিতরে গিয়ে অপেক্ষা করুন।' এই বলে জয়ন্ত দ্রুতপদে অগ্রসর হল।

॥ ষষ্ঠ অধ্যায় ॥

উদরপরায়ণ সন্ন্যাসীপ্রবর

মানিক ও বীরেনকে সঙ্গে নিয়ে সুন্দরবাবু আবার জয়ন্তের বৈঠকখানায় ঢুকে একখানা চেয়ারের উপরে নিজের গুরুভার কলেবর স্থাপন করলেন সশব্দে।

এবং তারপর গলা চড়িয়ে বললেন, 'ও মধু, অ শ্রীমধুসূদন! মনটা বড়োই উত্তেজিত হয়েছে বাবা, এক পেয়ালা চা না পেলে তো শান্ত হবে না!'

কিন্তু চায়ের পেয়ালা আসবার আগেই সেখানে হল পুলিশের আবির্ভাব। স্থানীয় থানার ইনস্পেকটার তদন্তে এসে সুন্দরবাবুকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তুললেন, কিন্তু আসল রহস্যের কোনোই পাত্তা পেলেন না, তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়া হল কেউ বা কারা ভ্রমক্রমে এই বাড়ির উপরে বোমা নিক্ষেপ করেছে।

পুলিশ প্রস্থান করলে পর মানিক বললে, 'সুন্দরবাবু, এইবারে চা আসবে তো?'

—'নিশ্চয়! সেইসঙ্গে কিছু 'ইত্যাদি' থাকলেও আপত্তি করব না।'

—'হ্যাঁ সুন্দরবাবু, আপনার রসনেন্দ্রিয় কি সর্বদাই 'ইত্যাদি'র জন্যে তৈরি হয়ে থাকে?'

—'সর্বদাই ভাই, সর্বদাই! জীবদেহের প্রধান কর্তব্যই হচ্ছে উদরপূজা। অতএব আসুক চায়ের সঙ্গে ইত্যাদি। ও মধু, অ শ্রীমধুসূদন! এত মিষ্টি করে ডাকছি, তবু সাড়া পাই না কেন বাপধন?'

সুন্দরবাবু চা এবং 'ইত্যাদি' নিয়ে ব্যস্ত থাকুন, ততক্ষণে জয়ন্ত কী করছে দেখে আসা যাক।

জয়ন্ত হোটেলের কাছে আসতে-আসতেই দেখতে পেলে, ছাদের উপর থেকে জটাধারী সন্ন্যাসীর মূর্তিটা হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

জয়ন্ত ভাবতে লাগল, কেন? তাকেই দেখে নাকি? সে আরও জোরে পা চালিয়ে দিলে।

ভাতের হোটেল। সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায় ক্ষুধার্ত খরিদ্দারের ভিড়।

মালিক জয়ন্তের পরিচিত। সে উদগ্রীব হয়ে হোটেলবাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল, জয়ন্তকে দেখেই জিজ্ঞাসা করলে, 'হ্যাঁ মশাই, ওখানে অত দুমদাম, চ্যাঁচামেচি, ছুটোছুটি কেন?'

খুব সংক্ষেপে হোটেলওয়ালার কৌতূহল চরিতার্থ করে জয়ন্ত শুধোলে, 'আপনার এখানে আজ কোনো স্বামীজি অর্থাৎ সন্ন্যাসীর আগমন হয়েছে?'

—'হয়েছে বই কি! তাঁর নাম বোধহয় ভোজনানন্দ স্বামী!'

—'আপনার এমন অনুমানের কারণ?'

—'একাই উড়িয়ে দিয়েছেন তিনজনের খোরাক। মাছ-মাংস কিছুই বাদ যায় না। নিরামিষে অত্যন্ত অরুচি। জনকয় এমন স্বামীজিকে পেলে আমাকে আর হোটেল চালাবার জন্যে ভাবতে হয় না।'

—'স্বামীজি কি আপনার পুরনো খরিদ্দার?'

—'উঁহু, আজ এই প্রথম তাঁর পায়ের ধুলো **পেলুম।**'

—'তিনি এখনও হোটেলে আছেন তো?'

—'আছেন বই কি!'

—'আমি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করব।'

—'বেশ তো, সোজা উপরে উঠে যান। বিবিধ উপচারে উদরসেবা করে তিনি এখন দেহকে একটু হালকা করবার জন্যে ছাদের উপরে পায়চারি করছেন।'

কিন্তু ছাদের উপরে স্বামীজির জটা বা টিকির খোঁজ পাওয়া গেল না। হোটেলের কোনো ঘরেও নয়। বাড়ির খিড়কির দরজাটা নাকি ভিতর থেকে বন্ধ ছিল, কিন্তু এখন খোলা রয়েছে। স্বামীজির অন্তর্ধানের রহস্যটা বুঝতে কষ্ট হয় না।

জয়ন্ত আবার সদরের দিকে ফিরে এল হতাশভাবে।

হোটেলওয়ালা তখনও সেখানে মোতায়েন ছিল। 'স্বামীজির সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা হয়নি?' মুখ টিপে হাসতে হাসতে সে প্রশ্ন করলে।

—'না। কেমন করে জানলেন আপনি?'

—'আপনি উপরে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গেই স্বামীজিকে খিড়কির দিক থেকে হনহন করে এদিকে আসতে দেখলুম। আমি তাঁকে আপনার কথা জানালুম। তিনি বললেন, 'আমার এখন বড়ো তাড়া, কারুর সঙ্গে মুলাকাত করবার ফুরসত নেই।' তারপর হন্তদন্তের মতো এগিয়ে ওই গলিটার মধ্যে ঢুকে পড়লেন।'

জয়ন্ত বুঝলে, এখন আর স্বামীজির পশ্চাদ্ধাবন করা মায়ামৃগের পিছনে ছোটার মতোই ব্যর্থ হবে। সে বাড়িমুখো হল এই ভাবতে ভাবতে: স্বামীজি আমার সঙ্গে এমন লুকোচুরি খেলছেন কেন? তিনি বেনামা চিঠি বিলি করে গুম হয়ে যান। নাগাল ধরতে গেলে পিঠটান দেন। যেন আমাদের ভয় করেন!

স্বামীজির মাছ-মাংস সবই চলে। একাই খতম করেন তিনজনের খোরাক। যেখানে-সেখানে যার-তার হাতের রান্না খেতেও তাঁর আপত্তি নেই। স্বামীজি সংযম বা বাছবিচারের ধার ধারেন না। তবে কি তিনি নকল স্বামীজি? তাঁর জটাজুট আর গৈরিক সাজ কি বাজে ভড়ং? তিনি কি ছদ্মবেশী?

বাড়িতে পৌঁছতেই মানিক শুধোলে, 'কী হল জয়ন্ত? সন্ন্যাসী কী বললেন?'

—'কিছুই বললেন না। অর্থাৎ কিছু বলবার আগেই আড়ালে গা ঢাকা দিলেন!'

—'বটে, বটে? এই সন্ন্যাসীপ্রবর দেখছি রহস্যের অবতার! অতঃপর?'

—'অতঃপর তল্পিতল্পা বাঁধো। আমরা আজকেই মুর্শিদাবাদ যাত্রা করব।'

সুন্দরবাবু সচমকে বললেন, 'হুম! এর মানেটা কী?'

—'মানে একটা আছে বই কি! কিঞ্চিৎ তদন্তের দরকার।'

—'কীসের তদন্ত?'

—'গুপ্তধনের।'

বীরেন বললে, 'আপনি তাহলে আমার ঠাকুরদার গল্প সত্য বলে মনে করেন?'

—'করি! দেখছেন তো, আপনি এখানে এসেছেন বলে এর মধ্যেই আমাদের উপরে হামলা শুরু হয়েছে! কোনো লোক বা দল চায় না যে, আমরা আপনাকে সাহায্য করি। তাদের এই আপত্তির মূলে নিশ্চয়ই কোনো গূঢ় কারণ আছে।'

—'কিন্তু সেজন্যে মুর্শিদাবাদে যাবার প্রয়োজন কী?'

—'জগৎশেঠরা মুর্শিদাবাদেই বাস করতেন।'

—'সুতরাং তাঁদের রত্নকুঠি আছে মুর্শিদাবাদেই, এই হল আপনার যুক্তি?'

—'ঠিক তাই।'

বীরেন উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠে বললে, 'জগৎশেঠের বিরাট প্রাসাদ মুর্শিদাবাদেই ছিল বটে, কিন্তু এখন গঙ্গা তাকে গ্রাস করেছে। সেখানে আজ গুপ্তধনের সন্ধান করতে গেলে আমাদের ডুবুরি সাজা ছাড়া উপায় নেই। আপনি কি এ খবর রাখেন না?'

—'রাখি বই কি!'

—'তবে? এইজন্যেই তো আমি ঠাকুরদার কাহিনিটা বাজে গল্প বলেই ধরে নিয়েছি।'

—'ভুল করেছেন।'

সুন্দরবাবু কিঞ্চিৎ রাগান্বিত কণ্ঠে বললেন, 'তোমার যুক্তিটা শুনি?'

—'যথাসময়ে বলব। এখন তল্পিতল্পা বাঁধবার চেষ্টা করুন।'

—'কিন্তু তাড়াতাড়ি কেন বাপু?'

—'মনে রাখবেন, বীরেনবাবুর ঠাকুরদার লেখা খাতার কিছু অংশ যদুনাথ বসু বা প্রতাপ চৌধুরির হাতে গিয়ে পড়েছে। তার মধ্যেই হয়তো রত্নকুঠির ঠিকানা আছে। দেরি করলে আমাদের ভাগ্যে লাভ হবে অষ্টরম্ভা।'

॥ সপ্তম অধ্যায় ॥

বিপদের সংকেত

মুর্শিদাবাদ। নগরপ্রান্তে শীতকালের মরা গঙ্গা। যেন কোনো অগভীর বড়ো খাল, কারণ জলে স্রোত নেই বললেও চলে। এখানে-ওখানে হেঁটে পার হওয়া যায়।

নৌকোর চালে বসে জয়ন্ত বলছিল, 'পলাশির যুদ্ধের আগে মুর্শিদাবাদের রূপ ছিল ভিন্নরকম। তখনকার ইংরেজদের চিঠিপত্র পড়ে জানতে পারি, সে মুর্শিদাবাদ আকারে আর সৌন্দর্যে বিলাতের লন্ডন শহরের চেয়ে বৃহৎ আর উন্নত ছিল!'

মানিক বললে, 'আজকের মুর্শিদাবাদকে দেখে তো মনে হচ্ছে, কলকাতার শহরতলিও এর উপরে টেক্কা মারতে পারে।'

—'এ হচ্ছে আজ স্মৃতির শ্মশান। দিকে দিকে ছড়ানো আছে ভাঙাচোরা ইটের স্তূপ আর পড়ো পড়ো, বেরঙা, শ্রীহীন অট্টালিকা।'

বীরেন বললে, 'মরা গঙ্গার ভাঙা ঘাটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ওই নামমাত্র সার আধুনিক নবাবদের প্রকাণ্ড অট্টালিকা, দলে দলে লোক তাই দেখবার জন্যে ওখানে গিয়ে ভিড় করে।'

জয়ন্ত বললে, 'আমার কিন্তু ওদিকে ফিরে তাকাতেও লজ্জা করে। যারা একদিন গড়েছিল কবির স্বপ্ন তাজমহল আর আগ্রা-দিল্লির অপরূপ দুর্গপ্রাসাদ, তাদেরই রুচিহীন, ভাগ্যতাড়িত বংশধররা আজ গড়ে তুলেছে ইংরেজদের অনুকরণে মস্তবড়ো এক বিজাতীয় প্রাসাদ—নকলের মহিমায় খাস্তা হয়ে গিয়েছে আসলেরও স্বরূপ! এ হচ্ছে দাস-মনোভাবের অসহনীয় পরিচয়!'

বীরেন বললে, 'গঙ্গার এপারে মুর্শিদাবাদে জীবন্ত নবাবদের শৌখিন আস্তানা, আর ওপার আছে তাঁদের মৃতদেহের অন্তিম ধরণীশয্যা। একদিন নবাবির জাঁকে যাঁদের জরির জুতো পরা পা মাটিতে ছুঁতে চাইত না, আজ তাঁদের দেহাবশেষ জীর্ণ কবরের তলায় মাটির সঙ্গে মাটি হয়ে মিশে আছে! আলিবর্দির সমৃদ্ধ সমাধির ছায়ায় দীনতাপূর্ণ কবরের ভিতরে শায়িত আছে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব বিপথচালিত সিরাজদ্দৌলার নশ্বর দেহের অশ্রুকরুণ স্মৃতি।'

স্রোতহীন গঙ্গাজলের উপর দিয়ে দাঁড়ি-মাঝিরা দাঁড় টেনে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে নৌকো। অগভীর পরিষ্কার গঙ্গাজল, স্পষ্ট দেখা যায় তলা পর্যন্ত—সর্বত্র বিকীর্ণ রয়েছে স্পঞ্জের মতো শৈবালপুঞ্জ।

বীরেন বললে, 'ওপারে ওইখানে ছিল সিরাজদৌল্লার প্রমোদপ্রাসাদ! একদিন ওখানে দুলত কক্ষে কক্ষে রঙিন আলোকমালা, নাচ, গান আর বাজনায় সংগীতময় হয়ে উঠত চাঁদের আলো। কিন্তু আজ সেখানে দিনের বেলাতেও শোনা যায় না মানুষের কণ্ঠরব, কেবল সন্ধ্যান্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে একটানা বেজে চলে ঝিল্লিদের বিজনতার গান আর থেকে থেকে কেঁদে ওঠে শিবাদের অশিব নাদ!'

সুন্দরবাবু শুধোলেন, 'আর সেই প্রমোদভবন?'

—'সিরাজদৌল্লার অপঘাত-মৃত্যুর পর তাঁর প্রমোদভবনও গঙ্গাগর্ভে আত্মবিসর্জন দিয়েছে।'

সবাই স্তব্ধ। নৌকো এগিয়ে চলে ধীরে ধীরে। জলে ঝপঝপ করে দাঁড় ফেলার শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না।

মানিক জিজ্ঞাসা করে, 'গঙ্গাতীরের কাছে জলের কাছে জেগে রয়েছে কতকগুলো বড়ো বড়ো ইটের স্তূপ। দেখলে মনে হয়, যেন একসময়ে ওখানে ছিল কোনো অট্টালিকা।'

বীরেন বললে, 'তাই বটে। যাঁর কাছে হাত পেতে নবাবের রাজত্ব আর ইংরেজদের ব্যবসায় চলত, একদিন ওইখানেই ছিল ভারতের সেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধনকুবের জগৎশেঠের ঐশ্বর্যগর্বিত বৃহৎ প্রাসাদ! আজও তার দু-এক টুকরো ভগ্নাবশেষ দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু অল্প দিনে তাও তলিয়ে যাবে কীর্তিনাশা গঙ্গার গর্ভে।'

জয়ন্ত কঠিন কণ্ঠে বললে, 'যাবেই তো। যাওয়াই উচিত। শেঠদের স্মৃতিও আমার মনকে পীড়িত করে। রাজপুতানার শুকনো মরুপ্রান্ত থেকে বিদেশি মাড়োয়ারি এসেছিল সুজলা সুফলা বাংলা দেশের অর্থ লুণ্ঠন করতে। তারা লক্ষ্মীলাভ করেছিল বটে, কিন্তু বাংলার প্রতি ছিল না তাদের এতটুকু প্রাণের টান, তাই তারা বংশানুক্রমে প্রথমে রাজার, তারপর দেশের বিরুদ্ধে বার বার চক্রান্ত করতে কুণ্ঠিত হয়নি। অবশেষে আরও কোনো কোনো দুরাত্মার সঙ্গে মিলে জগৎশেঠরাই ষড়যন্ত্র করে বাংলা দেশকে লুটিয়ে দেয় ফিরিঙ্গিরাজের বুটজুতোর তলায়। সেই মহাপাপের ফলেই তো এই দেশদ্রোহী বংশের উপরে পড়েছে বিশ্বদেবের অমোঘ অভিশাপ, ইতিহাসে আছে কেবল তাদের চরম অপযশ, নিয়তি কেড়ে নিয়েছে তাদের ঐশ্বর্যের শেষ স্মৃতিটুকুও, লাভ করেছে সলিল সমাধি। পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা পর্যন্ত তাদের ক্ষমা করেননি। সুদূর মুঙ্গেরে তাদের দুই ভাইয়ের জীবন্ত দেহ গ্রাস করেও তাঁর ক্ষুধা মেটেনি, মুর্শিদাবাদে এসে বিশ্বাসঘাতকের স্থাবর সম্পত্তি পর্যন্ত নিজের জঠরের জলাবর্তে টেনে না নিয়ে তিনি ছাড়েননি।'

জলের উপরে জেগে থাকা প্রাসাদের ভগ্নাবশেষের একপাশে চুপ করে ছবিতে আঁকার মতো একটা নিশ্চল বক—যেন বিভোর হয়ে আছে অতীত গৌরবের স্বপ্নে।

বীরেন বললে, 'জয়ন্তবাবু, আজ ওই জলের তলায় কোথায় খুঁজে পাবেন জগৎশেঠের রত্নকুঠি?'

জয়ন্ত হেসে বললে, 'আমরা তো জলের তলায় খুঁজব না!'

—'তবে কোথায়? ডাঙায়?'

—'হ্যাঁ।'

—'ডাঙায় শেঠদের প্রাসাদের কোনো চিহ্নই নেই!'

—'তবু খুঁজে দেখব।'

—'কী আশ্চর্য, আপনার বক্তব্য কী?'

সুন্দরবাবুও বিরক্ত হয়ে বললেন, 'সত্যি জয়ন্ত, তুমি যুক্তিহীন কথা বলছ!'

জয়ন্ত অবিচলিত কণ্ঠে বললে, 'সুন্দরবাবু, খাতায় জগৎশেঠদের ইতিহাসে কী লেখা আছে? জগৎশেঠ কুশলচাঁদ নিজের সম্পত্তির কতক অংশ লুকিয়ে রাখবার জন্যে গুপ্তকুঠি নির্মাণ করেছিলেন। এখন ভেবে দেখুন, কুশলচাঁদ নিশ্চয় নির্বোধ ছিলেন না। নিজেদের জনাকীর্ণ, বিখ্যাত প্রাসাদের ভিতরে গুপ্তকুঠি নির্মাণের চেষ্টা যে ব্যর্থ হবে, এটা তিনি ভালো করেই জানতেন। সুতরাং তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল প্রাসাদ থেকে দূরে অন্য কোথাও গুপ্তকুঠি নির্মাণ করা। রাজধানীর বাইরেও যে ধনকুবের জগৎশেঠদের ভূ-সম্পত্তি ছিল, এটুকু অনায়াসেই অনুমান করা যেতে পারে। বীরেনবাবুর ঠাকুরদা চন্দ্রনাথবাবু গঙ্গাতীরের এক পোড়ো বাগানবাড়ির কথা উল্লেখ করেছেন। তার পিছনে আছে এক সেকেলে নির্জন ইঁদারা—তার গায়ে গাঁথা লোহার দরজা। আমি আন্দাজ করি, ওই বাগানবাড়ির অধিকারী ছিলেন জগৎশেঠ কুশলচাঁদ। সেকালের রাজা-রাজড়া আর ধনপতিরা প্রায়ই পুষ্করিণী বা ইঁদারার মধ্যে গুপ্তধন রক্ষা করতেন, 'সোনার আনারস' মামলাতেও আমরা এই শ্রেণির এক ইঁদারার সন্ধান পেয়েছিলুম, আশা করি আপনাদের তা মনে আছে। কুশলচাঁদও নিশ্চয় সেকালের সেই রীতি বজায় রেখেছিলেন। ইঁদারার গুপ্তকুঠির মধ্যে রক্ষা করেছিলেন নিজের অতুল সম্পত্তির কতক অংশ। গুপ্তধন রক্ষা করবার পর সেকালের ধনিকরা আর এক নিষ্ঠুর প্রথা মেনে চলতেন। যাদের সাহায্যে তাঁরা ধনরত্ন পুঁতে রাখতেন, গুপ্তধনের নিরাপত্তার জন্যে তাদের হত্যা করা হত। কুশলচাঁদও তাই করেছিলেন, আর চন্দ্রনাথবাবু ইঁদারায় নেমে দেখেছিলেন সেই নিহত হতভাগ্যদেরই মাংসহীন কঙ্কাল। ইঁদারা

নির্মাতা আর ধনবাহকদের হত্যা করবার পর কুশলচাঁদ ইঁদারা জলে ভরিয়ে দিয়েছিলেন, তারপরে কালক্রমে কুশলচাঁদের মৃত্যু, জগৎশেঠদের পতন, তাঁদের প্রাসাদের পাতালপ্রবেশ, বেওয়ারিশ বাগানবাড়ির শোচনীয় দুর্দশা—ঘরদোর যায় ভেঙেচুরে, বাগান পরিণত হয় কাঁটাজঙ্গলে আর ইঁদারা হয়ে যায় জলশূন্য। মানুষ আর সে অঞ্চল মাড়ায় না। অনেককাল পরে চন্দ্রনাথবাবু ফুটবল কুড়োতে ইঁদারায় নেমে অস্থানে লোহার দরজা দেখে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। তিনি জগৎশেঠদের গুপ্তধনের কাহিনি জানতেন। তাঁর সন্দেহ জাগ্রত হয়। তারপর আবার গোপনে ইঁদারায় ফিরে গিয়ে গুপ্তধনের সন্ধান পান আর তা হস্তগত করেন। বোধহয় সেই সম্পত্তিরই খানিক অংশ নিয়ে তাঁর ব্যবসায়ের গোড়াপত্তন। অবশিষ্ট সম্পত্তি অসময়ের ভয়ে আবার লুকিয়ে রাখেন। আমরা তারই আশায় এখানে এসেছি। তাঁর লেখা খাতার সবটা পেলে হয়তো আমাদের কাজের যথেষ্ট সুরাহা হত, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তা বিপক্ষ দলের হস্তগত হয়েছে। তবু আমরা একবার বাগানখানা খুঁজে দেখবার চেষ্টা করব।'

সুন্দরবাবু কৌতুকহাস্য করে বললে, 'ভায়া হে, তুমি যে দেখছি বেশ একটি মনগড়া গল্প ফেঁদে বসে! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সেই অজানা বাগানবাড়ির ঠিকানা কোথায় পাবে?'

—'চন্দ্রনাথবাবু লিখেছেন, জিয়াগঞ্জের দশ-বারো মাইল তফাতে আছে সেই বাগানবাড়ি।'

—'হুম, তাহলেই কেল্লা ফতে হয়ে গেল নাকি?'

—'আরে মশাই, একটু মাথা খাটাবার চেষ্টা করুন! ভুলবেন না, জায়গাটা আছে গঙ্গার ধারে। মুর্শিদাবাদের পরেই জিয়াগঞ্জ। সেখান থেকে আমরা হাঁটাপথে গঙ্গাতীর ধরে দশ-বারো মাইল অগ্রসর হব। তারপর খুঁজে সহজেই আবিষ্কার করতে পারব এমন একখানা বেওয়ারিশ, ভাঙাচোরা, পোড়ো, সেকেলে বাগানবাড়ি—যার পিছনে আছে জলশূন্য ইঁদারা আর তার পরে একটা মাঠ। গঙ্গাতীরে দশ-বারো মাইলের ভিতরে ঠিক এইরকম পরিস্থিতির মাঝখানে পরিত্যক্ত প্রাচীন বাগানবাড়ি বোধকরি আর নেই।'

মানিক বললে, 'আমি তোমার মত সমর্থন করি।'

সুন্দরবাবু দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বললেন, 'জয়ন্ত যেভাবে কায়দা করে ব্যাপারটাকে সাজিয়ে দাঁড় করিয়েছে, তাতে আমাদেরও সায় দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কী বলেন বীরেনবাবু?'

বীরেন বললে, 'আমি আর কী বলব মশাই, এসব গোলমেলে ব্যাপারে

আমার মাথা খোলে না। তবে আমার মন্ত্র হচ্ছে—'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ'।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'সাধু, সাধু। একালের ছোকরারা সবাই যদি ওই মন্ত্র মানত! তাহলে জয়ন্ত, কোথায় নেমে আমরা হাঁটাপথ ধরব?'

—'জিয়াগঞ্জের ঘাটে।'

মানিক খুঁতখুঁত গলায় বললে, 'কিন্তু জয়ন্ত, অনেকক্ষণ থেকে আমি একটা ব্যাপার লক্ষ করছি।'

—'কী ব্যাপার?'

—'একটানা উটকো পানসি আমাদের পিছনে পিছনে আসছে।'

—'হ্যাঁ, আমিও দেখেছি। তার অন্য সব জানালা বন্ধ, কেবল একটা খোলা জানালায় একজন লোক যেন আমাদেরই পানে তাকিয়ে আছে।'

—'পানসিখানা একবারও আমাদের পিছনে ফেলে এগিয়ে যায়নি। আমরা যখন জগৎশেঠের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের কাছে নৌকো থামিয়েছিলুম, ওই পানসিখানাও থেমে পড়েছিল। তারপর আমাদের সঙ্গে-সঙ্গেই আবার ওর যাত্রা শুরু!'

মাঝি হাঁকলে, 'বাবুজি, এই তো জিয়াগঞ্জের ঘাট!'

জয়ন্ত বললে, 'এসো আমরা এইখানে নেমে পড়ে ওই পানসিখানার ওপরে নজর রাখি।'

নৌকো ঘাটে লাগল। সবাই একে একে নেমে পড়ে একখানা বাড়ির আড়ালে গিয়ে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে রইল।

অজানা পানসিখানা ধীরে ধীরে এগিয়ে এল! আধ মিনিট থেমে দাঁড়াল, তারপর আবার ঘাট ছাড়িয়ে তরতর করে সোজা চলে গেল যেদিকে যাচ্ছিল সেইদিকে।

সুন্দরবাবু বললেন, 'বাব্বা, বাঁচলুম, ফাঁড়া কেটে গেল। ভেবেছিলুম, যণ্ডামার্কা বেটারা আবার বোমা কি বন্দুক ছুড়বে, মনে মনে আমি জলযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলুম।'

তাঁর গা টিপে দিয়ে মানিক বললে, 'এখনই অপ্রস্তুত হবেন না মশাই!'

—'হুম, মিছে ভয় দেখাও কেন?'

—'আবার ওই দেখুন।'

—'কী আবার দেখব?'

—'আবার একখানা নৌকো আসছে।'

—'এলেই বা! নদী দিয়ে নৌকো যাবে না?'

—'নৌকোর জানালার কাছে কে বসে আছে দেখছেন তো?'

সুন্দরবাবু দেখলেন, চমকে উঠলেন, তাঁর দুই চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত!

নৌকোর জানালার কাছে যে বসে আছে তার মাথার জটার ঘটা, মুখে গোঁফ-দাঁড়ির জঙ্গল, গায়ের গেরুয়া কাপড়েরও খানিকটা দেখা যাচ্ছে।

জয়ন্ত বললে, 'সেই সন্ন্যাসী।'

এ নৌকোখানাও জিয়াগঞ্জের ঘাট ছাড়িয়ে অগ্রসর হল।

সুন্দরবাবু বললেন, 'কী যেন হচ্ছে, কিন্তু কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।'

জয়ন্ত বললে, 'এখন আর কিছুই বোঝবার দরকার নেই—এগিয়ে চলুন, এগিয়ে চলুন।'

॥ অষ্টম অধ্যায় ॥

ষড়যন্ত্রের গন্ধ

গঙ্গার ধারে সে জায়গাটাকে বাগানও বলা যায় না, বাড়ি বলাও চলে না। তার স্থানে স্থানে সীমানার বেষ্টনীর কিছু কিছু চিহ্ন এখনও চোখে পড়ে, এই মাত্র। বাগানের বদলে আছে গোটা কয়েক পুরাতন অফলা ফলগাছের সঙ্গে অশ্বত্থ-বটের দঙ্গল ও যত্রতত্র বিকীর্ণ ঝোপঝাপ আগাছার জঙ্গল। এবং বাড়ির বদলে আছে ভেঙে পড়া ছাদ আর ধসে যাওয়া বনিয়াদ আর কোনোক্রমে দাঁড়িয়ে থাকা এক-একটা টুটা-ফাটা দেওয়াল। দরজা-জানালা একেবারেই অদৃশ্য। তবে একসময়ে এখানে যে কোনো শৌখিন ধনিকের সাধের ডেরা ছিল, তার সামান্য প্রমাণ এখনও বর্তমান আছে এক-একটা ভাঙা দেওয়ালের গায়ে বিমলিন পঙ্খের কারুকার্যে। লোকের মুখে শোনা যায়, আগে এখানে ছিল বাগানবাড়ি এবং তার পিছনকার মস্তবড়ো মাঠটা আজও বাগানবাড়ির মাঠ নামে পরিচিত। সেই সূত্রেই জায়গাটার খোঁজ পাওয়া সহজে সম্ভবপর হয়েছে।

জয়ন্ত বললে, 'এই হচ্ছে সেই ইঁদারাটা। বাঙালিরা যে কুয়া বা পাতকুয়া তৈরি করে তা হচ্ছে ইঁদারারই ছোটো আকার। সাধারণত ইঁদারা তৈরি করে অবাঙালিরা আর মনে রাখতে হবে জগৎশেঠদের পূর্বপুরুষ এসেছিলেন রাজপুতানা থেকে।'

সুন্দরবাবু ইঁদারার ভিতরে উঁকিঝুঁকি মেরে বললেন, 'ওরে বাবা, এর তলাটা

যে অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছে, কিছু দেখা যাচ্ছে না! তলায় কী আছে কে জানে!'

জয়ন্ত বললে, 'সঙ্গে দড়ির সিঁড়ি এনেছি, তলায় কী আছে এখনই দেখতে পাব।'

সুন্দরবাবু হতাশভাবে বললেন, 'না ভেবেচিন্তে যখন ডানপিটেদের সঙ্গে এসেছি, তখন পাতাল কত দূর না দেখেই বা উপায় কী? কিন্তু বাপু, আমার অসামান্য বপুখানি নিয়ে ওই যৎসামান্য দড়ির সিঁড়ি ধরে দোদুল্যমান হলে আকস্মিক দুর্ঘটনার সম্ভাবনা, সেটা খেয়ালে আছে কি?'

জয়ন্ত জবাব না দিয়ে দড়ির সিঁড়ি নিয়ে নিযুক্ত হয়ে রইল। সুন্দরবাবু সেদিক থেকে কোনো সান্ত্বনা না পেয়ে বললেন, 'তার উপরে জানোই তো, আমার আবার একটুখানি—ওর নাম কী—ইয়ে আছে!'

মানিক সুন্দরবাবুকে জানত, মুখ টিপে হাসতে লাগল।

বীরেন কিছুই বুঝতে না পেরে শুধোলে, 'ইয়ে আছে? সে আবার কী?'

—'ওই যে গো, যাকে তোমরা বলো ভূতপ্রেত!'

—'ভূতপ্রেত?'

—'হ্যাঁ। আমি যে ওঁদের অস্তিত্ব মানি!' বলেই সুন্দরবাবু যুক্তকরে ললাটদেশ স্পর্শ করলেন।

—'ভূতপ্রেতের সঙ্গে আজ ব্যাপারের সম্পর্ক কী?'

—'সম্পর্ক দেখতে পাচ্ছেন না? পাজি কুশলচাঁদটা নাকি অনেকগুলো লোককে খুন করেছিল আর তাদের কঙ্কালগুলো নাকি ইঁদারার ভেতরেই পড়ে আছে। হুম! তাদের প্রেতাত্মারাও যে ওইখানে আস্তানা পাতেনি, এমন কথা কি জোর করে বলা যায়? অভিশপ্ত শেঠদের গুপ্তধনও আজ হয়েছে যকের ধন, প্রাণটি হাতে করে ওই ইঁদারার ভেতরে নামতে হবে।'

মানিক বললে, 'বেশ তো, প্রাণটি হাতে করেই ইঁদারায় নামবেন, ভূতপ্রেতরা দাবি করলেও তাদের হাতে প্রাণ সমর্পণ করবেন না।'

সুন্দরবাবু মুখ গোমড়া করে বললেন, 'মরছি নিজের জ্বালায়, তুমি আবার মশকরা করে জ্বালার উপরে জ্বালা দিয়ো না মানিক! আমি সার কথাই বলছি। চন্দ্রনাথবাবু কি ইঁদারায় নেমে অপার্থিব কণ্ঠের ফোঁসফোঁসানি শোনেননি?'

জয়ন্ত বললে, 'তার মধ্যে অপার্থিব কোনো কিছু নেই।'

—'নেই? তবে ফোঁসফোঁসানিটা কীসের শুনি?'

—'নিশ্চয় সাপ-টাপ। এঁদো কুয়োয় সাপ বাসা বাঁধে।'

—'এটা তোমার অনুমান মাত্র।'

জয়ন্ত দড়ির সিঁড়ির উপরে পা রেখে অধীর স্বরে বললে, 'বাজে কথায় সময় বয়ে যায়! বেলা বেড়ে চলেছে, আর দেরি নয়! মানিক, পাতালে আছে রাতের অন্ধকার, একটা লণ্ঠন আমাকে দাও, আর একটা লণ্ঠন তোমার পিঠে ঝুলিয়ে নাও।'

সুন্দরবাবু অস্বস্তিপূর্ণ স্বরে বললেন, 'জয়ন্ত, জয়ন্ত, বিপদসাগরে গোঁয়ারের মতো চোখ বুজে ঝাঁপ দিয়ো না! আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে, কারা যেন আড়ালে-আবডালে গা ঢাকা দিয়ে আছে!'

—'শত্রুরা কেমন করে জানবে, আমরা বাগানবাড়ির ঠিকানা আবিষ্কার করেছি?'

—'কিন্তু বুদ্ধিমানের মতে, শত্রুদের অবহেলা করা উচিত নয়।'

জয়ন্ত ইঁদারার মুখ থেকে সরে এসে বললে, 'মানিক, সুন্দরবাবু ঠিক কথাই বলেছেন, ওঁর পাকা চুলের সম্মান রক্ষা না করলে অন্যায় হবে। আবিষ্কারের উত্তেজনায় আত্মহারা হয়ে আমরা আসল কথাই ভুলে গিয়েছিলুম।'

মানিক বললে, 'না ভুলিনি, এ ব্যাপারে আসল কথাই হচ্ছে গুপ্তধনের কথা।'

—'ঠিক তাই কি? আমার মতে, এখনও 'দিল্লি বহুদূর'! যাত্রাপথে বিস্তর বাধা! গুপ্তধন আমাদের চরম লক্ষ্য বটে, কিন্তু যাতে লক্ষ্যস্থলে গিয়ে পৌঁছতে না পারি, সেই উদ্দেশ্যে একদল শত্রু কি আমাদের বাধা দেবার চেষ্টা করছে না?'

—'কিন্তু সেই শত্রুরা এখন কোথায়?'

—'জলপথে তারা যে আমাদের অনুসরণ করেছিল সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই।'

—'কিন্তু হঠাৎ স্থলপথ অবলম্বন করে আমরা তাদের ফাঁকি দিতে পেরেছি।'

—'পেরেছি কি? এইটেই হচ্ছে প্রশ্ন।'

—'হাঁটা পথে এতখানি এগিয়ে এলুম, কোনো শত্রুর ছায়া পর্যন্ত দেখতে পাইনি।'

—'তা পাইনি। কিন্তু 'সোনার আনারস' মামলায় আমরা যখন বাঘরাজাদের গুপ্তধনের সন্ধানে যাত্রা করেছিলুম, তখন সারা পথের কোথাও কি প্রতাপ চৌধুরির অস্তিত্ব টের পাওয়া গিয়েছিল? আগেই তোমাদের কাছে আমি প্রতাপ চৌধুরির পরিচিত যুদ্ধকৌশলের কথা উল্লেখ করেছি। এ যদি সেই প্রতাপ চৌধুরি হয়, তবে এবারেও সে নিজের নির্বাচিত স্থান ছাড়া যেখানে-সেখানে আত্মপ্রকাশ করবে কেন?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আমি কিন্তু পথ চলতে চলতে হাওয়ায় হাওয়ায় পেয়েছিলুম কেমন যেন ষড়যন্ত্রের গন্ধ!'

মানিক হেসে বললে, 'পুলিশের চাকরি ছাড়বার পর দেখছি সুন্দরবাবুর ঘ্রাণশক্তি প্রখরতর হয়ে উঠেছে!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম ঠাট্টা করতে চাও, ঠাট্টা করো! কিন্তু সংস্কৃত বচনে কি আছে জানো তো? 'বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যমাপৎকালে হ্যুপস্থিতে।' অর্থাৎ বিপদের সময়ে বুড়োদের কথা গ্রাহ্য করা উচিত।'

মানিক বিস্ময়ের ভান করে বললে, 'ও হরি, কালে কালে হল কী? হ্যাঁ জয়ন্ত, তুমি কি আর কখনও সুন্দরবাবুকে সংস্কৃত বুলি ঝাড়তে শুনেছ?'

—'তা শুনিনি বটে, তবে আপাতত ওঁর পরামর্শে আমাদের কান পাতা উচিত।'

—'তুমি কী বলতে চাও?'

—'শত্রুরা সজাগ।'

—'সজাগ, কিন্তু তারা অবস্থান করছে কোথায়?'

—'ধরে নাও আশেপাশে। সামনে নয়, অন্তরালে। তারা আছে যে-কোনো সুযোগের অপেক্ষায়।'

—'আমরাও কি ঘুমিয়ে আছি?'

—'তা নেই, কিন্তু এখনও আমরা অন্ধকারে হাতড়াচ্ছি। আমাদের সামনেই এমন সব কাণ্ড হচ্ছে, যার হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না।'

—'যথা?'

—'ধরো আজকের ঘটনাই। গঙ্গায় আমাদের পিছু নিয়েছিল যেন শত্রুদেরই পানসি। কিন্তু তার পিছনে পিছনে নৌকোয় চেপে যে সন্ন্যাসী আসছিল, সে কে? সে কাদের অনুসরণ করছিল—আমাদের না শত্রুদের? কেন অনুসরণ করছিল, তার স্বার্থ কী? সেই-ই কি বেনামা পত্রলেখক? কেন সে আমাদের সাবধান করে দিতে চায়, সে কি আমাদের বন্ধু? এমন অচিন বন্ধু কি বিস্ময়কর নয়?'

মানিক ফাঁপরে পড়ে বললে, 'প্রশ্নে প্রশ্নে তুমি যে আমাকে একেবারে আচ্ছন্ন করে দিলে হে!'

—'না ভাই না! এ সব প্রশ্ন আমি কেবল তোমাকেই করছি না, নিজেকেও করছি নিজে নিজেই। কিন্তু এ সব প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে নেই। তোমার কাছে আছে?'

—'উঁহু!'

—'অতএব সুন্দরবাবু হাওয়ায় হাওয়ায় যে ষড়যন্ত্রের কথা তুলেছেন, সেটা তাৎপর্যমূলক বলে মানতে হবে বই কি!'

—'উত্তম, সুন্দরবাবু নাকে শোঁকা ষড়যন্ত্রের গন্ধকে স্বীকার করিনি বলে আমি ক্ষমাপ্রার্থনা করছি। জয়ন্তও যদি সুন্দরবাবুর পক্ষ সমর্থন করে তাহলে একসঙ্গে দুইজনের প্রতিযোগিতা করবার সাধ্য আমার নেই।'

সুন্দরবাবু অভিমানের স্বরে বললেন, 'মানিক, এখনও তুমি ঠাট্টার সুরে কথা কইছ! কিন্তু ভাই, আমি কি ন্যায্য কথাই বলিনি?'

মানিক এইবার গম্ভীর হয়ে বললে, 'না, সুন্দরবাবু, সব শুনে আমি এখন আপনার কথাতেই সায় দিচ্ছি। কিন্তু অতঃপর আমাদের কর্তব্য কী?'

জয়ন্ত বললে, 'কর্তব্য আমি স্থির করে ফেলেছি। আমাদের সকলের একসঙ্গে ইঁদারায় নামা চলবে না।'

—'তবে?'

—'অন্তত একজনকে এখানে পাহারায় মোতায়েন থাকতে হবে।'

—'থাকবে কে?'

—'সুন্দরবাবু।'

সুন্দরবাবু চমকে উঠে বললে, 'হুম! আমি? একলা?'

—'দোকলা পাবেন কাকে? মানিক কিছুতেই আমাকে ছাড়তে রাজি হবে না। আর আমিও তাকে ছাড়ব না, সে আমার ডান হাতের মতো। আর বীরেনবাবু এ সব ব্যাপারে একেবারে কাঁচা, ওঁর এখানে থাকা-না-থাকা সমান কথা।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'না, না, বীরেনবাবুকে আমিও চাই না। যদি কোনো বিপদ ঘটে, ওঁকে সামলানোই দায় হয়ে উঠবে। কিন্তু আমার পক্ষেও এখানে একলা থাকাটা কি সমীচীন হবে?'

—'কেন হবে না? আপনি বহুযুদ্ধজয়ী সৈনিক। আপনার একহাতে রইল রিভলভার, আর এক হাতে সংকেত-বাঁশি। বিপদ দেখলে দুটোই ব্যবহার করবেন। আমরাও তো হাতের কাছেই রইলুম—বাঁশি শুনেছি কি ছুটে এসেছি! এসো মানিক, আসুন বীরেনবাবু!'

জয়ন্ত সর্বাগ্রে ইঁদারার ভিতরে গিয়ে নামল।

সুন্দরবাবু রিভলভার বার করে মৃদুকণ্ঠে বললেন, 'জয় বিপদভঞ্জন মধুসূদন!'

॥ নবম অধ্যায় ॥

রসাতলের কারাগার

পশ্চিমের সম্ভ্রান্ত বাড়ির ইঁদারার মতো ব্যবস্থা। বেড় রীতিমতো বড়ো, সার সার সিঁড়ির ধাপ নেমে গিয়েছে নীচের দিকে কিছুদূর পর্যন্ত। তারপরেই অবারিত শূন্যতা। এবং অল্পে অল্পে ঘনায়মান অন্ধকার।

মাঝে মাঝে টর্চের চাবি টিপলে দেখা যায় মানুষের অভাবিত ও বিরক্তিকর আবির্ভাবে ইঁদারার গায়ে দিকে দিকে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে মাকড়সা, বিছে ও কাঁকড়াবিছে দলে দলে। আরও কত জাতের অজানা জীবের চোখে ফোটে বিদ্যুতের ঝলক। মন চমকে দেয় তক্ষকদের প্রতিবাদ। সর্বাঙ্গ ভয়ার্ত হয়ে ওঠে ভীষণ ফোঁস ফোঁস শব্দে।

জয়ন্ত বলে, 'শুনছ মানিক?'

—'শুনছি।'

—'চন্দ্রনাথবাবুর অপার্থিব গর্জন!'

বীরেন ভয়ে কুঁচকে বলে, 'ও মশাই, কামড়াবে না তো?'

—'সেটা ওদের খুশি! আর আমাদের বরাত!'

মানিক বলে, 'নামছি তো নামছিই। বাবা, ইঁদারাটা কত গভীর?'

—'অন্ধকার যেন নিরেট হয়ে উঠেছে। আর বেশি নামতে হবে না।'

তারপর আলো ফেলে দেখা গেল, রাশি রাশি অস্থি ছড়িয়ে পড়ে ইঁদারার তলদেশটা ভয়াবহ শুভ্রতায় ভরিয়ে তুলেছে।

জ্বলল দুটো লণ্ঠনের আলো। গুনে দেখা গেল নয়টা অস্থিসার নরমুণ্ড, সেগুলো কঙ্কাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। সেই সব ওষ্ঠাধরের আবরণমুক্ত বিকট দন্তবিকাশ দেখলেই বুকটা ধড়াস করে ওঠে আর প্রাণ মূর্ছিত হয়ে পড়তে চায় সেই সব দৃষ্টিহীন চক্ষুকোটরের বীভৎসতার দিকে দৃষ্টিপাত করলে।

জয়ন্ত ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললে, 'লোভী ধনীর মারাত্মক খেয়ালের খোরাক হবার জন্যে নয়-নয় জন হতভাগ্যের জীবনলীলা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এখানে ফুরিয়ে গিয়েছে—তাদের অন্তিম আর্তনাদের সঙ্গে মেশানো ছিল জীবনের যত অতৃপ্ত বাসনা। সুন্দরবাবুর মত মানলে আমিও বলতুম, তাদের অশান্ত আত্মারা আজও ওই অস্থিস্তূপগুলোর মায়া ছাড়তে পারেনি, আজও তারা এই সংকীর্ণ অন্ধকার কারাগারে বন্দি হয়ে পুনর্বার দেহধারণের জন্যে তপস্যা করছে।'

হঠাৎ বীরেন সভয়ে চিৎকার করে উঠল।

—'কী হল বীরেনবাবু?'

বীরেন কাঁপতে কাঁপতে একটা নরমুণ্ডের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলে।

—'ওখানে কী?'

—'ওর কোটরের মধ্যে চোখ জ্বলজ্বল করছে!'

জয়ন্ত বিস্মিত হয়ে দেখলে, সত্যই তাই—জ্বলন্ত চক্ষুকোটর! জ্বলছে, একটু একটু নড়ছে! কিন্তু সে ভয় পেলে না, হাতের টর্চের সাহায্যে নরমুণ্ডটাকে ঠেলে দিলে—কোটর ছেড়ে বেরিয়ে এল একটা ত্রস্ত টিকটিকি!

শুকনো হাসি হেসে মানিক বললে, 'সত্যি ভাই জয়ন্ত, আমারও বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল! এমনি করেই লোকে ভূত দেখে!'

এখন তারা সত্য-সত্যই এসে দাঁড়িয়েছে নিরবচ্ছিন্ন তমসাবৃত পাতালপ্রদেশে। তাদের চারিপাশ ঘিরে থমথম করছে নিঃসাড় মৃত্যুর মতো বুকচাপা এক অখণ্ড নিস্তব্ধতা এবং মানুষের কল্পনাতীত সেই নিদ্রায়মান ও প্রগাঢ় স্তব্ধতার মধ্যে তাদের অনুচ্চ কণ্ঠস্বরগুলোও শোনাচ্ছিল কর্ণপটহভেদী দামামানির্ঘোষের মতো।

জয়ন্ত ও মানিক লণ্ঠন দুটো মাথার উপরে উঁচু করে তুলে ধরলে ভালো করে চারিদিক পর্যবেক্ষণ করবার জন্যে।

প্রথমেই চোখে পড়ল গর্ভগৃহের লৌহকপাট; এত ছোটো যে দ্বারপথ দিয়ে ভিতরে ঢুকতে গেলে মাথা নামিয়ে হেঁট না হলে চলবে না।

জয়ন্ত সচকিতকণ্ঠে বললে, 'এ কী! দরজার পাল্লা দু-খানা যে খোলা!'

মানিক বললে, 'এ বোধহয় চন্দ্রনাথবাবুর কীর্তি! গুপ্তধন পাওয়ার আনন্দে আকুল হয়ে তিনি যাবার সময়ে দরজা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলেন।'

জয়ন্ত আশ্বস্ত হয়েছে বলে মনে হল না। তবু মুখে বললে, 'তাই হবে। তবে আজ যখন ইঁদারার জল শুকিয়ে গিয়েছে, দরজা খোলা থাকলেও কোনো ক্ষতি হবে না।'

তারপর সে খুব মন দিয়ে দরজার কাছটা দেখতে দেখতে বললে, 'দ্যাখো মানিক, ইঁদারার এখানটা পাথর দিয়ে শক্ত করে গড়া। আর ওস্তাদ কারিগররা পাথরের গায়ে এমন নিপুণ হাতে লোহার কপাট বসিয়েছে যে একফোঁটা জলও ভিতরে ঢুকতে পারবে না।'

মানিক বলল, 'দরজা গড়তে নিশ্চয় খুব ভালো ইস্পাত ব্যবহার করা হয়েছে। কত কাল জলের তলায় ডুবে ছিল, তবু মরচে ধরেনি।'

উদগ্র আগ্রহে ও দুঃসহ কৌতূহলে বীরেনের তখন আর তর সইছিল না। সে এগিয়ে গিয়ে বললে, 'আসুন, আমরা ভিতরে প্রবেশ করি!'

জয়ন্ত বাধা দিয়ে বললে, 'আরে মশাই, দাঁড়ান! লণ্ঠনের সঙ্গে সকলে টর্চ ব্যবহার করুন। কে জানে ভিতরে কী বিপদ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে!'

তাড়াতাড়ি পিছোতে পিছোতে বীরেন বলল, 'বিপদ? কী বিপদ?'

—'এই পাতালপুরীতে বহুকাল পরে দরজা খোলা পেয়ে এর ভেতরে শখের বাসা বাঁধতে পারে কেউটে, কি গোখরো, কি ময়াল সাপ! কেউ বিষ ছড়ায়, কেউ পিষে মারে!'

আরও পিছিয়ে গেল বীরেন। শোনা গেল, তার অনুচ্চ কণ্ঠে উচ্চারিত হল বিপৎকালে প্রথমেই যা মনে আসে সেই 'বাবা' শব্দটি।

তিন-তিনটে সঞ্চরমান আলোকশিখায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগল একখানা মাঝারি আকারের পাথুরে ঘরের এদিক এবং ওদিক। কিন্তু ভয়াল ময়াল বা কোনোজাতীয় বিষধর সরীসৃপ আত্মপ্রকাশ করলে না।

নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরের ভিতরে পদার্পণ করে জয়ন্ত বিস্মিত স্বরে বললে, 'কিন্তু কোথায় আছে গুপ্তধন? এ যে একেবারে খালি ঘর!'

বীরেন বললে, 'এখানে এসেও মাটি কোপাতে হবে নাকি?'

চতুর্দিকে ক্ষিপ্র দৃষ্টি সঞ্চালন করে যা দেখবার সব দেখে নিয়ে জয়ন্ত বললে, 'মাটি? কোথায় মাটি? এখানে সব পাথর! আমাদেরও পাথুরে কপাল!'

মানিক বললে, 'আমরা নির্বোধ! গাছে কাঁঠাল আছে ভেবেই গোঁফে তেল মাখিয়েছি, কিন্তু তার আগেই কাঁঠাল হয়েছে বুদ্ধিমানের হস্তগত!'

বীরেন হতাশভাবে বললে, 'এ তাহলে প্রতাপ চৌধুরির কাজ!'

জয়ন্ত বললে, 'তাহলে মানতে হবে যে প্রতাপ চৌধুরি হচ্ছে অত্যন্ত ত্বরিতকর্মা।'

মানিক বললে, 'জয়ন্ত, তুমি ভুলে যাচ্ছ যে চন্দ্রনাথবাবুর লেখা সম্পূর্ণ খাতা আমরা পড়বার সুযোগ পাইনি, তার খানিকটা অংশ হস্তগত হয়েছে প্রতাপ চৌধুরির আর সেই অংশটাই হচ্ছে হয়তো আসল অংশ। সেটুকু ছিঁড়ে নিয়ে প্রতাপ বাকি কাগজগুলো তুচ্ছ ভেবে ফেলে দিয়ে গেছে!'

জয়ন্ত চিন্তান্বিত মুখে বললে, 'কিন্তু—কিন্তু এক জায়গায় তবু খটকা থেকে যাচ্ছে!'

—'কোন জায়গায়?'

জয়ন্ত জবাব দেবার আগেই আচম্বিতে ঝনঝন শব্দে পাতালপুরীর সেই কক্ষটা ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল।

সকলে সবিস্ময়ে সচকিত চক্ষে দেখলে, ঝন-ঝন-ঝনাৎ করে বন্ধ হয়ে গেল লৌহকপাট!

জয়ন্ত বেগে ছুটে গিয়ে দরজার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে দুই হাতে টানাটানি করতে লাগল, কিন্তু কপাট খুলল না, একটু নড়লও না। সে ফিরে দাঁড়িয়ে তিক্ত হাসি হেসে বললে, 'মানিক, মানিক, রসাতলের কারাগারে আমরা বন্দি হলুম!'

॥ দশম অধ্যায় ॥

অঘটন সংঘটন রহস্য

খানিকক্ষণ কারুর মুখ দিয়েই হল না বাক্য-নিঃসরণ।

সেই ভূগর্ভগৃহের স্তব্ধতা এমন নিবিড় যে, হাতঘড়ির ক্ষীণ টিকটিক শব্দকেও মনে হয় উচ্চরোল!

জয়ন্ত শুধোলে, 'ঘড়িতে ক-টা বেজেছে?'

মানিক দেখে বললে, 'সাড়ে পাঁচটা।'

—'হুঁ। বাইরের পৃথিবী এখন সন্ধ্যার ছায়াছবির জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। তারপর ফুটবে কালো রাত। তারপর আবার আসবে রঙিন প্রভাত। তারপর আবার হবে জ্যোতির্ময় সূর্যোদয়। কিন্তু আমরা আবার তা দেখতে পাব না। কী বলো মানিক?'

—'লণ্ঠন দুটোর তেল কাল সকালেই বোধহয় ফুরিয়ে যাবে। টর্চের আলো দেবার শক্তিও বেশিক্ষণ নয়। তারপর আমরা দেখব খালি অন্ধ-করা অন্ধকার। যতক্ষণ বাঁচব ততক্ষণ।'

—'কিন্তু সে কতক্ষণ মানিক? আমাদের সঙ্গে না আছে জল, না আছে খাবার।'

বীরেন একেবারে বোবা।

জয়ন্ত ঘরের ভিতরে এক চক্কর ঘুরে এসে বললে, 'কিন্তু দরজা বন্ধ করতে পারে কে?'

মানিক বললে, 'এক পারেন সুন্দরবাবু। কিন্তু এমন সাংঘাতিক কৌতুক তিনি করবেন বলে বিশ্বাস হয় না।'

—'আর পারে প্রতাপ চৌধুরি।'

—'কিন্তু ইঁদারার মুখে পাহারায় আছেন সুন্দরবাবু।'

—'হয়তো তিনিও বন্দি। কিংবা নিহত। প্রতাপ চৌধুরির নরহত্যায় আপত্তি নেই।'

—'আমরা কিন্তু উপর থেকে রিভলভারের বা সংকেত-বাঁশির আওয়াজ

শুনতে পাইনি। হয়তো উপর থেকে কোনো আওয়াজই এত নীচে পর্যন্ত এসে পৌঁছয় না।'

—'কিংবা সুন্দরবাবু রিভলভার কি বাঁশি ব্যবহার করবার সময় পাননি।'

—'অমনি একটা কিছু হয়েছেই। কিন্তু ফল একই। আমাদের মরতে হবে।'

বীরেন কাঁদো কাঁদো গলায় বললে, 'এইভাবে মরব বলেই কি জন্মেছিলুম? অন্ধকারে, অনাহারে, দিনে দিনে, তিলে তিলে?'

জয়ন্ত বললে, 'প্রতাপ চৌধুরি আরও দু-বার আমাদের যমালয়ে পাঠাবার জন্যে বন্দি করেছিল। দু-বারই আমাদের রক্ষা করেছিল অঘটন-ঘটন-পটীয়সী নিয়তি।'

—'কিন্তু, এবারে তার পুনরাভিনয়ের কোনো সম্ভাবনাই দেখছি না।'

—'মানিক, চিরদিনই আমি নিয়তিবাদী। আজও নিয়তির উপরে নির্ভর করা ছাড়া আমাদের আর কোনোই উপায় নেই।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে মানিক বললে, 'তাই বটে।'

আবার কিছুক্ষণব্যাপী নীরবতা। আবার কানে জাগে হাতঘড়ির টিক-টিক-টিক-টিক।

জয়ন্ত বললে, 'একটু আগেই যা বলেছিলুম। প্রতাপ চৌধুরির যুদ্ধকৌশলের কথা। তার পদ্ধতি কিছুমাত্র বদলায়নি। সে নিজে দেখা দেয় না। কিন্তু শত্রুদের বন্দি করে। সেরা শিল্পীদের পদ্ধতি বদলায় না। অপরাধের আর্টে প্রতাপ চৌধুরিকে সেরা শিল্পী বলে মানতেই হবে।'

বীরেন ভাঙা ভাঙা স্বরে বললে, 'জয়ন্তবাবু, এই কি অপরাধের আর্ট নিয়ে আলোচনা করবার সময়?'

জয়ন্ত শান্ত কণ্ঠে ধীরে ধীরে বললে, 'তা ছাড়া আর কী করবেন ভাই?'

—'আর কিছুই করবার নেই?'

—'কিছু না, কিছু না!'

—'ভালো করে দেখেছেন?'

—'কী?'

—'দরজাটা সত্যই বন্ধ কি না?'

—'আপনার কি সন্দেহ হচ্ছে?'

—'কী জানি, যদি—'

—'বেশ, আপনিও একবার টেনে দেখুন না!'

—'তা একবার দেখলে ক্ষতি কী?'

—'কোনো ক্ষতি নেই। কিছু না করার চেয়ে একটা কিছু করা ভালো। যান আপনিও দরজা ধরে টানাটানি করে আসুন। খানিকটা সময় তবু কাটবে।'

বীরেন পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল জীবনহীন যন্ত্রচালিত পুত্তলের মতো—তার মুখে নেই কোনোরকম উৎসাহের ভাব। জয়ন্ত ও মানিক তার দিকে ফিরেও তাকালে না।

বীরেন আংটা ধরে খুব জোরে এক টান মারলে এবং সঙ্গে সঙ্গে হুড় হুড় ঝনঝন করে বন্ধ দরজার পাল্লা আবার খুলে গেল!'

শব্দ শুনে চমকে জয়ন্ত ও মানিক মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলে। নিজেদের চোখকেও তারা বিশ্বাস করতে পারলে না, ভাবলে তারা জেগে-জেগেই দেখছে কোনো অসম্ভব স্বপ্ন!

না এ ভোজবাজি—বীরেন জাদুর খেলা জানে?

বীরেনও হতভম্ব—তার মুখ দিয়ে হল না বাক্যস্ফূর্তি!

জয়ন্ত আচ্ছন্নের মতো বললে, 'হ্যাঁ মানিক, আমি ভুল দেখছি না তো? সত্যিই কি দরজাটা খুলে গেছে?'

দুই হাতে দুই চোখ কচলে আর-একবার ভালো করে দেখে মানিক বললে, 'দরজা তো খোলাই রয়েছে দেখছি!'

—'কিন্তু আমি শপথ করে বলতে পারি, দরজা ছিল বাইরে থেকে বন্ধ!'

বীরেন বললে, 'না, বন্ধ ছিল না! আমি একবার টানতেই খুলে গেল!'

—'আর আমি একবার-দু-বার নয়, প্রাণপণে টেনে দেখেছি বার বার!'

মানিক বললে, 'তাহলে একটু আগে তুমি যা বলেছিলে—এ হচ্ছে সে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী নিয়তির লীলা!'

—'না মানিক, কেউ বাইরে থেকে দরজাটা আবার খুলে দিয়েছে!'

—'কে খুলে দেবে? সুন্দরবাবু? কিন্তু সুন্দরবাবু কি আমাদের সঙ্গে এমন নিষ্ঠুর রসিকতা করবেন?'

—'আমার বিশ্বাস হয় না। দ্যাখো তো, বাইরে কেউ দাঁড়িয়ে আছে কি না।'

মানিক বাইরে ছুটে গেল এবং তারপর চেঁচিয়ে বললে, 'এখানে কেউ নেই। কেবল একটা কৌতূহলী তক্ষক খবরদারি করবার জন্যে ইঁদারার গা বয়ে নেমে এসেছিল, আমাকে দেখে আবার উপর দিকে চম্পট দিলে!'

জয়ন্ত বেকুবের মতো মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, 'মানিক, সত্য-সত্যই একটা কোনো অঘটন ঘটেছে, কিন্তু সেটা যে কী আমি বুঝতে পারছি না!'

—'হয়তো সুন্দরবাবু এ অদ্ভুত সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। উপরে চলো।'

—'তাই চলো। রত্নকুঠি তো রত্নহীন, এখানে আর থেকেই বা লাভ কী?'

পাতালের অন্ধকার উদর ছেড়ে তারা এসে উঠল পৃথিবীর উপরে রাতের অন্ধকারের কোলে। সর্বাঙ্গে নিবিড় কালিমা মেখে জঙ্গলের বড়ো বড়ো গাছগুলো কী যেন নৈশ রহস্য নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে কানাকানি করছে মর্মরভাষায়। থেকে থেকে বাতাসের দীর্ঘশ্বাস এবং সঙ্গে সঙ্গে কূলে কূলে লিখে চলেছে অদূরবর্তিনী গঙ্গা তার মুখর তরঙ্গকাহিনি।

জয়ন্ত ডাকলে, 'সুন্দরবাবু, সুন্দরবাবু! অন্ধকারে কোথায় গা ঢেকে পাহারা দিচ্ছেন?'

কিন্তু কেউ সাড়া দিলে না।

মানিক বললে, 'সুন্দরবাবু ঘুমিয়ে পড়েননি তো?'

জয়ন্ত বললে, 'সেটা সম্ভব নয়। আমার মন আবার বলছে, একটা কোনো অঘটন ঘটেছেই!'

—'কী অঘটন?'

—'খোলা দরজা আপনি বন্ধ হয়, বন্ধ দরজা আপনি খুলে যায়, সুন্দরবাবু পাহারা না দিয়ে অদৃশ্য হয়ে থাকেন, এ সবই তো অঘটন! মানিক, তুমি একদিকে যাও, বীরেনবাবু, আপনি আর একদিকে যান, আর আমি যাই এই দিকে। দেখা যাক সুন্দরবাবুকে খুঁজে পাই কি না!'

মাঠের ও নদীর মধ্যবর্তী এই জঙ্গুলে জায়গাটায় রাত-আঁধারে লোকজন পদার্পণ করে না। জমি এবড়ো-খেবড়ো এবং খানা-ডোবায় দুর্গম। সহজে সুন্দরবাবুর পাত্তা পাওয়া যাবে বলে কেউ মনে ভাবেনি। কিন্তু তাদের সৌভাগ্যক্রমে একটুখানি অগ্রসর হয়েই সফল হল খোঁজাখুঁজি।

একটা ঝোপ দুলছে ঘনঘন। যেন কোনো জন্তু তার মধ্যে ঢুকে ছটফট করছে। সেই দিকে আকৃষ্ট হল মানিকের দৃষ্টি।

ঝোপের খানিকটা এক হাতে সরিয়ে আর এক হাতে তার মধ্যে আলো ফেলে মানিক সচমকে দেখলে, সেখানে ভূশয্যাশায়ী সুন্দরবাবু একসঙ্গে রজ্জুবদ্ধ পদযুগল ছুড়ছেন আর ছুড়ছেন! কেবল পা নয়, তাঁর বাহুযুগলও দড়ি দিয়ে পিছমোড়া করে বাঁধা এবং মুখ ও চোখের উপরে রয়েছে কাপড়ের বন্ধনী!

সুন্দরবাবুকে তাড়াতাড়ি বন্ধনমুক্ত করতে করতে মানিক ফুকরে উঠল, 'জয়ন্ত, জয়ন্ত! সুন্দরবাবুকে পেয়েছি!'

সুন্দরবাবুর বিপুল ভুঁড়ি ফুলতে ও চুপসে যেতে লাগল কামারের হাপরের মতো। বেশ কিছুক্ষণ নির্বাকভাবে হাঁপিয়ে নিয়ে তিনি সর্বপ্রথমে উচ্চারণ করলেন তাঁর সেই চিরপ্রিয় শব্দ—'হুম!'

এতক্ষণে সুন্দরবাবু বাকশক্তি পেয়েছেন বুঝে জয়ন্ত শুধোলে, 'আপনার এ দশা করলে কে?'

—'চোখে দেখিনি, তবে পরে কানে শুনে আন্দাজ করেছি।'

—'কিছুই বুঝলুম না।'

—'এখন বেশি বুঝিয়ে বলবার শক্তি নেই। তবে আসল কথাগুলো শর্টে বলতে পারি। তোমরা ইঁদারায় নেমে গেলে। আমি ঠায় বসে বসে পাহারা দিতে লাগলুম। কোথাও কারুর সাড়া পর্যন্ত নেই, অথচ আচমকা পশ্চাদভাগ থেকে আমার কানের ঠিক পিছন কে এসে বেমক্কা মুষ্টিপ্রহার করলে—মুষ্টিযোদ্ধারা যাকে বলে 'র‍্যাবিট পাঞ্চ'। এরকম ঘুসি মানুষকে তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান করে দেয়—আমিও একেবারে বেহুঁশ! জ্ঞান হলে পর দেখি আমার এই অবস্থা! আমার চোখ বন্ধ, মুখ বন্ধ, আমি চলচ্ছক্তিহীন! কেবল কান খোলা ছিল বলে শুনতে পাচ্ছিলুম। শুনলুম অনেকগুলো পায়ের শব্দ। শুনলুম, কে বললে—'বড়োবাবু, লোহার দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছি।' তারপর বোধহয় বড়োবাবুই বললে—'দড়ির সিঁড়িটা টেনে তুলে রেখে দে!' আমাকেও কারা হিড়হিড় করে টেনে এই ঝোপের ভেতরে লুকিয়ে রাখলে। তারপর বোধকরি সেই বড়োবাবুই বললে—'চল এইবারে! আর কোনো খলিফা আমাদের পিছনে জ্বালাতে আসবে না, আমরা নিশ্চিন্ত!' তারপর পায়ের শব্দ আর শোনা গেল না। সব নিঝুম।' সুন্দরবাবু থামলেন। আবার হাঁপাতে লাগলেন।

—'তারপর আর কিছু বলবার নেই?'

—'নেই মানে? আলবত আছে! তারপরেই তো আসল বলবার কথা। কিন্তু একটু রও ভাই! আর একটু না হাঁপিয়ে জুত করে বলতে পারছি না—আমাতে কি আর আমি আছি দাদা?'

মিনিটখানেক আরও খানিকটা হাঁপিয়ে নিয়ে ও আরও খানিকটা প্রকৃতিস্থ হয়ে সুন্দরবাবু বললে, 'হ্যাঁ, তারপর কী হল শোনো। খানিকক্ষণ ঝিঁঝিপোকাগুলোর একটানা গান ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না। তারপর আশপাশের ঝিঁঝিপোকাগুলো আচমকা গান বন্ধ করে দিলে। আবার একজন মানুষের পায়ের শব্দ আমার পাশেই এসে থামল। আমি তো 'নট নড়ন-চড়ন নট কিচ্ছু'র উপরেও আরও বেশি আড়ষ্ট হয়ে গিয়ে ভাবতে লাগলুম—এইবারে, সেরেছে! এবারে বুঝি আমার প্রাণ নিয়েই টানাটানি করতে এল! তারপরেই শুনি—না, সে সব নয়, এ আবার নতুন ব্যাপার, যাকে বলে কল্পনাতীত! কে একজন আমার কানের কাছে মুখ এনে বললে—'সুন্দরবাবু, ভালো করে শুনে রাখুন! আমি

আবার দড়ির সিঁড়িটা ইঁদারার ভেতরে ঝুলিয়ে রেখেছি আর লোহার কবাটও খুলে দিয়েছি। আপনার কোনো ভয় নেই, জয়ন্তবাবুরা এখনই এসে আপনাকে উপস্থিত বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন। তাঁদের বলবেন, প্রতাপ চৌধুরি তার দলবল নিয়ে বীরেনবাবুদের সাবেক বাড়ির দিকে গিয়েছে।' তারপর আবার পায়ের শব্দ, আবার সব চুপচাপ, আবার শুরু হল ঝঞ্ঝাটে ঝিঁঝিদের ঝাঁজরা গলায় ঝিমিঝিমি চিৎকার! সেই একঘেয়ে ঝিঝিঝিঁঝি আওয়াজ শুনতে শুনতে আমার সর্বাঙ্গ যেন ঝিন ঝিন আর মাথাটাও ঝিম ঝিম করতে লাগল। কিন্তু সেই অবস্থাতেই আমি আন্দাজ করতে পারলুম, দুরাত্মারা তোমাদের বন্দি করে দড়ির সিঁড়ি উপরে তুলে নিয়েছিল। তার কতক্ষণ পরে শুনলুম, তোমাদের ডাকাডাকি! আমি তো ব্রাদার, পড়ে গেলুম মহা ফাঁপরে।—কী করে তোমাদের জানাই যে আমার পক্ষে এখন সাড়া বা দেখা দেওয়া দুইই অসম্ভব! কিন্তু হাজার হোক আমি হচ্ছি গিয়ে প্রাচীন সৈনিক, ঝাঁ করে বুদ্ধি খুলে গেল! বুঝে ফেললুম, আমি চলতে না পারলেও বাঁধা পা দুটো ছুড়ে ছুড়ে অনায়াসেই ঝোপ নেড়ে তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি! তারপর আর কী—হুম!'

সুন্দরবাবুর শেষ কথাগুলো জয়ন্ত যেন শুনছিল না, সে হঠাৎ চিন্তামগ্ন হয়ে পড়ল।

মানিক বললে, 'জয়ন্ত, সব শেষে যে লোকটা সুন্দরবাবুর কাছে এসেছিল, সে নিশ্চয়ই সেই সন্ন্যাসী! কে সে জয়ন্ত, তাকে আমরা চিনি না, সে কিন্তু আমাদের সকলকেই চেনে, আর তার দৌলতেই আজ আমরা রসাতলের কারাগার থেকে ছাড়ান পেয়েছি!'

জয়ন্ত হঠাৎ একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে সানন্দে চেঁচিয়ে বললে, 'আবার তার অনুগ্রহেই আজ প্রতাপ চৌধুরি সদলবলে ধরা পড়তে পারে!'

মানিক বললে, 'বুঝেছি তোমার মনের কথা! তুমি এখনই বীরেনবাবুর বাড়ির দিকে ধাওয়া করতে চাও?'

—'নিশ্চয়ই! এ সুযোগ কে ছাড়ে?'

—'কিন্তু দুটো মুশকিল আছে। প্রথমত সেখানে পায়ে হেঁটে গিয়ে পৌঁছতে রাত কাবার হয়ে যেতে পারে। ততক্ষণ কি তারা থাকবে?'

—'আর দ্বিতীয় মুশকিল?'

—'দলে তারা ভারী।'

—'মাভৈঃ! উঠুন সুন্দরবাবু! স্থানীয় পুলিশের থানার দিকে দ্রুত পদচালনা করুন। আপনি সম্প্রতি অবসর নিলেও বাংলা দেশের পুলিশ বিভাগে সুপরিচিত

ব্যক্তি। খবর দিন, বিখ্যাত ডাকাত, হত্যাকারী আর ফেরারি আসামি প্রতাপ চৌধুরির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। তাকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে সাহায্য প্রার্থনা করুন। প্রতাপকে ধরবার জন্যে সরকার পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। সুতরাং এই মস্ত সুখবরটা পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই পুলিশের তৎপরতা তিনগুণ বেড়ে উঠবে। একদল বন্দুকধারী সেপাই চাই! যেমন করে হোক, সকলকে তাড়াতাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে দু-তিন খানা মোটরগাড়িও দরকার!'

মানিক বললে, 'এ সব আয়োজন করতে করতেও রাত পুইয়ে যেতে পারে।'

—'যাক। প্রতাপ চৌধুরি আজ বীরেনবাবুর বাড়িতেই রাত কাটাবে বলে মনে হয়। তাদের বিশ্বাস আমরা এখনও বন্দি, তারা নিরাপদ।'

॥ একাদশ অধ্যায় ॥

প্রতাপ চৌধুরির শাগরেদ

সে হচ্ছে রাত্রি ও দিবসের মিলনলগ্ন। আকাশ নিবিয়ে দিচ্ছিল তারার বাতি, বিদায়ী আঁধার আসর ছেড়ে সরে যাচ্ছিল ধীরে ধীরে এবং উদয়াচলে চলছিল তখন দীপ্তোজ্জ্বল রঙের খেলার মোহনীয় আয়োজন! বাতাসে নূতন দিনের ঠান্ডা ছোঁয়া এবং বিহঙ্গরা রচনা করেছিল আলোকোৎসবের বন্দনাসংগীত। চিরদিনই আসে এই অন্ধকারের পরে এই আলোর পালা, কিন্তু কখনও একঘেয়ে মনে হয় না এর তাজা মাধুর্যটুকু।

কিন্তু মাধুর্যের মাঝখানেও, এই সৌন্দর্যের কাব্যলোকেও মানুষ করে ছন্দভঙ্গ। সেই সম্ভাবনাই দেখা দিয়েছে আজ বীরেনবাবুর বসতবাড়ির চারিপার্শ্বে! সেখানে কোনো রক্তাক্ত নাট্যাভিনয়ের মহলা চলছে।

পাছে অপরাধীরা সাড়া পায়, সেই ভয়ে ঘটনাস্থল থেকে খানিক তফাতে মোটর থামিয়ে পুলিশের লোকরা চুপিচুপি গ্রামের ভিতরে প্রবেশ করেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অধিকাংশই তখনও শয্যার আশ্রয় ছাড়েনি। মাত্র কয়েকজন বয়স্ক লোক সবে বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে এবং গৃহস্থদের কয়েকজন বউ-ঝি কলসি কাঁখে নিয়ে চলেছে এ-বাড়ির ও-বাড়ির পুকুরঘাটে।

হঠাৎ সকলে সভয়ে ও সবিস্ময়ে দেখলে, পুলিশবাহিনী এসে বাগান-বাড়ির চারিদিক ঘিরে ফেললে। গ্রামের পুরুষরা বিস্ফারিত নেত্রে দাঁড়িয়ে রইল, মেয়েদের আর জলকে যাওয়া হল না, শূন্য কলস নিয়ে ভীত-চকিত চক্ষে যে যার বাড়ির দিকে ফিরে চলল দ্রুতচরণে।

বাগচিদের অর্থাৎ বীরেনবাবুদের বাড়িখানা ছিল একটা ফর্দা জায়গার মাঝখানে। সেকেলে তিনমহলা বাড়ি। বাড়ি ঘিরে আগে ছিল যে বাগান, তা এখন পরিণত হয়েছে ছোটোখাটো একটি মাঠে। বাড়ির সীমানা নির্দেশের জন্যে বেড়া দেওয়া আছে বটে, কিন্তু ফটকের বাধা নেই, গ্রামের লোকজনরাও অনায়াসে সীমানার ভিতরে এসে মস্ত পুকুরটার জল ব্যবহার করে।

সুন্দরবাবু, মানিক ও বীরেনকে নিয়ে জয়ন্ত আত্মগোপন করে পিছন দিকে অবস্থান করতে লাগল, থানার দারোগাবাবু কতক লোক নিয়ে বাড়ির সদরের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং বাকি লোকদের মোতায়েন রাখলেন চারিদিকে পাহারা দেবার জন্যে।

নিরাপদ ব্যবধানে থেকেও বাড়ির যতটা কাছে যাওয়া যায় ততটা কাছে গিয়ে দারোগাবাবু গলা চড়িয়ে হাঁক দিলেন, 'বাড়ির ভেতরে কে আছে? বাইরে বেরিয়ে এসো।'

এতক্ষণ দোতলার একটা জানালায় জেগে ছিল একখানা মুখ। দূর থেকে সে লক্ষ করছিল পুলিশের কাণ্ডকারখানা। কিন্তু দারোগাবাবুর নির্দেশবাণী শোনার সঙ্গে-সঙ্গেই তার মুখখানা আর দেখা গেল না।

কয়েক মিনিট কাটল। সদর দরজাও খুলল না বা বাড়ির ভিতর থেকেও এল না কোনো সাড়াশব্দ।

দারোগাবাবু আবার হাঁকলেন, 'দরজা খোলো। নইলে আমরা দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকব।'

তখনও কেউ সাড়া দিলে না।

মিনিট-দুয়েক অপেক্ষা করে দারোগাবাবু চেঁচিয়ে হুকুম দিলেন, 'ভাঙো তবে দরজা। যে বাধা দেবে তাকেই গুলি করে কুকুরের মতো মেরে ফেলবে।'

বাড়ির ভিতর থেকে কে বললে, 'দরজা ভাঙতে হবে না। আমরা বাধা দেব না, আত্মসমর্পণ করব।'

—'উত্তম! বেরিয়ে এসো একে একে।'

দরজা খুলে গেল। পরে পরে নয়জন লোক বাইরে এসে দাঁড়াল—প্রত্যেককে দেখলেই দুর্দান্ত ও দুশমন বলে চিনতে দেরি হয় না। প্রত্যেকের হাতে পরিয়ে দেওয়া হল লোহার হাতকড়া। তখন প্রত্যেকেরই জামাকাপড়ের ভিতর থেকে বেরুল কোনো-না-কোনো মারাত্মক অস্ত্র।

কুখ্যাত প্রতাপ চৌধুরি সদলবলে এমন শান্তশিষ্টের মতো ধরা দিল দেখে জয়ন্তের বিস্ময়ের আর সীমা রইল না, সে তাড়াতাড়ি সামনের দিকে এসে

বন্দিদের মুখের উপরে চোখ বুলিয়ে বলে উঠল, 'কোথায় প্রতাপ চৌধুরি? তোমার কেউ প্রতাপ চৌধুরি নও!'

বন্দিদের একজন হেসে বললে, 'আমরা কেন প্রতাপ চৌধুরি হতে যাব? বাপ-মা আমাদের অন্য নাম রেখেছে!'

দারোগাবাবু ধমক দিয়ে বললেন, 'চোপরাও বদমাশ! আবার রসিকতা হচ্ছে? বল কোথায় প্রতাপ চৌধুরি?'

—'জানি না। প্রতাপ চৌধুরি বলে কারুকে আমরা চিনি না।'

জয়ন্ত বললে, 'দারোগাবাবু, আমার সঙ্গে কিছু লোক দিন, বাড়ির ভিতরটা খুঁজে দেখব।'

তন্ন তন্ন করে তল্লাশের পরেও প্রতাপ চৌধুরিকে পাওয়া গেল না।

দেখা গেল, খিড়কির দরজাটা খোলা। সন্দেহজনক! খিড়কি খোলা কেন? ভাবতে ভাবতে জয়ন্ত বাড়ির বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। দেখলে সেখানটা গাছপালায় আচ্ছন্ন। অল্প দূরেই পুকুরের একটা ঘাট।

জয়ন্ত বললে, 'দ্যাখো মানিক, প্রথম ভোরের আধা-অন্ধকারে কেউ যদি এই ছায়াঢাকা পথ দিয়ে পুকুরঘাটে যায়, তাহলে সহজে সে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না।'

মানিক জিজ্ঞাসু চোখে বললে, 'কী বলতে চাও তুমি?'

জয়ন্ত জবাব না দিয়ে ঘাটের দিকে অগ্রসর হল। এদিকে-ওদিকে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল।

একজন আধবুড়ো পাহারাওয়ালা খানিক দূরে পাহারায় নিযুক্ত ছিল।

তার কাছে গিয়ে জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, 'একটু আগে কোনো লোককে দেখেছ?'

—'কোন লোক? পুরুষমানুষ? না।'

—'তবে কি এখানে কোনো স্ত্রীলোক ছিল?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। গাঁয়ের কোনো স্ত্রীলোক। মেটে কলসিতে জল নিতে এসেছিল— এখানে আসতে আসতে এমন অনেক মেয়েকেই তো দেখলুম!'

—'তারপর?'

—'তারপর পুলিশ দেখে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে পালিয়ে গেল।'

—'ঘোমটায় মুখ ঢেকে?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'কোন দিকে গেল?'

বাড়ির পিছন দিকের একটা পায়ে চলা পথ দেখিয়ে দিয়ে সে বললে, 'ওইদিকে।'

—'কেন তুমি তাকে ছেড়ে দিলে?'

—'সে কী বাবু? আমরা এই বাড়ির ভিতরকার দুশমনদের ধরতে এসেছি, গাঁয়ের ভদ্দরলোকের মেয়ে ধরব কেন? সে তো বাড়ির ভেতরেও ছিল না।'

—'ঠিক দেখেছ?'

—'ঠিক দেখেছি। মেয়েমানুষটি কাঁকালে কলসি নিয়ে নীচে থেকে উঠেছিল পুকুরের ঘাটের উপরে।'

জয়ন্ত ফিরে বললে, 'বীরেনবাবু, এই পায়ে-চলা পথটা কি গাঁয়ের দিকে গিয়েছে?'

বীরেন বললে, 'না, গঙ্গার দিকে। ওই বাঁশঝাড়টার পরেই কলাবাগান, তার পরেই গঙ্গা—বাড়ির দোতলা থেকে দেখা যায়।'

জয়ন্ত বললে, 'এখন আর পরিতাপ করে লাভ নেই। আমাদের এত চেষ্টা ব্যর্থ হল!'

সুন্দরবাবু চমকিত মুখে বললেন, 'জয়ন্ত, জয়ন্ত, তুমি কি বলতে চাও সেই স্ত্রীলোকটা—'

—'স্ত্রীলোক নয়, পুরুষ। প্রতাপ চৌধুরি নারীর ছদ্মবেশ ধারণ করে পাহারাওয়ালার চোখে ধুলো দিয়েছে। সে পালাবার যথেষ্ট সময় পেয়েছে, এখন আর তাকে ধরবার উপায় নেই, তবু ওদিকটা একবার ঘুরে আসি চলুন!'

সবাই দ্রুত পদচালনা করলে, তারপর আচম্বিতে দেখলে এক কল্পনাতীত অদ্ভুত দৃশ্য!

॥ দ্বাদশ অধ্যায় ॥

গুপ্ত নয়, ব্যক্ত ধন

বাঁশঝাড় আর কলাবাগানের মাঝখানে, পায়ে-চলা পথের পাশে খানিকটা জঙ্গুলে জমি। সেইখানে ভয়াবহ বীভৎসতায় সোনালি সকালের আনন্দকে বিষাক্ত করে তুলে মাটির উপরে পড়ে আছে রক্তধারার মধ্যে দুটো রক্তাক্ত নরদেহ—একটা মৃত ও আড়ষ্ট এবং আর একটা মৃতবৎ হলেও তখনও জীবিত। সকলে দাঁড়িয়ে পড়ল বিপুল বিস্ময়ে স্তম্ভিতের মতো।

এই অপ্রত্যাশিত দৃশ্য তাদের মুখের কথা কেড়ে নিলে কিছুক্ষণ পর্যন্ত। তারপর সর্বাগ্রে নিজেকে সামলে নিয়ে মৌন ভঙ্গ করলে জয়ন্ত। মৃতদেহটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে সে বললে, 'দ্যাখো মানিক, পুরুষের দেহে নারীর শাড়ি! ওকে চিনতে পারছ?'

সুন্দরবাবু চমৎকৃত মুখে বলে উঠলেন, 'আরে হুম! ওই তো ফেরারি প্রতাপ চৌধুরি! ওর বুকে বেঁধা একখানা ছোরা, ওকে মারলে কে?'

—'আমি!'

যে বললে তার মাথায় জটা, মুখে দাড়ি-গোঁফ। অঙ্গে গৈরিক বস্ত্র। চিত হয়ে শুয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে সে বললে, 'প্রতাপ চৌধুরিকে আমিই বধ করেছি। আমাকে চিনতে পারেন জয়ন্তবাবু?'

—'না। কে আপনি?'

—'ছদ্মবেশ না থাকলে চিনতে পারতেন। আমি আর বেশিক্ষণ বাঁচব না। তাই যাবার আগে পরিচয়টা দিয়ে যাই। আমার নাম মানিকচাঁদ।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'কী আশ্চর্য! তুমি তো ছিলে প্রতাপ চৌধুরির প্রধান শাগরেদ, তারই সঙ্গে জেল ভেঙে পালিয়েছিলে!'

শ্বাস টানতে টানতে কষ্টের সঙ্গে মানিকচাঁদ বললে, 'হ্যাঁ ঠিক বলেছেন। কিন্তু তার পরের কথা আপনারা জানেন না। তার সঙ্গে জেল থেকে বেরিয়ে আমি প্রতিজ্ঞা করলুম, অসৎ পথে আর থাকব না, সৎ হব। প্রতাপ চৌধুরিকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলতে লাগলুম। সে হল আমার উপরে খড়্গহস্ত। আমি তার সমস্ত গুপ্তকথা জানতুম, সে আমাকে পৃথিবী থেকে একেবারে সরিয়ে দেবার জন্যে বারবার চেষ্টা করে। আত্মরক্ষার জন্যে আমি পালালুম, ছদ্মবেশ ধারণ করলুম। এমন হাঘরে যাযাবর-জীবন প্রাণ আমার অতিষ্ঠ করে তুললে। শেষটা তাকে পুলিশের হাতে আবার ধরিয়ে দিয়ে নিজে নিরাপদ হতে চাইলুম। তার অভিসন্ধি আমি জানতুম, নিজে আড়ালে থেকে তাকে চোখে চোখে রাখতে লাগলুম। আপনাদের কাছে তার খবর সরবরাহ করতুম। নিজের পরিচয় দিতে পারতুম না, কারণ আমিও ফেরারি আসামি।'

তার কথা ক্রমে ক্রমে ক্ষীণতর হয়ে এসে একেবারে বন্ধ হবার মতো হল। কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে আর একবার সামলে নিয়ে মানিকচাঁদ কোনোরকমে আবার বললে, 'আজ সে পালাচ্ছিল, আমি তাকে বাধা দি। সে রিভলভার ছোড়ে, তখন নিজে চরম আঘাত পেয়েও তার বুকে ছোরা বসিয়ে আমি প্রতিশোধ নি।'

তার অন্তিমকাল উপস্থিত বুঝে বীরেন তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলে, 'জগৎশেঠের রত্নকুঠির কথা আপনি কিছু জানেন?'

কিন্তু মানিকচাঁদ নির্বাক। তার দুই চক্ষু মুদে এল।

জয়ন্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'ভগবান মানিকচাঁদকে সৎপথের পথিক হবার সুযোগ দিলেন না বলে আমি দুঃখিত। আর বীরেনবাবু, আপনি ভাববেন না। এইবারে জগৎশেঠের রত্নকুঠি নিয়ে আপনার সঙ্গে আমি আলোচনা করব। চলুন।'

বাড়িতে আবার ফিরে এসে জয়ন্ত বললে, 'বীরেনবাবু, যে ঘর থেকে প্রতাপ চৌধুরি আপনার ঠাকুরদার গল্পের খাতার খানিকটা চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল, আমরা এখন সেই ঘরে গিয়েই বসতে চাই।'

বীরেন শ্রান্ত স্বরে বললে, 'কী হবে আর সেই গুদামঘরে গিয়ে? আমার মন ভেঙে পড়েছে, আর পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটতে ভালো লাগছে না।'

সুন্দরবাবু সায় দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ বীরেনবাবু, আমারও ওই মত্। গুপ্তধন তো হয়ে দাঁড়াল অলীক দিল্লি কা লাড্ডু, আর মুখের কথায় হিল্লি-দিল্লি করে বেড়িয়ে লাভ কী? প্রচুর কাদা ঘাঁটা হয়েছে, আমি এখন হস্ত-পদ বিস্তৃত করে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করতে চাই। হুম, চাই ঘুম!'

মানিক বললে, 'আহা, যা বলেছেন! আমি এখনই একদৌড়ে বাজার গিয়ে আপনার নাসিকার জন্যে এক শিশি সর্ষপ তৈল কিনে আনব কি?'

সুন্দরবাবু খাপ্পা হয়ে মানিকের পৃষ্ঠদেশে মুষ্টিপ্রহার করতে উদ্যত হলেন, সতর্ক মানিক একলাফে গিয়ে পড়ল হাত কয়েক তফাতে!

কিন্তু জয়ন্ত গোঁ ছাড়লে না, শেষ পর্যন্ত তাকে নিয়ে বীরেনকে উদ্দিষ্ট ঘরে গিয়ে হাজির হতে হল। তারপর অবহেলাভরে বললে, 'এখন বলুন জয়ন্তবাবু, আপনার বক্তব্য কী?'

জয়ন্ত প্রথমে মুখে কিছু বললে না, স্তব্ধভাবে ঘরের চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগল।

এটা গুদামঘরই বটে, নানান রকম একালে অব্যবহার্য জিনিস বাড়ির এই ঘরখানায় কোণঠাসা করে রাখা হয়েছে—গুরুভার ও মস্তবড়ো লোহার সিন্দুক, আগাগোড়া কাঠের আলমারি, ডেস্ক, ভারী ভারী বাসনকোসন এবং গৃহস্থালির ও গৃহসজ্জার কড়িখচিত দ্রব্যসামগ্রী প্রভৃতি। শেযোক্ত জিনিসপত্রগুলিতে প্রাচীন বাংলা দেশের একটি নিজস্ব বিশেযত্ব ছিল। রকমারি কড়ির নামও ভিন্ন ভিন্ন—যেমন বিদন্তা, সিংহী, মৃগী ও হংসী প্রভৃতি। ঘরের কড়িকাঠ থেকে দোলনার

মতো ঝুলছে একটি কড়ির আলনা। এ শ্রেণির জিনিস অধিকাংশ একেলে বাঙালি চোখেও দেখেনি।

একদিকে স্তূপীকৃত বা বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে অনেক প্রাচীন পুস্তক।

জয়ন্ত শুধোলে, 'এই বইগুলোই বুঝি প্রতাপ চৌধুরিরা আলমারির ভেতর থেকে টেনে বার করেছিল?'

বীরেন বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। বইগুলো যেভাবে ফেলে গিয়েছিল ঠিক সেইভাবেই পড়ে আছে।'

জয়ন্ত অন্যমনস্কের মতো দুই-তিন খানা বই তুলে নিয়ে পাতার পর পাতা উলটে যেতে লাগল—মুখে তার চিন্তার লক্ষণ।

বীরেন অধীর স্বরে বললে, 'জয়ন্তবাবু, আপনি কী আলোচনা করবেন বলেছিলেন না?'

জয়ন্ত বললে, 'হ্যাঁ। বীরেনবাবু, আপনি বোধহয় মনে করেন যে, জগৎশেঠের গুপ্তধন হস্তগত করে প্রতাপ চৌধুরি শূন্যহস্তেই সদ্য সদ্য স্বর্গে বা নরকে যাত্রা করেছে?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, মনে করি।'

—'উঁহু, আমি তা মনে করি না।'

—'কেন করেন না?'

—'প্রমাণ দেখে।'

—'কী প্রমাণ?'

—'প্রথমত, গুপ্তধনের সন্ধানেই প্রথমে সে এই বাড়িতে এসেছিল। এখান থেকে সে চন্দ্রনাথবাবুর লেখা কাহিনি সংগ্রহ করে। সেই পাঁচ অংশে বিভক্ত লেখা কাহিনির তৃতীয় অংশ সে খাতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যায়, আমরা তা দেখতে পাইনি। আমার দৃঢ়বিশ্বাস সেই তৃতীয় অংশেই চন্দ্রনাথবাবু বর্ণনা করেছিলেন, শেঠেদের বাগানবাড়িতে গিয়ে দ্বিতীয়বার ইঁদারায় নেমে কেমন করে তিনি গুপ্তধন দর্শন করেছিলেন। প্রতাপ চৌধুরিও তা পাঠ করে সেখানে গিয়ে হাজির হয়ে দেখে যে, ইঁদারার মধ্যে গর্ভগৃহ আছে বটে, কিন্তু গুপ্তধন নেই।'

—'এটা আপনার যুক্তিহীন ধারণা।'

—'না, যুক্তিহীন নয়। প্রতাপ সেখানে গিয়ে গুপ্তধন পেলে পরে আর আপনাকে আর আমাদের নিয়ে এত বেশি মাথা ঘামাতে আসত না, সানন্দে যাত্রা করত অজ্ঞাতবাসে।'

সুন্দরবাবু বলে উঠলেন, 'ঠিক, ঠিক! জয়ন্তের এ কথা জজে মানে!'

জয়ন্ত বললে, 'তারপর দেখুন, সে কাল রাত্রে আবার এখানে এসেছিল। আজ যখন আমি প্রতাপের খোঁজে এই বাড়ির ঘরে ঘরে ঘুরছিলুম তখন দেখলুম যে, সে আর তার দলের লোকরা বাড়ির নানা ঘরে ঢুকে দেয়াল আর মেঝে খুঁড়েছে, লোহার সিন্দুক আর আলমারি প্রভৃতি ভেঙে তচনচ করে ফেলেছে। কেন তারা আবার এসেছিল? নিশ্চয়ই হাওয়া খেতে নয়! কী তারা খুঁজছিল? নিশ্চয়ই গুপ্তধন!'

বীরেন বললে, 'আপনার মতকে আর অযৌক্তিক বলতে পারি না বটে, কিন্তু কোথায় সেই গুপ্তধন?'

—'গুপ্তধন হস্তগত করেছিলেন চন্দ্রনাথবাবু। কারবার পত্তন করবার সময়ে তার বেশ একটা মোটা অংশ খাটিয়ে বাকি অংশ তিনি লুকিয়ে রেখে গিয়েছেন।'

—'কোথায়?'

—'বীরেনবাবু, আপনাদের কলকাতার বাড়ি তৈরি করিয়েছিলেন কে?'

—'আমার বাবা।'

—'আপনার ঠাকুরদাও কি সেখানে বাস করতেন?'

—'না।'

—'তিনি থাকতেন কোথায়?'

—'ব্যবসা-সূত্রে তাঁর কলকাতায় আসা-যাওয়া ছিল বটে, কিন্তু তিনি স্থায়ীভাবে বাস করতেন এই বাড়িতেই।'

—'তাহলে গুপ্তধনের বাকি অংশও আছে এই বাড়িতেই।'

—'আবার জিজ্ঞাসা করি, কোথায়? প্রতাপ খুঁজতে কোথাও বাকি রেখেছে কি?'

—'অন্ধের মতো খুঁজলে কিছুই পাওয়া যায় না।'

বীরেন এইবারে কিঞ্চিৎ শ্লেষজড়িত কণ্ঠে বললে, 'তাহলে চক্ষুষ্মানের মতো খোঁজবার পদ্ধতি আপনিই দেখিয়ে দিন।'

জয়ন্ত অবিচলিত কণ্ঠে বললে, 'তাই দেখাব বলেই তো আমার এখানে আগমন'

—'উত্তম। আমরা অপেক্ষা করছি।'

পকেট থেকে চন্দ্রনাথ লিখিত অসম্পূর্ণ কাহিনি সংবলিত খাতাখানা বার করে জয়ন্ত বললে, 'বীরেনবাবু, আপনার ঠাকুরদার রচনার পঞ্চমাংশে অর্থাৎ উপসংহারে কী আছে, ভোলেননি তো?'

—'আছে একটা অর্থহীন পদ্য বা ছড়া। কিন্তু মূল কাহিনির সঙ্গে তার কোনোই সম্পর্ক নেই।'

—'কে বললে সম্পর্ক নেই? কে বলে তা অর্থহীন? আপনি যা ভেবেছেন, প্রতাপ চৌধুরিও তাই ভেবেছিল, সেইজন্যেই আঁধার ভেদ করে ফুটে ওঠেনি আলোর রেখা। আমিও প্রথমে সেই পদ্যটিকে অগ্রাহ্য করেছিলুম, কিন্তু তার পরে মনে মনে তাকে নিয়ে যথেষ্ট ভেবেচিন্তে রীতিমতো অর্থের সন্ধান পেয়েছি!'

—'অর্থ না অনর্থ?'

—'না, অনর্থের মধ্যেই সত্য অর্থ। অর্থাৎ সেই পদ্যটিই ব্যক্ত করে দিয়েছে গুপ্তকে। অতঃপর আমি সে পদ্যের নির্দেশ মেনেই গুপ্তধন অন্বেষণ করব।'

সকলে অবাক হয়ে জয়ন্তের কাণ্ডকারখানা নিরীক্ষণ করতে লাগল বিস্মিতনেত্রে। অনুরূপ ক্ষেত্রে অন্যান্য অন্বেষকরা যা করে জয়ন্ত সে সব কিছুই করল না—অর্থাৎ সিন্দুক, আলমারি, দেরাজ, ডেস্ক বা বাক্স প্রভৃতি হাঁটকেও দেখলে না কিংবা ঘরের ছাদ, দেওয়াল কি মেঝে ঠুকেও দেখলে না কোনো জায়গা ফাঁপা বা নিরেট।

সে প্রথমে বিকীর্ণ ও স্তূপীকৃত পুস্তকগুলোর প্রত্যেকখানা তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি হস্তচালনা করে গেল। তারপর বাসনকোসনগুলোও নেড়েচেড়ে দেখলে। তারপর কড়িকাঠ থেকে ঝুলন্ত কড়ির আলনার দিকে উচ্চমুখে, স্থিরনেত্রে কিছুক্ষণ তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

সুন্দরবাবু বললেন, 'কী হে, আলনা দেখে একেবারে থ হয়ে গেলে যে!'

—'হ্যাঁ, কড়ির কারুকার্য-করা সুন্দর আলনা, একালে আর দেখা যায় না। দণ্ডটা অন্তত চার হাত লম্বা আর এক বিঘত মোটা। দণ্ডের সমস্তটা পুরু লাল কাপড়ের আবরণ দিয়ে মোড়া আর উপরে বসানো অজস্র কড়ি। হংসী কড়ি, কারণ রং সাদা। সুন্দরবাবু, সত্তর-পঁচাত্তর বৎসর আগেও কলকাতায় আর মফস্‌সলে বাজারে কড়ি ফেলে জিনিস কেনা যেত, জানেন কি?'

—'না। ওই কি তোমার গুপ্তধন?'

—'উঁহু, ও হচ্ছে এখন বাজারে অচল ব্যক্ত ধন, সবাই দেখেও দেখতে চায় না। কিন্তু আলনাটা একবার নীচে নামালে হয় না?'

—'ধ্যেৎ, কেন?'

—'আরও ভালো করে সেকেলে কারিগরের কারিগুরি দেখব।'

—'তোমার যত সব ছেলেমানুষি বায়না!'

কিন্তু জয়ন্ত যা ধরে, আর ছাড়ে না। কাজেই দড়ি ছিঁড়ে আলনাটাকে নীচে নামিয়ে আনতে হল।

জয়ন্ত মাটির উপরে বসে পড়ে দুই হাতে দণ্ডটাকে নাড়াচাড়া করে বললে, 'এটা খুব ভারী, নিরেট বলে মনে হয়। সেকালের লোকরা ভারী ভারী আসবার বানিয়ে ধনগর্ব প্রকাশ করত আর একালের আমরা হচ্ছি সূক্ষ্মতার ভক্ত। কড়িখচিত লাল আবরণীর তলায় কাঠ আছে বলেই মনে হয়। বীরেনবাবু, একখানা করাত বা ধারালো কাটারি এনে দিতে পারেন?'

—'কী আশ্চর্য, কী করবেন?'

—'আনলেই দেখতে পাবেন।'

করাত ও কাটারি দুইই পাওয়া গেল। জয়ন্ত বিনাবাক্যব্যয়ে কড়ির আলনার একটা প্রান্ত কেটে ফেলে বললে, 'এটা দেখছি বিশেষভাবে তৈরি ফাঁপা জিনিস। তবুও এত ভারী কেন?'

সে ভিতরে হাত চালিয়ে দিয়ে যা বাইরে টেনে আনলে তা হচ্ছে এমন চমকপ্রদ, অভাবিত জিনিস যে, সুন্দরবাবু, মানিক ও বীরেন বিস্ময়ে, আনন্দে ও উত্তেজনায় মুহ্যমান হয়ে স্তম্ভিতনেত্রে দাঁড়িয়ে রইল মৌন শিলামূর্তির মতো! তার মধ্যে ছিল হীরক, নীলকান্তমণি, মরকত, পদ্মরাগ ও মুক্তা প্রভৃতি মহামূল্য রত্নরাজি! আরও কয়েকবার হস্তচালনার ফলে কক্ষতলে ছড়িয়ে পড়ল আরও কয়েক মুঠো মণিমুক্তা! হয়ে দীপ্যমান ইন্দ্রধনুর খানিকটা খণ্ড খণ্ড হয়ে মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে ছড়িয়ে পড়ে সৌন্দর্যস্নান করছে প্রভাতি সূর্যকিরণে! শুক্ল, হরিৎ, নীল, পীত ও রক্ত প্রভৃতি বিবিধ বর্ণের যে কী অপরূপ সমুজ্জ্বল পুলকোচ্ছ্বাস!

জয়ন্ত পরিতৃপ্ত কণ্ঠে বলল, 'বাইরে যা এনেছি তাইই যথেষ্টরও বেশি! ভিতরে রইল আরও কত লক্ষ টাকার ঐশ্বর্য, আমার কল্পনায় তা আসে না! এখন আপনাদের কিছু বলবার আছে?'

সুন্দরবাবু কেবল বললেন, 'হুম!'

মানিক বললে, 'জয়ন্তের কথা শুনে আর ভাবভঙ্গি দেখে আমি আগেই আন্দাজ করতে পেরেছিলুম, আজ এখানে এমনি কোনো অপূর্ব আর আশ্চর্য ব্যাপারই দেখতে পাব!'

বীরেন অভিভূত ও উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'জয়ন্তবাবু, জয়ন্তবাবু, আপনি ঐন্দ্রজালিক! না না, আপনি তারও চেয়ে বিস্ময়কর!'

জয়ন্ত ঘাড় নেড়ে বললে, 'অত্যুক্তি করবেন না বীরেনবাবু! আমি কেবল সহজবুদ্ধি ব্যবহার করতে পারি, আপনি যা পারেন না।'

বীরেন বললে, 'এখনও বুঝতে পারছি না, আমার গলদ হয়েছে কোনখানে?'

—'কেন আপনি খাতার পদ্যটিকে অর্থহীন শব্দসমষ্টি বলে মনে করেছিলেন?'

বীরেন বললে, 'তার অর্থ আপনিই আমাকে বুঝিয়ে দিন।'

জয়ন্ত হাস্যমুখে বললে, 'অর্থ তো স্বতঃস্ফূর্ত! তার কতক অংশ আবার শুনুন:

'কিন্তু আমি ঠিক জানি ভাই!
গুপ্ত পথে রপ্ত সবাই,
সর্বজনের সামনে লুকোয় সহজ পথের পন্থী!

তারপর স্পষ্ট কথা:

'মানসনয়ন যে খুলে চায়
সত্য মানিক সে-ই খুঁজে পায়,
মূর্খ শুধু রত্ন খোঁজে মস্ত লোহার সিন্দুকে!'

টীকা করব? চন্দ্রনাথবাবু বলছেন, গুপ্ত পথে চলতে সবাই অভ্যস্ত। যা গুপ্ত, তাকে আবিষ্কার করতে গেলে সকলেই আগে গোপনীয় স্থানই অন্বেষণ করে। যা চোখের সামনাসামনি থাকে, তাকে অবহেলা করা হয়। এইজন্যে যার সহজ বুদ্ধি আছে, সে সকলেরই চোখের সামনে অনায়াসে অবস্থান করেও কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। তারই অন্বেষণা সফল ও তারই ভাগ্যে মণিমাণিক্য লাভ হয়, যার মানসনেত্র উন্মুক্ত। কিন্তু মূর্খেরা ভাবে, রত্নের সন্ধান পাওয়া যায় কেবল প্রকাণ্ড লৌহসিন্দুকেই! বীরেনবাবু, এই পদ্যই হয়েছে আমার চাবিকাঠি, আর তারই সাহায্যে খুলেছি আমি রহস্য-সিন্দুক! সুতরাং—'

সুন্দরবাবু বললেন, 'সুতরাং—

জয়ন্তের কথা ফুরাল
বীরেনের ব্যথা জুড়াল!

হুম, আমিও বাবা পদ্য-টদ্য রচনা করতে পারি,—দেখছ তো!'

গল্প

অলৌকিক

॥ এক ॥

ইনস্পেকটার সুন্দরবাবু। নতুন নতুন খাবারের দিকে বরাবরই তাঁর প্রচণ্ড লোভ। আজ বৈকালী চায়ের আসরে পদার্পণ করেই বলে উঠলেন, 'জয়ন্ত, ও-বেলা কী বলেছিলে, মনে আছে তো?'

জয়ন্ত হেসে বললে, 'মনে না থাকে, মনে করিয়ে দিন।'

—'নতুন খাবার খাওয়াবে বলেছিলে।'

—'ও, এই কথা? খাবার তো প্রস্তুত।'

—'খাবারের নাম শুনতে পাই না?'

—'মাছের প্যাটি আর অ্যাসপ্যার‍্যাগাস ওমলেট।'

—'রেঁধেছে কে?'

—'আমাদের মধু।'

—'মধু একটি জিনিয়াস। আনতে বলো, আনতে বলো।'

চা-পর্ব শেষ হল যথাসময়ে। অনেকগুলো প্যাটি আর ওমলেট উড়িয়ে সুন্দরবাবুর আনন্দ আর ধরে না।

পরিতৃপ্ত ভুঁড়ির উপরে সস্নেহে হাত বুলোতে বুলোতে তিনি বললেন, 'মনের মতো পানাহারের মতো সুখ দুনিয়ায় আর কিছু নেই, কী বলো মানিক?'

মানিক বললে, 'কিন্তু অত সুখের ভিতরেও কি একটি ট্রাজেডি নেই?'

—'কী রকম?'

—'খেলেই খাবার ফুরিয়ে যায়?'

—'তা যা বলেছ!'

—'আবার অনেক সময় খাবার ফুরোবারও আগে পেটই ভরে যায়।'

—'হ্যাঁ ভায়া, ওটা আবার খাবার ফুরনোরও চেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার। খাবার আছে, পেট কিন্তু গ্রহণ করতে নারাজ। অসহনীয় দুঃখ।'

ঠিক এমনি সময়ে একটি লোক ঘরের ভিতরে প্রবেশ করল।

তাকে দেখেই জয়ন্ত বলে উঠল, 'আরে, আরে, হরেন যে! বোসো ভাই বোসো। সুন্দরবাবু, হরেন হচ্ছে আমার আর মানিকের বাল্যবন্ধু।'

মানিক বললে, 'হরেন, ইনি হচ্ছেন সুন্দরবাবু, বিখ্যাত গোয়েন্দা আর প্রখ্যাত ঔদরিক।'

—'হুম, ঔদরিক মানে কী মানিক?' শুধোলেন সুন্দরবাবু।

—ঔদরিক, অর্থাৎ উদরপরায়ণ।'

—'অর্থাৎ পেটুক। বেশ ভাই, বেশ, যা খুশি বলো, তোমার কথায় রাগ করে আজকের এমন খাওয়ার আনন্দটা মাটি করব না।'

জয়ন্ত বললে, 'তারপর হরেন, তুমি কি এখন কলকাতাতেই আছ?'

—'না, কাল এসেছি। আজই দেশে ফিরব। কিন্তু যাবার আগে তোমাদের একটা খবর দিয়ে যেতে চাই।'

—'কীরকম খবর?'

—'যেরকম খবর তোমরা ভালোবাসো।'

—'কোনো অসাধারণ ঘটনা?'

—'তাই।'

—'তাহলে আমরাও শুনতে প্রস্তুত। সম্প্রতি অসাধারণ ঘটনার অভাবে আমরা কিঞ্চিৎ ম্রিয়মান হয়ে আছি। ঝাড়ো তোমার খবরের ঝুলি।'

॥ দুই ॥

হরেন বললে, 'সুন্দরবাবু, জয়ন্ত আর মানিক আমাদের দেশে গিয়েছে, কিন্তু আপনার কাছে আগে তার কিছু পরিচয় দেওয়া দরকার। আমাদের দেশ হচ্ছে একটি ছোটো শহর, কলকাতা থেকে মাইল ত্রিশ দূরে। সেখানে পনেরো-ষোলো হাজার লোকের বাস। অনেক ডেলিপ্যাসেঞ্জার কলকাতায় চাকরি করতে আসেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বড়ো অফিসারও আছেন। স্টেশন থেকে শহরের দূরত্ব প্রায় দেড় মাইল। এই পথটা বেশির ভাগ লোকই পায়ে হেঁটে পার হয়, যাদের সঙ্গতি আছে তারা ছ্যাকড়াগাড়ি কি সাইকেল-রিকশার সাহায্য নেয়।

'মাসখানেক আগে—অর্থাৎ গেল-মাসের প্রথম দিনে সুরথবাবু আর অবিনাশবাবু সাইকেল-রিকশায় চড়ে স্টেশন থেকে বাড়ির দিকে ফিরছিলেন। তাঁরা দুইজনেই বড়ো অফিসার, একজন মাহিনা পান হাজার টাকা, আর-একজন আটশত টাকা। সেই দিনই তাঁরা মাহিনা পেয়েছিলেন। স্টেশন থেকে মাইলখানেক পথ এগিয়ে এসে একটা জঙ্গলের কাছে তাঁরা দেখতে পেলেন আজব এক মূর্তি। তখন রাত হয়েছে, আকাশে ছিল সামান্য একটু চাঁদের আলো, স্পষ্ট করে কিছুই চোখে পড়ে না। তবু বোঝা গেল, মূর্তিটা অসম্ভব ঢ্যাঙা, মাথায় অন্তত নয় ফুটের কম উঁচু হবে না। প্রথমে তাঁদের মনে হয়েছিল সেটা কোনো নারীর মূর্তি, কারণ

তার দেহের নীচের দিকে ছিল ঘাঘরার মতো কাপড়। কিন্তু তার কাছে গিয়েই বোঝা গেল সে নারী নয়, পুরুষ। তার ভীষণ কালো মুখখানা সম্পূর্ণ অমানুষিক। তার হাতে ছিল লাঠির বদলে লম্বা একগাছা বাঁশ। পথের ঠিক মাঝখানে একেবারে নিশ্চল হয়ে সে দাঁড়িয়েছিল।

'রিকশাখানা কাছে গিয়ে তাকে পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই সে বিষম চিৎকার করে ধমকে বলে উঠল, 'এই উল্লুক, গাড়ি থামা!' তারপরেই সে রিভলভার বার করে ঘোড়া টিপে দিলে। গুড়ুম করে শব্দ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই রিকশার চালক গাড়ি ফেলে পলায়ন করলে। সুরথবাবু আর অবিনাশবাবুও গাড়ি থেকে নেমে পড়বার উপক্রম করতেই মূর্তিটা তাঁদের দিকে রিভলভার তুলে কর্কশ স্বরে বললে, 'যদি প্রাণে বাঁচতে চাও, সঙ্গে যা আছে সব রিকশার উপরে রেখে এখান থেকে সরে পড়ো।'

'তাঁরা প্রাণে বাঁচতেই চাইলেন। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সঙ্গের সমস্ত টাকা, হাতঘড়ি, আংটি এমনকি ফাউনটেন পেনটি পর্যন্ত সেইখানে ফেলে রেখে তাঁরা তাড়াতাড়ি চম্পট দিলেন। পরে পুলিশ এসে ঘটনাস্থলে রিকশার পাশে কুড়িয়ে পায় কেবল সেই লম্বা বাঁশটাকে।

'প্রথম ঘটনার সাত দিন পরে ঘটে দ্বিতীয় ঘটনা। মৃণালবাবু আমাদেরই দেশের লোক। মেয়ের বিয়ের জন্যে তিনি কলকাতায় গয়না গড়াতে দিয়েছিলেন। ঘটনার দিন সন্ধ্যার সময়ে ট্রেন থেকে নেমে পাঁচ হাজার টাকার গয়না নিয়ে পদব্রজেই আসছিলেন। তিনিও একটা জঙ্গলের পাশে সেই সুদীর্ঘ ভয়াবহ মূর্তিটাকে অস্পষ্ট ভাবে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। সেদিন কতকটা স্পষ্ট চাঁদের আলো ছিল বটে, কিন্তু জঙ্গলের ছায়া ঘেঁসে মূর্তিটা এমন ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল যে, ভালো করে কিছুই দেখবার জো ছিল না। সেদিনও মূর্তিটা রিভলভার ছুড়ে ভয় দেখিয়ে মৃণালবাবুর গয়নাগুলো কেড়ে নিয়ে তাঁকে তাড়িয়ে দেয়। সেবারেও পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে পাওয়া যায় কেবল একগাছা লম্বা, মোটা বাঁশ।

'এইবারে তৃতীয় ঘটনা। শশীপদ আমার প্রতিবেশী। কলকাতার বড়োবাজারে আর কাপড়ের দোকান। ফি-শনিবারে সে দেশে আসে—গেল শনিবারেও আসছিল। তখন সন্ধ্যা উতরে গিয়েছিল, কিন্তু চাঁদ ওঠেনি। স্টেশন থেকে শহরে আসতে আসতে পথের একটা মোড় ফিরেই শশীপদ সভয়ে দেখতে পায় সেই অসম্ভব ঢ্যাঙা বীভৎস মূর্তিটাকে। মানে, ভালো করে সে কিছুই দেখতে পায়নি, কেবল এইটুকুই বুঝেছিল যে, মূর্তিটা সহজ মানুষের চেয়ে প্রায় দুইগুণ উঁচু। সেদিনও সে রিভলভার ছুড়ে শশীপদের কাছ থেকে সাত হাজার টাকা হস্তগত করে।

শশীপদ দৌড়ে একটা জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে পড়ে। তারপর সেইখানে বসেই শুনতে পায় খটাখট খটাখট খটাখট করে কীসের শব্দ! ক্রমেই দূরে গিয়ে সে শব্দ মিলিয়ে যায়। শশীপদ ভয়ে সারা রাত বসেছিল জঙ্গলের ভিতরেই। সকালে বাইরে এসে পথের উপরে দেখতে পায় একগাছা বাঁশ।

'জয়ন্ত, এই তো ব্যাপার! পরে পরে তিন-তিনটে অদ্ভুত ঘটনা ঘটায় আমাদের শহর রীতিমতো আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যার পর দলে খুব ভারী না হলে পথিকরা স্টেশন থেকে ও-পথ দিয়ে শহরে আসতে চায় না। পুলিশ অনেক চেষ্টা করেও রহস্য ভেদ করতে পারছে না। অনেকেই মূর্তিটাকে অলৌকিক বলেই ধরে নিয়েছে। এখন তোমার মত কী?'

॥ তিন ॥

জয়ন্ত স্তব্ধ বসে রইল কয়েক মিনিট। তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'ঘটনাগুলোর মধ্যে কী কী লক্ষ করবার বিষয় আছে, তা দ্যাখো। বাংলা দেশে নয় ফুট উঁচু মানুষ থাকলে এতদিনে সে সুবিখ্যাত হয়ে পড়ত। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে, অপরাধী নয় ফুট উঁচু নয়। সে দেহের নীচের দিকটা ঘাঘরায় বা ঘেরাটোপে ঢেকে রাখে। কেন? তার মুখ অমানুষিক বলে মনে হয়। কেন? সে একটা লম্বা বাঁশ হাতে করে দাঁড়িয়ে থাকে, আবার বাঁশটাকে ঘটনাস্থলে ফেলে রেখে যায়। কেন? সে প্রত্যেক বারেই চেষ্টা করে, তার চেহারা কেউ যেন স্পষ্ট করে দেখতে না পায়। কেন? শশীপদ শুনেছে, খটাখট খটাখট করে একটা শব্দ ক্রমেই দূরে চলে যাচ্ছে। কীসের শব্দ?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'তুমি কিছু অনুমান করতে পারছ?'

—'কিছু কিছু পারছি বই কি! হরেন, ওই তিনটে ঘটনায় যাঁদের টাকা খোয়া গিয়েছে, তাঁরা কি শহরের বিভিন্ন পল্লির লোক?'

—'না, তাঁরা সকলেই প্রায় এক পাড়াতেই বাস করেন।'

—'তবে তোমাদের পাড়ায় বা পাড়ার কাছাকাছি কোথাও বাস করে এই অপরাধী!'

—'কেমন করে জানলে?'

—'নইলে ঠিক কোন দিনে কোন সময়ে কোন ব্যক্তি প্রচুর টাকা নিয়ে দেশে ফিরে আসবে, অপরাধী নিশ্চয়ই সে খবর রাখতে পারত না।'

—'না জয়ন্ত, আমাদের পাড়ায় কেন, আমাদের শহরেও নয় ফুট উঁচু লোক নেই।'

—'আমিও ও-কথা জানি।'

—'তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না।'

—'আপাতত বেশি কিছু বুঝেও কাজ নেই। আমাকে আরো কিঞ্চিৎ চিন্তা করবার সময় দাও। তুমি আজই দেশে ফিরে যাচ্ছ তো?'

—'হ্যাঁ।'

—'পরশু দিনই আমার কাছ থেকে একখানা জরুরি চিঠি পাবে। আমার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। তার ঠিক এক সপ্তাহ পরে তুমি কলকাতায় এসে আমাদের তোমার দেশে নিয়ে যাবে।'

হরেন চলে গেল। জয়ন্ত যেন নিজের মনেই গুনগুন করে বললে, 'খটাখট খটাখট খটাখট শব্দ। মূল্যবান সূত্র।'

॥ চার ॥

নির্দিষ্ট দিনে দুপুরবেলায় হরেন এসে হাজির।

জয়ন্ত শুধোলে, 'চিঠিতে যা যা বলেছি ঠিক সেইমতো কাজ করেছ তো?'

—'অবিকল।'

—'মানিক, সুন্দরবাবুকে ফোন করে জানাও, আজ সাড়ে-পাঁচটার ট্রেনে আমরা যাত্রা করব।'

প্রায় সাড়ে-সাতটার সময়ে তারা হরেনদের দেশে এসে নামল।

আকাশ সেদিন নিশ্চন্দ্র। স্টেশন থেকে শহরে যাবার রাস্তায় সরকারি তেলের আলোগুলো অনেক তফাতে তফাতে থেকে মিট মিট করে জ্বলে যেন অন্ধকারের নিবিড়তাকেই আরও ভালো করে দেখাবার চেষ্টা করছিল। নির্জন পথ। আশপাশের ঝোপঝাপের বাসিন্দা কেবল মুখর ঝিল্লির দল। দুইখানা সাইকেল-রিকশায় চড়ে তারা যাচ্ছিল। প্রথম গাড়িতে বসেছিল হরেন ও মানিক। দ্বিতীয় গাড়িতে জয়ন্ত ও সুন্দরবাবু।

সুন্দরবাবু বললেন, 'তুমি কী যে বুঝেছ তা তুমিই জানো, আমি তো ছাই এ ব্যাপারটার ল্যাজা-মুড়ো কিছুই ধরতে পারিনি।'

জয়ন্ত বললে, 'ঘটনাগুলো আমিও শুনেছি, আপনিও শুনেছেন। তারপর প্রধান-প্রধান সূত্রের দিকে আপনার দৃষ্টিও আকর্ষণ করতে ছাড়িনি। মাথা খাটালে আপনি অনেকখানিই আন্দাজ করতে পারতেন।'

—'মস্তককে যথেষ্ট ঘর্মাক্ত করবার চেষ্টা করেছি ভায়া, কিন্তু খানিকটা ধোঁয়া (তাও গাঁজার ধোঁয়া) ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাইনি।'

—'মুটেরাও মস্তককে যথেষ্ট ঘর্মাক্ত করে, কিন্তু তারা উপলব্ধি করে কতটুকু? সুন্দরবাবু, আমি আপনাকে মস্তক ঘর্মাক্ত করতে বলছি না, মস্তিষ্ক ব্যবহার করতে বলছি।'

—'একটা শক্ত রকম গালাগালি দিলে বটে, কিন্তু তোমার কি বিশ্বাস, আজকেই তুমি এই মামলাটার কিনারা করতে পারবে?'

—'হয়তো পারব, কারণ অপরাধীরা প্রায়ই নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কাজ করে বিপদে পড়ে। হয়তো পারব না, কারণ কোনো কোনো অপরাধী নিজের নির্দিষ্ট পদ্ধতি ত্যাগ করতে পারে। কিন্তু হুঁশিয়ার! পথের মাঝখানে আবছায়া গোছের কী একটা দেখা যাচ্ছে না?'

হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে বটে! মুক্ত আকাশের স্বাভাবিক আলো দেখিয়ে দিলে, অন্ধকারের মধ্যে একটা অচঞ্চল ও নিশ্চল সুদীর্ঘ ছায়ামূর্তি! বাতাসে নড়ে নড়ে উঠছে কেবল তার পরনের ঝলঝলে জামাকাপড়গুলো।

আচম্বিতে একটা অত্যন্ত কর্কশ ও হিংস্র চিৎকার চারিদিকের নিস্তব্ধতাকে চমকে দিয়ে জেগে উঠল—'এই! থামাও গাড়ি, থামাও গাড়ি!' সঙ্গে সঙ্গে রিভলভারের শব্দ!

কিন্তু তার আগেই অতি-সতর্ক জয়ন্ত ছুটন্ত গাড়ি থেকে বাঘের মতো লাফিয়ে পড়েছে এবং গর্জন করে উঠেছে তারও হাতের রিভলভার!

গুলি গিয়ে বিদ্ধ করলে মূর্তির ডান হাতখানা, তার রিভলভারটা খসে পড়ল মাটির উপরে সশব্দে! কেবল রিভলভার নয়, আর-একটাও কি মাটিতে পড়ার শব্দ হল—বোধ হয় বংশদণ্ড! অস্ফুট আর্তনাদ করে মূর্তিটা ফিরে দাঁড়িয়ে পালাবার উপক্রম করলে, কিন্তু পারলে না, এক সেকেন্ড টলটলায়মান হয়েই হুড়মুড় করে লম্বমান হল একেবারে পথের উপরে।

দপদপিয়ে জ্বলে উঠল চার-চারটে টর্চের বিদ্যুৎ-বহ্নি!

জয়ন্ত ক্ষিপ্র হস্তে ভূপতিত মূর্তিটার গা থেকে কাপড়-চোপড়গুলো টান মেরে খুলে দিলে। দেখা গেল, তার দুই পদের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে আছে দুইখানা সুদীর্ঘ যষ্টি—ইংরেজিতে যাকে বলে 'stilt' এবং বাংলায় যাকে বলে 'রণপা'।

জয়ন্ত বললে, 'দেখছি এর মুখে রয়েছে একটা প্রকাণ্ড মুখোশ—কাফ্রির মুখোশ। এখন মুখোশের তলায় আছে কার শ্রীমুখ, 'সেটাও দেখা যেতে পারে।'

আর এক টানে খসে পড়ল মুখোশও।

হরেন সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'আরে, এ যে দেখছি আমাদের পাড়ার বাপে খেদানো মায়ে তাড়ানো ছেলে রামধন মুখুজ্জে! বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই কুপথে যায়, কুসঙ্গীদের দলে মেশে, নেশাখোর হয়, জুয়া খেলে, পাড়ার লোকেদের উপরে অত্যাচার করে—এর জন্যে সবাই ত্রস্ত, ব্যতিব্যস্ত! কিন্তু এর পেটে পেটে যে এমন শয়তানি, এতটা তো আমাদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল!'

॥ পাঁচ ॥

জয়ন্ত বললে, 'সুন্দরবাবু, প্রধান প্রধান সূত্রের কথা আগেই বলেছি, এখন সব কথা আবার নতুন করে বলবার দরকার নেই। কেবল দু-তিনটে ইঙ্গিত দিলেই যথেষ্ট হবে। গোড়া থেকেই আমার দৃঢ় ধারণা হয়েছিল, অপরাধী হরেনেরই পাড়ার লোক। সে পাড়ায়—এমনকি, সে শহরেও নয় ফুট উঁচু কোনো লোকই নেই। সুতরাং ধরে নিলুম সে উঁচু হয়েছিল কোনো কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করে। অপরাধের সময়ে সে আবছায়ায় অবস্থান করে—পাছে কেউ তার কৃত্রিম উপায়টা আবিষ্কার করে ফেলে, তাইতেই আমার ধারণা হল দৃঢ়মূল। এখন সেই কৃত্রিম উপায়টা কী হতে পারে? শশীপদ শুনেছিল, খটাখট খটাখট করে কী একটা শব্দ ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। এই নিয়ে ভাবতে-ভাবতেই ধাঁ করে আমার মাথায় আসে রনপার কথা। রনপার উপরে আরোহণ করলে মানুষ কেবল উঁচু হয়ে ওঠে না, খুব দ্রুত বেগে চলাচলও করতে পারে। সেকালে বাংলা দেশের ডাকাতরা এই রনপায় চড়ে এক এক রাতেই পঞ্চাশ-ষাট মাইল পার হয়ে যেতে পারত। পদক্ষেপের সময়ে রনপা যখন মাটির উপরে পড়ে, তখন খটাখট করে শব্দ হয়। কিন্তু রনপায় উঠে কেউ স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, টাল সামলাবার জন্যে চলাফেরা করতে হয়। অপরাধী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার জন্যে একগাছা বাঁশের সাহায্য গ্রহণ করত। কার্যসিদ্ধির পর বাঁশটাকে সে ঘটনাস্থলেই পরিত্যাগ করে যেত, কারণ রনপায় চড়ে ছোটবার সময়ে এতবড়ো একটা বাঁশ হয়ে ওঠে উপসর্গের মতো।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম, এসব তো বুঝলুম, কিন্তু আসামি এমন বোকার মতো আমাদের হাতে ধরা দিলে কেন, সেটা তো বোঝা যাচ্ছে না!'

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, ওটা আমার কল্পনাশক্তির মহিমা! আগেই বলেছি তো, অপরাধীরা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কাজ করতে গিয়েই বিপদে পড়ে। অপরাধী সর্বদাই খবর রাখত, পাড়ার কোন ব্যক্তি কবে কী করবে বা কী করবে

না। আমার নির্দেশ অনুসারে হরেন রটিয়ে দিয়েছিল, কলকাতায় ব্যাংকের পর ব্যাংক ফেল হচ্ছে, সে ব্যাংকে আর নিজের টাকা রাখবে না। অমুক তারিখে কলকাতায় গিয়ে সব টাকা তুলে নিয়ে আসবে। অপরাধী এ টোপ না গিলে পারেনি।'

সুন্দরবাবু বললে, একেই বলে ফাঁকতালে কিস্তি মাত!'

কালো দস্তানা

॥ ১ ॥
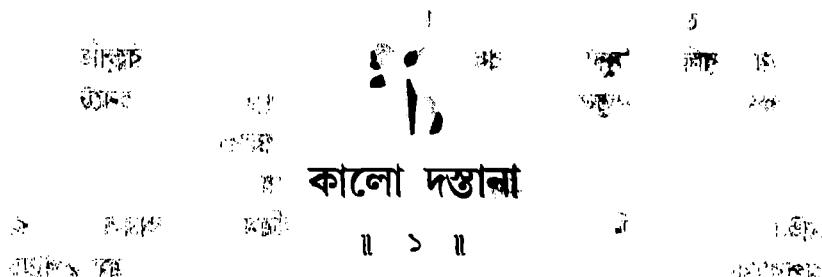
—'কে ওখানে?' মেরি স্টার চেঁচিয়ে উঠল।

রাত্রিবেলা। মেরি ধড়মড় করে বিছানার উপরে উঠে বসে সভয়ে দেখলে, জানলার কাছে একটা মস্তবড়ো দেহ হুমড়ি খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে আর্তনাদ করতে গেল, কিন্তু আতঙ্কে তার কণ্ঠ থেকে কোনো স্বরই বেরুল না।

অন্ধকার বিদীর্ণ করে জ্বলে উঠল একটি সূক্ষ্ম আলোক-শলাকা। পেনসিল-টর্চ! তারই পিছনে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে একটা ভয়াবহ ছায়ামূর্তি।

মূর্তিটা কাছে এসে কর্কশ স্বরে বললে, 'সাবধান! চেঁচিয়েছ কী তোমার গলা কেটে ফেলেছি!' তার কালো দস্তানা-পরা ডান হাতে একখানা চকচকে ছুরি!

লোকটা ঘরের আলমারি-দেরাজ হাতড়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমার বাকি টাকা কোথায় আছে?'

মেরি তখন তার কণ্ঠস্বর ফিরিয়ে পেয়েছে, সে পরিত্রাহি চিৎকার করে উঠল।

—'কী! আবার চিৎকার?' ক্রুদ্ধস্বরে এই বলেই লোকটা ডান হাত দিয়ে মেরির মুখের উপরে প্রচণ্ড একটা আঘাত করলে, তারপর বেগে দৌড় মেরে দরজা খুলে বাইরে পালিয়ে গেল।

মেরি রক্তাক্ত মুখে চিৎকারের পর চিৎকার করতে লাগল।

সেখানা হচ্ছে প্রকাণ্ড ফ্ল্যাটবাড়ি, তার মধ্যে বাস করে বহু লোক। দেখতে দেখতে চারিদিক থেকে প্রতিবেশীরা ছুটে আসতে লাগল।

মি. কাসিনারো থাকতেন সামনের ঘরে। মেরির আর্তনাদ শুনে তিনি বাইরে বেরিয়েই দেখেন, হলঘরে দাঁড়িয়ে আছে একজন বিপুলবপু অপরিচিত মূর্তি। গায়ে তার চৌখুপি চেক-কাটা কোর্তা, হাতে কালো দস্তানা!

—'কে হে তুমি?'

উত্তরে লোকটা তাঁর উপরে ঘুসির পর ঘুসি চালাতে লাগল। কাসিনারোও পালটা ঘুসি মারতে ছাড়লেন না। ইতিমধ্যে সেখানে হাইনস নামে আর এক ভাড়াটিয়া এসে পড়লেন। অপরিচিত ব্যক্তি বেগতিক দেখে একটা গরাদেহীন জানলা দিয়ে লাফ মেরে বাইরে গিয়ে পড়ল।

ঘরের মেঝের উপরে কুড়িয়ে পাওয়া গেল কেবল তার ছুরিখানা।

ইতিমধ্যে ফোনে খবর পেয়েই দ্রুতগামী মোটরে চড়ে হ্যাঙ্ক, ডেভিস ও উয়েল নামে তিনজন পুলিশ-কর্মচারী এসে হাজির।

সংক্ষেপে সব শোনবার পর তাদের ধারণা হল, অপরাধী এখনও বেশিদূর যেতে পারেনি, রাস্তায় খুঁজলে আবার তার দেখা পাওয়া যেতে পারে।

ঠিক তাই! গাড়ি ছুটিয়ে কিছুদূর অগ্রসর হবার পরই দেখা গেল একটা দ্রুতধাবমান মূর্তি—গায়ে তার চৌখুপি চেক-কাটা কোর্তা!

—'এই! থামো, থামো!'

আর থামো! সে আরও বাড়িয়ে দিলে দৌড়ের বেগ।

ডেভিস রিভলভার তুললে। পুলিশের সবাই জানে, অব্যর্থ তার লক্ষ্য।

ছুটন্ত লোকটা খুব উঁচু এমন একটা কাঠের পাঁচিলের সামনে গিয়ে পড়ল, মানুষের পক্ষে যা লাফিয়ে পার হওয়া অসম্ভব। কিন্তু লোকটা দাঁড়াল না, মারলে লাফ! সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিময় ধমক দিয়ে উঠল ডেভিসের রিভলভার। পলাতকও অদৃশ্য হল পাঁচিলের ওপারে। সবাই অবাক।

ডেভিস বললে, 'আমার দৃঢ়ধারণা, গুলিটা লেগেছে গিয়ে লোকটার পায়ে।'

কাঠের পাঁচিলে দেখা গেল রিভলভারের গুলির চিহ্ন। পাঁচিলের ওপাশে পাওয়া গেল রক্তের দাগ। লোকটার পাত্তা পাওয়া গেল না বটে, কিন্তু সে আহত হয়েছে।

॥ ২ ॥

পরদিন সকালে চোরের ছুরিখানা পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞ বললেন, 'এর বাঁটে কতকগুলো দাগ আছে বটে, কিন্তু এত অস্পষ্ট যে, কোনোই কাজে আসবে না।'

পুলিশের বড়োকর্তার কাছে বসে ডিটেকটিভরা এই ঘটনা নিয়ে আলোচনা করছেন।

একজন বললেন, 'চোরের বর্ণনা আর কার্যপদ্ধতি পাওয়া গেছে। তার সঙ্গে থাকে ছুরি আর পেনসিল-টর্চ। সে গায়ে পরে চৌখুপি চেক-কাটা কোর্তা আর হাতে পরে কালো দস্তানা। তার কালো কোঁকড়ানো চুল, চেহারা ভালো। মাথায় সে ছয় ফুটেরও চেয়ে উঁচু। মেরি স্টারকে সে ছুরি নিয়ে ভয় দেখিয়েছে।'

আর-একজন বললেন, 'গেল ডিসেম্বরে আর জানুয়ারিতে ঠিক এইরকম দেখতে আর-একজন লোক কালিফোর্নিয়া স্ট্রিটে আর বুস স্ট্রিটে আরও দুজন স্ত্রীলোকের বাড়িতে হানা দিয়েছিল।'

আর-একজন বললেন, 'এ সব একই চোরের কীর্তি না হয়ে যায় না। চোরের কার্যপদ্ধতি অবিকল একরকম। সে রাত্রে চুরি করতে ঢোকে ঘুমন্ত স্ত্রীলোকদের ঘরে।'

আপাতত সূত্র এর বেশি এগুলো না।

কয়েকদিন পরেই ন্যানসি ফুলার নামে আর একটি মহিলার ঘরে কালো দস্তানা পরা চোরের আবির্ভাব হল।

আরও কয়েক দিন পরে সে হানা দিলে মিসেস বিলি স্টালের ঘরে এবং সেখানে কুড়িয়ে পাওয়া গেল তার কালো দস্তানা দুটো। নিশ্চয়ই সে দস্তানা পরে আঙুলের ছাপ লুকোবার জন্যে!

এবং আর একটা সূত্রও পাওয়া গেল।

শেষোক্ত ঘটনাক্ষেত্রে একজন প্রতিবেশী চুরির পরে দেখেছিল, চৌখুপি চেক-কাটা কোর্তাপরা একটা লোক একখানা নীলরঙের মাল সরবরাহের 'ট্রাক' চালিয়ে চলে যাচ্ছে।

গোয়েন্দাদের মনে প্রশ্ন জাগল, তবে কি চোর এমন কোনো কোম্পানিতে চাকরি করে, যাদের কাজ হচ্ছে গাড়িতে করে মাল সরবরাহ করা?

গোয়েন্দারা যখন মাল সরবরাহের গাড়ির কারখানায় কারখানায় খোঁজখবর নিচ্ছে, তখন কয়েকদিনের মধ্যেই আরও চার জায়গায় হানা দিলে কালো দস্তানার চোর। কিন্তু পুলিশ কোথাও তাকে গ্রেপ্তার করবার মতো কোনো নূতন সূত্রই আবিষ্কার করতে পারলে না।

তারপর আরও তিন জায়গায় হল দশ, এগারো ও বারো নম্বরের চুরি। শেষ ঘটনাক্ষেত্রে গোয়েন্দারা খুঁজে পেলে চোরের একপাটি জুতোর ছাপ। অস্পষ্ট ছাপ বটে, কিন্তু তারই সাহায্যে তোলা হল নিখুঁত একটি ছাঁচ।

গোয়েন্দা ব্রিন খুশি হয়ে বললেন, 'চোর ধরা পড়লে এই ছাঁচই হবে তার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ।'

গোয়েন্দা আর্ন বললেন, 'হ্যাঁ, যদি আমরা কখনও তাকে ধরতে পারি!'

মেয়েমহলে হল বিষম আতঙ্কের সৃষ্টি! কালো দস্তানার চোর বেছে বেছে কেবল আত্মরক্ষায় অক্ষম নারীদেরই আক্রমণ করে। এখনও সে কারুকে খুন করেনি বটে, কিন্তু করতেই বা কতক্ষণ?

পুলিশ উঠে পড়ে লাগল। তেরোজন সুদক্ষ গোয়েন্দাকে নিযুক্ত করা হল কেবল এই একটিমাত্র মামলার জন্যে। কত সন্দেহজনক ব্যক্তি এবং পুরাতন অপরাধীকে ধরে আনা হল, কিন্তু তারা সবাই আবার একে একে ছাড়া পেলে প্রমাণ অভাবে। দুইজন গোয়েন্দা প্রায় সারা রাত ধরে গাড়ি নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগল, যদি দৈবগতিকে চোরের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে যায়! একটানা পরিশ্রম ও অনিদ্রার জন্যে গোয়েন্দাদের চেহারা হয়ে উঠল ছন্নছাড়ার মতো। খবরের কাগজে-কাগজেও রীতিমতো সাড়া পড়ে গেল! এমন দুর্ধর্ষ ও অদ্ভুত চোরের কথা এর আগে কোনোদিন শোনা যায়নি!

গোয়েন্দারা আর এক অভিনব উপায় অবলম্বন করলে। চোর যে সব স্ত্রীলোকের বাড়িতে হানা দিয়েছিল, প্রতি রাত্রেই টহল দেবার সময়ে তারা সঙ্গে করে নিয়ে বেড়াতে লাগল তাদের কারুকে না কারুকেই। জনতার মধ্যে যদি তারা কারুকে চোর বলে চিনতে পারে!

কিন্তু তবু কোনো সুরাহা হল না। শহরের প্রায় প্রত্যেক গোয়েন্দা ও পাহারাওয়ালা যখন কালো দস্তানার চোরকে পাকড়াও করবার জন্যে অত্যন্ত সজাগ হয়ে আছে, তখন পুলিশের নাকের উপরেই চলতে লাগল ঘন ঘন চুরির পর চুরি!

॥ ৩ ॥

অবশেষে—

চোর হানা দিলে আর এক মেয়ের ঘরে। কত তুচ্ছ সূত্র থেকে গোয়েন্দারা কত বড়ো রহস্য ভেদ করতে পারে, এইবারে তারই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে।

কথাপ্রসঙ্গে মেয়েটি গোয়েন্দাদের বললে, 'আমার ঘরের দেওয়ালে একখানা বাড়ির ছবি টাঙানো রয়েছে দেখছেন? চোর হঠাৎ ওই ছবিখানা দেখে বলে উঠেছিল, 'আমাদের প্রেস্টনে ঠিক ওই-রকম একখানা বাড়ি আছে।'

গোয়েন্দারা প্রেস্টনের সংশোধনী কারাগারের (Reformatory) কর্তৃপক্ষকে ফোনে জিজ্ঞাসা করলে, 'কালো দস্তানার চোরের বর্ণনার সঙ্গে যার চেহারা মিলে যায়, এমন কোনো কয়েদিকে ওখান থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে কি না?'

বিশেষ করে দুইজন লোকের নাম পাওয়া গেল। জিম ডাউনি ও ফ্রাঙ্ক আভিলেজ। দুইজনেই কারাগারে গিয়েছিল মেয়েদের আক্রমণ করে।

গোয়েন্দারা প্রথমে গেল ডাউনির বাসায়। কিন্তু তার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ পাওয়া গেল না।

তারপর সন্ধ্যার সময়ে আভিলেজের বাসায় গিয়ে দ্বারে করাঘাত করতে বেরিয়ে এল তার মা। সে বললে, 'আমার ছেলে আর এখানে থাকে না। বিয়ে করে নতুন বাসায় উঠে গিয়েছে।'

—'নতুন বাসার ঠিকানা?'

বুড়ি ঠিকানা দিলে।

আভিলেজের নতুন বাসা। তার তরুণী স্ত্রী বেরিয়ে এসে বললে, 'আমার স্বামী বাড়িতে নেই।'

গোয়েন্দারা বললে, 'আমরা পুলিশের লোক। তোমাদের বাড়ির ভিতরটা দেখব।'

মিসেস আভিলেজ সমস্ত শুনে সবিস্ময়ে বললে, 'আমার স্বামী পরম সাধু। রাত্রে তিনি কোনোদিন বাড়ির বাইরে পা দেন না, আমার সঙ্গেই থাকেন।'

—'কোনোদিনই সে রাত্রে বাইরে যায় না?'

—'কোনোদিনই না।'

—'তবে আজ রাত্রে সে বাসায় নেই কেন?'

—'তিনি সিনেমায় গিয়েছেন।'

—'তুমি যাওনি কেন?'

—'আমি সিনেমা পছন্দ করি না।'

—'আভিলেজ প্রায়ই সিনেমায় যায়?'

—'হ্যাঁ, প্রায়ই।'

—'এই তোমার একটা মিথ্যা কথা ধরা পড়ল। তোমার স্বামী প্রায়ই রাত্রে বাড়িতে থাকে না।'

বাড়ির একটা ঘরে পাওয়া গেল পেনসিল-টর্চের কয়েকটা ব্যাটারি।

মেরি স্টারের ফ্ল্যাটবাড়িতে চোরের যে ছুরিখানা পাওয়া গিয়েছিল, সেখানা ছিল একজন গোয়েন্দার কাছে। সে ছুরিখানা লুকিয়ে একটা দেরাজের ভিতরে ফেলে দিলে। তারপর ফিরে মিসেস আভিলেজকে দেখিয়ে ছুরিখানা আবার দেরাজের ভিতর থেকে তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'এ খানা কার ছুরি?'

—'আমার শ্বশুরের। গেল হপ্তায় তাঁর কাছ থেকে আমার স্বামী চেয়ে নিয়ে এসেছেন।'

গেল হপ্তায়! এটা হচ্ছে জুলাই মাস, আর ছুরিখানা পুলিশের হেপাজতে আছে গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে!

—'মিসেস আভিলেজ, তুমি মিছে কথা বলছ। আমরা সত্যকথা জানতে চাই।'

—'আমি আর কোনো কথাই বলব না। আমি আমার স্বামীকে ভালোবাসি। তিনি চোর, একথা আমি বিশ্বাস করি না।'

ঘরের বাইরে চৌখুপি চেক-কাটা কোর্তা-পরা একটি লোক সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে জিজ্ঞাসা করলে, 'ঘরের ভেতরে কে?'

মিসেস আভিলেজ বেগে ছুটে গিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'ওগো, পুলিশ!'

আভিলেজ চোখের পলক পড়তে না পড়তেই ফিরে দাঁড়িয়ে নীচের দিকে মারলে এক লাফ।

একজন গোয়েন্দা রিভলভার তুলে ঘোড়া টেপে আর কী, আচম্বিতে মিসেস আভিলেজ ঝাঁপিয়ে পড়ল রিভলভারের সামনেই।

সেই ফাঁকে আভিলেজ আবার চলে গেল চোখের আড়ালে।

এর পরে একেবারে ভেঙে পড়ে মিসেস আভিলেজ, সমস্ত কথাই আর স্বীকার না করে পারলে না।

॥ ৪ ॥

আর বেশি কিছু বলবার নেই।

দুই শত পুলিশের লোক তন্নতন্ন করে গোটা শহরটা খুঁজে বেড়াচ্ছে। তবু আভিলেজের টিকি দেখবার জো নেই।

চোর যে আর নিজের বিপজ্জনক বাসায় ফিরে আসবে না, সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। গোয়েন্দারা তার মায়ের বাসায় গিয়ে হাজির।

সেখানে চোরের দেখা পাওয়া গেল বটে, কিন্তু দৃশ্যমান হবার সঙ্গে-সঙ্গেই আশ্চর্য তৎপরতা দেখিয়ে আবার সে হল অদৃশ্য!

দলে দলে পুলিশের লোক ছুটল পিছনে পিছনে। আবার এ রাস্তা, ও রাস্তা!

একখানা বাড়ির উপর থেকে একজন মহিলা বললেন, 'একটা লোক এইমাত্র আমার বাগানের ভিতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে ওই দশফুট উঁচু বেড়াটা পার হয়ে ওপাশে গিয়ে পড়েছে।'

বেড়ার ওপাশে গিয়ে দেখা গেল, একখানা মোটরগাড়ির তলায় লুকিয়ে রয়েছে ফ্রাঙ্ক আভিলেজ স্বয়ং! গোয়েন্দারা রিভলভার বার করতেই সে সকাতরে বলে উঠল, 'গুলি করো! আমাকে পাগলা কুকুরের মতো গুলি করে মেরে ফ্যালো!'

—'তোমাকে কেউ গুলি করে মেরে ফেলবে না, আভিলেজ! গাড়ির তলা থেকে বেরিয়ে এসো।

কালো দস্তানার চোর ধরা পড়েছে শুনে চারিদিক থেকে খবরের কাগজের রিপোর্টাররা ক্যামেরা নিয়ে ছুটে এল।

আভিলেজ প্রাণপণে ধস্তাধস্তি করতে করতে বললে, 'না, না, না, ছবি তুলতে আমি দেব না! খবরের কাগজে আমার ছবি বেরুবে? তাহলে আমার বউয়ের দুঃখের সীমা থাকবে না। সে বালিকা, তার বয়স মোটে সতেরো বৎসর!'

কিন্তু তার ছবিও উঠল এবং আমরাও তা এখানে ছেপে দিলুম।

বলা বাহুল্য, আভিলেজের বাসা এখন জেলখানায়।

অভিশপ্ত নীলকান্ত

প্রায় আট শতাব্দী আগেকার কথা। আমেরিকায় তখনও শ্বেতাঙ্গ সভ্যতার পত্তন হয়নি। আমেরিকার নামও তখন শ্বেতাঙ্গরাও জানত না। বর্তমানে যে দেশ দক্ষিণ আমেরিকা নামে বিখ্যাত, তারই উত্তর-পশ্চিম দিকে এক বিশাল অংশ জুড়ে ছিল তখন ইনকাদের সাম্রাজ্য। ইনকা জাতের লোকদের আজ 'রেড ইন্ডিয়ান' বা লাল মানুষ বলে ডাকা হয়।

ইনকারা যে রীতিমতো সভ্য ছিল, তাদের স্থাপত্য প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ দেখলে সেটা বুঝতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু মধ্যযুগের যুদ্ধলিপ্সু শ্বেতাঙ্গেরা তাদের সভ্যতা ও সাম্রাজ্যকে বিলুপ্ত করে দিয়েছে।

পৃথিবীর সব রাজবংশেই কোহিনুরের মতো বিখ্যাত মণি বা হীরকের আদর আছে। ইনকারাও একটি বিশেষ হীরকের অধিকারী ছিল। সে একটি অতি মূল্যবান নীলকান্ত মণি। তার রং উজ্জ্বল নীল।

প্রায় আট শত বৎসর আগে ওই দুর্লভ হিরাখানি চুরি যায়। কেমন করে, কেউ তা জানে না।

ইনকাদের প্রধান পুরোহিত চোরের উদ্দেশে দিলেন অভিশাপ। একটা বা দুটো নয়, মোট নিরানব্বইটা অভিশাপ! প্রত্যেক অভিশাপের মূল কথা হচ্ছে, যার কাছে এই মণি থাকবে তার সর্বনাশ হবে।

পুরোহিতের অভিশাপ ব্যর্থ হয়নি। গত কয়েক শতাব্দীর মধ্যে বহু ব্যক্তি এই অভিশপ্ত মণির মালিক হয়ে লাভ করেছে চরম দুর্গতি বা দুর্ভাগ্য—অর্থাৎ মৃত্যু।

সেকালের করুণ ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ করবার জায়গা আমাদের নেই। আমরা একালের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করব।

॥ খ ॥

১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে একজন নাবিক ব্রেজিলের পার্নামবুকো শহরে গিয়ে এক দোকানে ওই নীলকান্ত মণিখানি দেখতে পায় এবং কিনতে চায়।

দোকানদার বললে, 'কিন্তু আমি জানানো উচিত মনে করছি যে এখানা হচ্ছে ইনকাদের বিখ্যাত অভিশপ্ত মণি।'

নাবিক বললে, 'অভিশাপের নিকুচি করেছে। হিরাখানা আমি কিনব।'

হিরাখানা সে নিজের আংটির উপরে বসিয়ে নিলে। চারদিন পরে গলাকাটা অবস্থায় তার মৃতদেহ পাওয়া গেল এক জেটির উপরে।

তারপরেই ওই হিরার আংটির মালিক হল আর এক নাবিক। তারও মরতে দেরি লাগল না। দেহ তার কুচি কুচি করে কাটা, কিন্তু হাতের আঙুলে সেই হিরার আংটি।

নাবিকের বউ শখ করে আংটিটা নিজের আঙুলে পরলে এবং ঠিক বিশ দিন পরেই একখানা পাঁচতলা বাড়ির উপর থেকে ঝাঁপ খেয়ে আত্মহত্যা করলে।

আংটিটার নতুন নাম হল 'পার্নামবুকোর প্রমাদ।'

তারপর আংটিটা যেখানে যায়, সেখানেই ডেকে আনে সর্বনাশকে। একে একে মারা গেল পাঁচজন লোক। প্রত্যেক মৃত্যুই অপঘাত।

তারপর বেশ কিছুকাল ধরে এই সর্বনেশে হিরার আংটির আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি, সুতরাং ইতিমধ্যে সে আরও কারুর কারুর অপঘাত-মৃত্যুর কারণ হয়েছিল কি না সে কথা জানা যায় না।

আমরা বলব তার পরের ঘটনা।

॥ গ ॥

পৃথিবীর প্রথম মহাযুদ্ধ তখন শেষ হয়ে গিয়েছে।

চলচ্চিত্রের জন্য বিখ্যাত হলিউড শহর।

সেখানে হঠাৎ এক শ্রেণির চোরের আবির্ভাব হল। তারা দামি দামি মোটরের নানা অংশ খুলে নিয়ে চম্পট দেয়। থানায় থানায় অভিযোগের পর অভিযোগ আসে। পুলিশ রীতিমতো সজাগ।

ক্লার্ক হচ্ছে একজন পুলিশ কর্মচারী। এক রাত্রে রাস্তায় টহল দিতে দিতে দেখতে পেলে, দু-খানা মোটরগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, তার মধ্যে পিছনের গাড়িখানার চলন্ত ইঞ্জিনের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

আরও কয়েক পা এগিয়েই ক্লার্ক বুঝতে পারলে, দুজন লোক সামনের গাড়িখানার অংশ খুলে নেওয়ার কাজে ব্যাপৃত হয়ে আছে।

তৃতীয় এক ব্যক্তি যে একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে, ক্লার্ক তা দেখতে পেলে না। সে আরও এগিয়ে ভালো করে তদন্ত করতে এল।

অমনি ওরে বাসরে, ধ্রুম ধ্রুম ধ্রুম! উপর-উপরি রিভলভারের গুলিবৃষ্টি!

ক্লার্ক এক লাফে একটা দেওয়ালের পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পৈতৃক প্রাণ রক্ষা করলে। পিছনের গাড়িখানা তিরবেগে ছুটে বেরিয়ে গেল।

ক্লার্ক ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে রিভলভার বাগিয়ে ধরে ছুটন্ত গাড়িখানার দিকে প্রেরণ করলে একটা উত্তপ্ত বুলেট।

গাড়িখানা থামল না বটে, কিন্তু শোনা গেল একটা একটানা আর্তনাদ।

বুলেটে বিদ্ধ হয়েছে অন্তত একটা চোরের দেহ।

চারিদিকে খোঁজ খোঁজ রব উঠল। হাসপাতালে হাসপাতালে এবং ডাক্তারদের বাড়িতে বাড়িতে সন্ধান নেওয়া হল, কোনো আহত লোক চিকিৎসার জন্যে গিয়েছে কি না।

না, কেউ যায়নি।

তবে কি লোকটা মারা পড়ল? লাশটা কি কোথাও পুঁতে ফেলা বা ফেলে দেওয়া হয়েছে? তখন সেই তল্লাশ চলল।

দিন-চারেক পরে একটা ড্রেনের ভিতর থেকে আবিষ্কৃত হল একখানা মোটর-গাড়ির তলায় পাতা কম্বল এবং একটা সচ্ছিদ্র টুপি। দুটো জিনিসেই লেগে আছে রক্তের দাগ।

বোঝা গেল বুলেটের আঘাতেই টুপিটা ছ্যাঁদা হয়ে গেছে। মাথায় যখন বুলেট লেগেছে, লোকটা তখন আর বেঁচে নেই।

কিন্তু তার মৃতদেহ কোথায়?'

॥ ঘ ॥

দুর্ঘটনার পর কেটে গেল আট দিন।

ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়াল কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরুনোর মতো।

মেট্রো-গোল্ডউইন-মেয়ারের স্টুডিয়োর কাছে যে ছোটো নদী আছে, তারই তীরে মাটি খুঁড়ছিল দুজন মজুর।

খুঁড়তে খুঁড়তে আচমকা বেরিয়ে পড়ল একটা মৃতদেহ! প্রায় গলিত অবস্থা, পোশাক-পরিচ্ছদ যেন রক্তে ছোপানো এবং লাশের মাথায় একটা বুলেটের ছিদ্র।

খবর পেয়ে পুলিশ ছুটে এল দলে দলে।

পুলিশের এক বড়োকর্তা দেখে শুনে বললে, 'নিশ্চয় ক্লার্কের গুলিতেই লোকটা মারা পড়েছে।'

কিন্তু তার পরেই আবিষ্কৃত হল আর এক ব্যাপার। মৃতদেহের বুকের উপরে আর একটা বুলেটের ছ্যাঁদা।

ক্লার্ক বলে, সে একবারের বেশি রিভলভার ছোড়েনি। একটি মাত্র বুলেট, কিন্তু মাথায় এবং বুকে দু-দুটো ছ্যাঁদা! তাও কখনও হয়?

গোয়েন্দাদের চক্ষুস্থির!

যুবকের মৃতদেহ। মাথায় মাঝারি, পেশিবদ্ধ জোয়ান দেহ, সাজপোশাক দামি কিন্তু রুচিসম্মত। পোশাক তল্লাশ করে কিছুই পাওয়া গেল না, কেবল কামিজের হাতায় আছে দুটো বোতাম, তার উপরে খোদা তিনটে অক্ষর—এন. এফ. ডি.।

পোশাকের উপরে দেখা গেল ওকল্যান্ডের এক দরজির নাম ও ঠিকানা।

আবার তিন দিন কেটে যায়।

ওকল্যান্ড থেকে খবর এল, মেরি ডাবেলিকের স্বামী হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়েছে। তার নাম নিকোলাস এফ ডাবেলিক।

মেরি এসে নিকোলাসের দেহ শনাক্ত করলে।

তার মুখে জানা গেল, নিকোলাস ভদ্র বংশের সন্তান এবং নিজেও অতি ভদ্র, অতি সজ্জন। সে নাম-করা ব্যবসায়ী। সে অসৎ-সঙ্গ পরিহার করে চলে। সে অজাতশত্রু।

মাস-কয়েক আগে সে একটি দশ রতি হিরার মূল্যবান আংটি ক্রয় করেছিল এবং তারপর থেকেই কেবল যেন সন্ত্রস্ত হয়ে থাকত। প্রায়ই বলত, 'কে যেন সর্বদাই আড়াল থেকে আমার উপরে ওত পেতে আছে, কে যেন আমার সমস্ত গতিবিধি লক্ষ করছে, কে যেন আমাকে গুরুতর বিপদে ফেলতে চায়!'

—'যেদিন নিকোলাসের সঙ্গে তোমার শেষ দেখা, সেদিনও কি তার হাতে ওই আংটিটা ছিল?'

—'ছিল বই কি!'

—'টাকাকড়ি?'

—'তার সঙ্গে সর্বদাই কয়েক শত টাকা থাকত।'

—'টাকা বা আংটি কিছুই আমরা পাইনি।'

—'শুনেছি ওই হিরার আংটিটা নাকি বড়োই অলক্ষুণে! কিন্তু শুনেও নিকোলাস আংটিটা হাত থেকে খুলে রাখতে রাজি হয়নি।'

—'তোমার স্বামীর বন্ধুদের কথা কিছু বলতে পারো?'

—'আমার স্বামীর বিশেষ বন্ধু বলতে একজনকেই বোঝায়। তাঁর নাম জ্যাক অ্যালেন। খুব ভদ্রলোক। ওকল্যান্ডেই থাকেন! এখনও তিনি আমাদের খোঁজ-খবর নেন।'

ওকল্যান্ড থেকে ঘটনাক্ষেত্র হচ্ছে চারশো মাইল দূরে। তবু গোয়েন্দারা অ্যালেনের সঙ্গে গিয়ে দেখা করলে।

কিন্তু অ্যালেনের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য কিছুই জানা গেল না।

গোয়েন্দারা ফাঁপরে পড়ে গেল। একটা আহত বা নিহত চোরের সন্ধান করতে গিয়ে পাওয়া গেল ওকল্যান্ডের এক বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর মৃতদেহ! তার উপরে কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসল একটা প্রাচীন ও অভিশপ্ত নীলকান্ত মণির রহস্য! কিছুই ধরবার ছোঁবার জো নেই।

॥ ৬ ॥

তারপরেই সব ঘটনার জট খুলে গেল অকস্মাৎ।

ওকল্যাণ্ডের এক জহুরির কাছে খবর পাওয়া গেল, সেখানে জনৈক ব্যক্তি একখণ্ড মূল্যবান হিরার দর যাচাই করতে গিয়েছিল। কিন্তু যাচাই করতে দিন কয় দেরি লাগবে শুনে সে হিরা নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি প্রস্থান করেছে।

—'তার চেহারা আর সাজপোশাক কী-রকম?'

জহুরির বর্ণনা শুনে গোয়েন্দাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল হুবহু জ্যাক অ্যালেনের মূর্তি!

অ্যালেনকে থানায় ডেকে আনা হল। সে বললে, 'আমি নির্দোষ ভদ্রলোক। আমি চোরও নই, খুনিও নই।'

গোয়েন্দারা তখন পুলিশের দপ্তর খুঁজে দেখতে লাগল, তার মধ্যে নির্দোষ ভদ্রলোক অ্যালেনের পূর্বজীবনের কাহিনি পাওয়া যায় কি না?

পাওয়া গেল। তার আসল নাম হচ্ছে, ফরেস্ট সিসিল মিঙ্গল। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে সে আমেরিকার অন্য এক শহরে একটি মহিলাকে হত্যা করে তাঁর গহনার বাক্স চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে এবং দীর্ঘকাল জেল খাটে।

তখন ভেঙে গেল মিঙ্গল ওরফে অ্যালেনের সাধুতার ভড়ং। তারপর খুব সহজ হয়ে গেল গোয়েন্দাদের কাজ। অবশেষে মিঙ্গলকে কারে পড়ে স্বীকার করতে হল যে, অভিশপ্ত নীলকান্ত মণির লোভেই সে নিকোলাসকে হত্যা করেছে।

বিচারে তার যাবজ্জীবন কারাবাসের হুকুম হল।

কিন্তু যাকে নিয়ে এই কাহিনির সূত্রপাত, সেই মোটর-চোরটা ক্লার্কের গুলি খেয়ে জখম হল কি মারা পড়ল, তার কোনোই পাত্তা পাওয়া গেল না।

আর জানা গেল না সেই ভয়াবহ নীলকান্ত মণির পরিণাম! মিঙ্গল ধরা পড়বার আগে সেখানা কোথায় লুকিয়ে ফেলেছে, না আবার কারুর কারুর হাতের আংটিতে সংলগ্ন হয়ে সে নূতন নূতন সর্বনাশের আয়োজন করেছে?

কিন্তু তার অভিশাপ থেকে মিঙ্গলও শেষ পর্যন্ত মুক্তিলাভ করতে পারেনি।

কারাগারে একদিন আচম্বিতে ঘুম থেকে জেগে উঠে সে ভয়ার্ত কণ্ঠে চিৎকার করতে লাগল 'ওই আংটি! ওই আংটি! ওই আংটি!'

তারপর কারাগারেই হঠাৎ তার মৃত্যু হয়।

অ্যাডভেঞ্চারের রোমাঞ্চ

॥ ক ॥

রাবিশ। লোকে নাকি রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার খোঁজে? তারা হচ্ছে পয়লা নম্বরের ভ্যাবা-গঙ্গারাম! তারা জানে না অ্যাডভেঞ্চারের রোমাঞ্চ কতখানি মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে!

উঃ, সেদিনের কথা মনে করলে আজও হিম হয়ে যায় আমার হাত-পা—জল হয়ে যায় আমার বুকের রক্ত! তারপর থেকে স্বচক্ষে দেখেও আমি আর সহসা কোনোকিছুই বিশ্বাস করতে রাজি হই না।

ব্যাপারটা আপনারা তলিয়ে বুঝতে পারছেন না? তাহলে গোড়া থেকে সব কথা খুলেই বলি।

ইষ্টক-পিঞ্জরে বন্দি শহুরে মানুষরা প্রকৃতির আশীর্বাদ আদায় করবার জন্যে রেল গাড়িতে চড়ে দূর-দূরান্তরে—দেশ-দেশান্তরে গিয়ে হাজির হয়। আমার মতে, এটা হচ্ছে খামোখা অর্থ ও সময়ের অপব্যয়।

টালিগঞ্জের রিজেন্ট পার্কের ভিতর দিয়ে পুব-মুখো রাস্তা ধরে সাইকেলে চেপে সোজা গড়ের দিকে চলে যান। ঘণ্টাখানেক পরে সাইকেল থেকে নেমে পড়ুন। তারপর ডান দিকে মিনিট-কয়েক পদচালনা করুন। ব্যাস, শহরতলিতে থেকেও কলকাতাকে আপনি ভুলে যাবেন।

কেবল এই দিকেই নয়, কলকাতার আশেপাশে আমাদের নাগালের ভিতরে প্রকৃতিদেবীর এমনি আরও সব জায়গা আছে, সে-সব আমরা দেখেও দেখি না।

সেদিন আমি গিয়েছিলুম গড়ের দিকেই। পাশেই আদিগঙ্গার শুকিয়ে আসা ধারা ঝির-ঝির করে বয়ে যাচ্ছে। একটা আট-নয় হাত চওড়া ভাঙা নড়বোড়ে সাঁকো পেরিয়ে এগিয়ে চললুম দক্ষিণ দিকে। তাপর সিকি মাইল পথ পার হতে না হতেই গিয়ে দাঁড়ালুম একেবারে নির্জনতার অন্তঃপুরে।

কোথায় ইষ্টকস্তূপ, ধুলোধোঁয়া এবং যন্ত্রযান ও মনুষ্যকণ্ঠের গণ্ডগোল? বদলে গিয়েছে সমস্ত দৃশ্য এবং শব্দ-গন্ধ স্পর্শ! চোখে পড়ে কেবল দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়া নিছক শ্যামলতার মহোৎসব এবং কানে জাগে কেবল বিহঙ্গ, সমীরণ ও তরুমর্মরের মিশ্র সংগীত। কোথাও নেই জনমানবের দেখা বা সাড়া। বড়ো ভালো লাগল।

সামনেই রয়েছে চষা শস্যখেতের পর শস্যখেত। মাঝখান দিয়ে একটা খুব সরু পায়ে চলা পথ ক্রমোন্নত হয়ে বেশ উঁচু ও বড়োসড়ো একটা ঢিপির উপরে গিয়ে উঠেছে। ঢিপির টঙে ছোটো একখানা চালা ঘর—বাঁখারি ও দরমার দেওয়াল, সামনে একটুখানি দাওয়াও আছে। আসবাবহীন খোলা ঘর। বোধ হয় কৃষাণরা এইখানে বসে শস্যখেতের উপরে পাহারা দেয়।

॥ খ ॥

সে সময়ে ঘরে কেউ ছিল না। আমি দাওয়ায় গিয়ে বসে পড়লুম।

শীতের দুপুর উতরে গিয়েছে। দিকে দিকে ঝরে পড়ছে সুখদ তপ্ততা মাখা রোদের সোনালি। কোথায় কোন গাছের পাতার আড়ালে লুকিয়ে একটা বনকপোত নিজের অস্তিত্ব জাহির করছিল। তা ছাড়া চারিদিক নিঝুম।

গোয়েন্দা কাহিনি পড়তে আমি ভারী ভালোবাসি। একখানা আধা-পড়া বই সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলুম—ধুমধাম সিরিজের ধুন্ধুমার সেন লিখিত 'ধূমাবতী হত্যারহস্য'। বিষম চমকদার বই, পড়তে বসলে আর কোনো জ্ঞান থাকে না। দাওয়ায় বসে তারই ঘটনার ধারার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেললুম।

পড়তে পড়তে সেই জায়গায় এসে আমার শ্বাস-প্রশ্বাস প্রায় রুদ্ধ হবার উপক্রম—যেখানে ধুরন্ধর গোয়েন্দা ধনেশচন্দ্র ধূমাবতীর ধুমসো ধুমসো হত্যাকারীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে এবং ধমাধম বেদম মার খেয়েও ধাক্কাধাক্কি ও ধস্তাধস্তি করতে ছাড়ছেন না! অবশেষে তিনি তিন-তিনবার অনায়াসেই রিভলভারের গুলিকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে একাই চারজন লোককে তুলে তুমুল আছাড় মারলেন এবং তারপর—

এবং তারপর ধ্রুম, ধ্রুম, ধ্রুম করে তিন-তিন বার আগ্নেয়াস্ত্রের ভীষণ গর্জন!

সচমকে বই ফেলে উঠে দাঁড়ালুম। কেতাবি আগ্নেয়াস্ত্র বড়ো জোর মনকে চমকে দিতে পারে, কিন্তু এ যে বাবা কানে তালা ধরিয়ে দিগ্বিদিক তোলপাড় করে তুললে! ভয়ার্ত চিৎকারে চারিদিক মুখরিত করে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি সে পাড়া ছেড়ে সরে পড়ল। উঁহুঁ, এ তো ধূমাবতীর হত্যাকারীদের রিভলভার বলে সন্দেহ হচ্ছে না, খুব কাছেই নিশ্চয় কারা বন্দুক ছুড়েছে!

শিকারিরা এখানে কি পাখি শিকার করতে এসেছে?

তারপরেই নারীকণ্ঠে মর্মভেদী পরিত্রাহি চিৎকার—'রক্ষা করো, রক্ষা করো, রক্ষা করো!'

এবং পরমুহূর্তে বহু পুরুষ-কণ্ঠে শোনা গেল ক্রুদ্ধ চিৎকার—'ধরো, ধরো!' 'খুন করো!' 'বন্দি করো!'

কী সর্বনাশ! আচম্বিতে আমি কি কোনো সত্যিকার অ্যাডভেঞ্চারের সম্মুখীন হতে চলেছি?

শহরের বুকের ভিতরে প্রকাশ্য দিবালোকেই আজকাল রাহাজানি, হানাহানি ও খুনখারাপি তো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে উঠেছে; সুতরাং দুরাত্মারা যে অনায়াসেই এখানকার নির্জন ও নিরালা গ্রাম্য পরিবেশের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে, এটুকু সহজ বুদ্ধিতেই বুঝতে বিলম্ব হয় না।

কিন্তু অতঃপর আমার কী কর্তব্য? বেশ বোঝা যাচ্ছে, দুরাত্মারা রীতিমতো দলে ভারী এবং তাদের কাছে আছে আগ্নেয়াস্ত্র। আমি হচ্ছি কবিবর্ণিত 'অন্নধ্বংসী বঙ্গবাসী স্তন্যপায়ী জীব', রোমাঞ্চকর উপন্যাসের ভক্ত হলেও 'ধূমাবতী হত্যারহস্যে'র ধুরন্ধর গোয়েন্দা ধনেশচন্দ্রের মতো একাই একদল পাষণ্ডকে তুলে আছাড় মারবার শক্তি আমার নেই। একদল তো দূরের কথা, মাত্র একজনকেও আমি তুলে আছাড় মারতে পারব না। কিন্তু তবু আমার পক্ষেও একটা যাহোক কিছু করা উচিত তো?

অন্তত চুপিচুপি দুই পা এগিয়ে গিয়ে আড়াল থেকে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখতে দোষ কী?

দাওয়া থেমে নামলুম। কিন্তু চালাঘরের পাশ দিয়ে পায়ে পায়ে একটু অগ্রসর হয়েই চমকে এবং থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম। যা দেখলুম তা কেবল স্বপ্নাতীত নয়, ভয়ংকর রূপে রোমাঞ্চকর।

আগেই বলেছি, আমি উঠেছিলুম বেশ উঁচু ও বড়োসড়ো একটা ঢিপির টঙে। সেখান থেকে নীচেকার সমস্ত দৃশ্য দেখাচ্ছিল যেন সমতল পাহাড়তলির মতো। অনেক দূর পর্যন্ত চোখের সামনে ছবির মতো পড়ে রয়েছে কোথাও শস্যখেত, কোথাও তৃণশ্যামল ময়দান এবং কোথাও বা জঙ্গল ও ঘনসন্নিবিষ্ট গাছপালা।

একটা মাঠের উপর দিয়ে প্রেতভয়গ্রস্তের মতো ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে তিনজন ভদ্রবেশী যুবক ও একটি সুসজ্জিতা তরুণী।

ছুটতে ছুটতে তরুণী হঠাৎ মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল যুবক তিনজনও। একজন তাড়াতাড়ি ফিরে এসে হেঁট হয়ে পড়ে তরুণীকে আবার তুলে দাঁড় করাবার চেষ্টা করছে, এমন সময়ে আচম্বিতে একদল যমদূতের মতো ভীষণদর্শন লোক বড়ো বড়ো লাঠি নিয়ে তাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। যুবকরা খালি হাতেই বাধা দেবার চেষ্টা করলে কিন্তু পারলে না, বেপরোয়া লাঠির ঘায়ে একে একে তারা হল ধরাশায়ী।

তারও পর আরও কিছু দেখবার ভরসা আমার হল না, অবিলম্বে সেই বিপজ্জনক স্থান ত্যাগ করে যে পথে উপরে উঠেছিলুম সেই পথ দিয়েই নীচে নেমে এলুম প্রাণপণ বেগে।

॥ গ ॥

নড়বোড়ে সাঁকোর এপারেই পথের উপরে ছিল একখানা মুদির দোকান।

আমাকে অমন উঠি তো পড়ি ছুটতে দেখি মুদি সবিস্ময়ে বললে, 'কী মশাই, ব্যাপার কী?'

আমি চিৎকার করে বললুম, 'থানা কোন দিকে—থানা কোন দিকে?'

মুদি একদিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বললে, 'ওই দিকে। কিন্তু হয়েছে কী? থানায় যাবেন কেন?'

আমি থানার পথে ছুটতে ছুটতে বললুম, 'খুন! রাহাজানি! মেয়ে চুরি!'

* * *

আমার মুখে সংক্ষেপে সব কথা শুনে থানার অফিসার শুধোলেন, 'কী বললেন? তাদের কাছে বন্দুকও আছে?

—'হ্যাঁ স্যর! আমি তিনবার বন্দুকের আওয়াজ শুনেছি!'

চিন্তিত মুখে তিনি বললেন, 'তাহলে আমাদেরও তো দস্তুরমতো তৈরি হয়ে যেতে হয়!'

...একদল পাহারাওয়ালা নিয়ে আমরা আবার যখন সেই সাঁকোর কাছে এসে পড়লুম, তখন মুদির দোকানের সামনে অপেক্ষা করছিল প্রকাণ্ড এক উত্তেজিত জনতা। এর মধ্যেই লোকের মুখে মুখে ভয়াবহ খবরটা রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছে দিকে দিকে!

আমরা সাঁকো পার হলুম—সেই প্রকাণ্ড জনতাও চলল আমাদের পিছনে পিছনে। ঢিপির উপরে উঠে চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করেও জনপ্রাণীকে আবিষ্কার করা গেল না। তবে কি দুরাত্মারা কার্যোদ্ধার করে সরে পড়েছে?

ঢিপির ওপাশ দিয়ে নেমে সমতল ক্ষেত্রের উপরে গিয়ে দাঁড়ালুম।

একটু এগিয়ে মোড় ফিরেই দেখি, মস্তবড়ো একটা ঝাঁকড়া বটগাছের ছায়ায় বসে বা দাঁড়িয়ে গুলতানি করছে এক দঙ্গল লোক।

প্রথমেই আমার অতিরিক্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পড়ল, সে সুসজ্জিতা তরুণী মহিলাটিকে একটু আগেই বিপদগ্রস্ত দেখেছিলুম, তিনিই এখন সেই যমদূতের মতো দেখতে লোকগুলোর মাঝখানে বসে পরম নিশ্চিন্তে হাসিমুখে চা পান করছেন!

॥ ঘ ॥

পুলিশ ও জনতা দেখে একজন ভদ্রলোক কৌতূহলী মুখে এগিয়ে এল।

ইনস্পেকটার শুধোলে, 'কে আপনি?'

লোকটা একগাল হেসে বললে, 'আমাকে চেনেন না? আমি হচ্ছি হৈমবতী ফিল্ম কোম্পানির পরিচালক হরেন হালদার। আর ওই মহিলাটি হচ্ছেন আমার স্ত্রী চিত্রতারকা হাসিনী হালদার।'

—'এখানে কী করছেন?'

—'এখানে এসেছি 'হইহইপুরের হন্তারক' ছবির একটা দৃশ্য তুলতে। দুরাত্মারা নায়ক আর তার দুই বন্ধুকে কাবু করে নায়িকাকে হরণ করে নিয়ে গেল।'

আমাদের পিছনের জনতার ভিতর থেকে বহুকণ্ঠে সমস্বরে উঠল এমন তুমুল অট্টহাস্য যে, কাঁপতে লাগল আকাশ, বাতাস, মাঠ ও অরণ্য।

আমি যখন মনে মনে ভাবছি—ভগবতী বসুন্ধরে, দ্বিধা বিভক্ত হও, ইনস্পেকটার তখন আমার কাঁধ ধরে নাড়া দিয়ে কঠোর স্বরে বললে, 'ভুল খবর দিয়ে আপনি পুলিশকে হাস্যস্পদ করতে চেয়েছেন। আপনাকে আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে।'

তার পরের কাহিনি আর না বলাই ভালো।

একপাটি জুতো

একটা তদন্ত সেরে বাড়িমুখো হয়েছে জয়ন্ত ও মানিক। সঙ্গে একজন সেপাই ও একজন দারোগা। রাস্তা দিয়ে তারা গল্প করতে করতে আসছে, হঠাৎ একখানা বাড়ির দোতলা থেকে ডাক এল—'ও জয়ন্ত, ও মানিক!'

তারা মুখ তুলে দেখে, বারান্দার উপরে দাঁড়িয়ে আছে তাদের পুরাতন বন্ধু নবীনচন্দ্র। সে জমিদার। জয়ন্ত ও মানিককে নিয়ে মাঝে মাঝে নিজের জমিদারিতে শিকার করতে যায়।

জয়ন্ত বলল, 'কী খবর নবীন?'

নবীন বলল, 'তোমার সঙ্গে একটু পরামর্শ আছে। ভিতরে এসে বৈঠকখানায় বোসো। আমি যাচ্ছি!'

বৈঠকখানায় ঢুকেই জয়ন্তের হুঁশিয়ার চোখ দেখলে দুটো ব্যাপার। দেওয়ালের বড়ো ঘড়িটা নামিয়ে রাখা হয়েছে মেঝের উপরে। এবং পূর্ব দিকের জানলায় একটা গরাদে নেই, সেটাকেও কে খুলে মেঝের উপর ফেলে রেখেছে! জানলার কাছে গিয়ে সে বুঝতে পারলে, জানলার তলাকার কাঠের ফ্রেমে বাটালি বা কোনো অস্ত্র চালিয়ে কেউ স্থানচ্যুত করেছে গরাদেটাকে।

সে ফিরে বললে, 'মানিক, এই ঘরে কেউ অনধিকার প্রবেশ করেছে। নবীন বোধ হয় সেই জন্যেই আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে চায়।'

—'ঠিক আন্দাজ করেছ জয়ন্ত! সেই জন্যেই আমি তোমাকে ডেকেছি বটে।' বলতে বলতে নবীন ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল।

আসন গ্রহণ করলে সকলে। বেয়ারাকে চা, টোস্ট ও এগ-পোচ আনবার হুকুম দিয়ে নবীন বললে, 'কাল রাতে এই ঘরে চুরি হয়ে গিয়েছে। গুরুতর চুরি নয়, তোমার মতো ধুরন্ধর গোয়েন্দার কাছে ব্যাপারটা তুচ্ছ বলেই মনে হবে। চুরি গিয়েছে আমার একটি রেডিয়ো-যন্ত্র!'

মানিক বিস্মিত স্বরে বললে, 'তোমার ঘরে রেডিয়ো যন্ত্র!'

নবীন হেসে বললে, 'হ্যাঁ মানিক! তোমরা সকলেই জানো, রেডিয়োর একটানা একঘেয়ে ঘ্যানঘ্যানানি আমার ধাতে সহ্য হয় না, তাই এতদিন এ বাড়িতে রেডিওর ছিল না কোনো ঠাঁই। কিন্তু বড়োমেয়েটা রেডিয়োর জন্যে এমন বিষম আবদার ধরেছে যে, কাল বৈকালে নগদ আটশত পঞ্চাশ টাকা মূল্য দিয়ে একটা বেতার-যন্ত্র না কিনে এনে আর পারা গেল না। যন্ত্রটা ওই টেবিলের উপর রেখে ঘর থেকে চলে গিয়েছিলুম, কিন্তু চোর তাকে এখানে রাত্রিবাসও করতে দেয়নি।'

জয়ন্ত বললে, 'চোর এসেছে ওই গরাদেটা খুলে?'

—'হ্যাঁ।'

—'পূর্ব দিকের ওই সরু গলিটা কী?'

—'মেথর আসবার পথ। চোর বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে ওই গলিতে দাঁড়িয়ে ফ্রেম কেটে গরাদে খোলবার সুযোগ পেয়েছিল।'

—'ঘড়িটা মেঝের উপর নামানো কেন?'

—'ওটাও চোরের কীর্তি। তার ইচ্ছা ছিল ঘড়িটাও সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। কিন্তু ঘরের ভিতরে সন্দেহজনক শব্দ শুনে বেয়ারা এসে পড়ায় সে পালিয়ে

যেতে বাধ্য হয়েছে। তাড়াতাড়ি পালাবার সময়ে যে নিজের একপাটি জুতোও নিয়ে যেতে পারেনি।'

এইবারে জয়ন্ত কিঞ্চিৎ আগ্রহ প্রকাশ করে বললে, 'জুতো? কোথায় এই জুতো?'

—'ওই যে, জানলার তলাতেই পড়ে রয়েছে।'

জয়ন্ত এগিয়ে গিয়ে জুতোর পাটিটা তুলে নিলে, বেশ মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করলে প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে। তারপর মুখ তুলে ধীরে ধীরে বললে, 'নবীন, এ হচ্ছে এমন কোনো লোকের জুতো, যার ডান পদতল বিকৃত, জুতোর বেডৌল গড়ন দেখেই তা ধরা যায়। বাটার কারখানায় তৈরি সস্তা দামের ছয় নম্বরের রবারের জুতো। এর ভিতরে সাদা সাদা কী রয়েছে দেখছ?'

—'বোধ হয় গুঁড়ো চুন।'

জয়ন্ত মুখে কিছু না বলে মাথা নেড়ে জানালে, না।

বেয়ারা চা প্রভৃতি নিয়ে এল এমন সময়ে।

একটা টেবিলের কাছে গিয়ে জয়ন্ত বললে, 'বেতার-যন্ত্রটা কাল রাতে এই টেবিলের উপরে ছিল তো? বেশ, আমি এইখানে বসেই চা পান করব।'

জয়ন্ত নীরবে চা ও খাবার খেতে খেতে উত্তর দিকে জানলাগুলো দিয়ে বারংবার রাস্তার দিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগল।

পানাহার শেষ করে জয়ন্ত বললে, 'নবীন, তোমার বাড়িতে বেতারের গণ্ডগোল কেউ কোনো দিন শোনেনি; এ বাড়িতে ওই উপসর্গ আছে, বাইরের লোক এমন সন্দেহ করতে পারবে না। অথচ যেদিন তুমি রেডিয়ো-যন্ত্র কিনেছ, ঠিক সেই দিনই তা চুরি হয়ে গেল। সুতরাং বেশ বোঝা যায়, এ হচ্ছে পাড়ার কোনো সন্ধানী চোরের কাণ্ড। যন্ত্রটা সে বৈকালেই রাস্তা থেকে দেখতে পেয়েছিল।'

নবীন বললে, 'কিন্তু সে যে কে, বুঝতে পারব কেমন করে?'

—'এখান থেকে রাস্তার ওপারে দেখতে পাচ্ছি দু-খানা বাড়ি। ও বাড়ি দু-খানা কাদের?'

—'লাল বাড়িখানায় থাকেন হাইকোর্টের এক উকিল। পাশের হলদে বাড়িখানা ভাড়াটে। একখানা কি দু-খানা ঘর নিয়ে ওখানে বাস করে ছয়-সাতটি পরিবার। আমাদের সরকারবাবুও থাকেন ওই বাড়ির দোতলায়।'

—'বটে, বটে! একবার তাঁকে এখানে আসতে বলবে?'

অবিলম্বে সরকারবাবুর প্রবেশ। জয়ন্ত শুধোলে, 'আপনার নাম?'

—'শ্রীবিনয়কুমার প্রামাণিক।'

—'সামনের ওই বাড়িতে আপনি কতদিন বাস করছেন?'

—'প্রায় তিন বৎসর।'

—'ওখানকার আর সব ভাড়াটেকে আপনি চেনেন কি?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, প্রায় সকলকেই।'

—'দোতলায় আপনার সঙ্গে থাকেন কারা?'

—'পরিবার নিয়ে আর তিনটি ভদ্রলোক।'

—'তাঁদের পেশা?'

—'দুজন কেরানি, একজন স্কুলমাস্টার।'

—'নীচেয় কারা থাকেন?'

—'সবাই পূর্ববঙ্গের লোক।'

—'তাঁরা কী কাজ করেন?'

—'বেশির ভাগ লোকই কাটা কাপড়ের ব্যাবসা করে। একজন কেবল শাঁখারিদের দোকানের কারিগর।'

—'নাম জানেন?'

—'হ্যাঁ। দুলাল।'

—'বিনয়বাবু, একটা কাজ করুন। দয়া করে দুলালকে একবার এখানে ডেকে আনুন। তাকে বলবেন, নবীনবাবুর স্ত্রী দু-ডজন খুব ভালো শাঁখা কিনতে চান, তিনিই তাকে ডেকেছেন।'

—'যে আজ্ঞে।'

সরকারের প্রস্থান। নবীন সবিস্ময়ে বললে, 'তোমার এ কী অদ্ভুত খেয়াল, জয়ন্ত? দু-ডজন কী, আমার স্ত্রী একগাছাও শাঁখা কিনতে চান না।'

—'তোমার স্ত্রী আজ আলবত দু-ডজন শাঁখা কিনতে চান। তুমি জানো না।'

—'আমি জানি না, তুমি জানো?'

—'নিশ্চয়!'

—'জয়ন্ত, তুমি একটি পাগল।'

—'নবীন, তুমি একটি সুবৃহৎ হাঁদারাম।'

—'মানে?'

—'মানে এখনই বুঝতে পারবে।'

—'দেখা যাক। কিন্তু দু-ডজন শাঁখার দাম দিতে হবে তোমাকেই।'

ঘরের বাইরে পদশব্দ। সরকারবাবুর পিছনে একটি মূর্তির আবির্ভাব। বয়স হবে না উনিশ-বিশের বেশি। সঙ্কুচিত ভাবভঙ্গি, সন্দিগ্ধ দৃষ্টি। পরনে আধ-ময়লা গেঞ্জি ও লুঙ্গি। খালি পা।

জয়ন্ত শুধোলে, 'তোমার নাম দুলাল?'

আগন্তুক ভয়ে ভয়ে বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

জয়ন্ত লক্ষ করলে, ডান পায়ের পাতা এমন ভাবে বিকৃত যে, সোজা ভাবে মাটিতে পা ফেলে সে দাঁড়াতে পারে না। তার দুই পায়েরই নীচের দিকে লেগে রয়েছে সাদা সাদা কীসের গুঁড়ো!

জয়ন্ত বললে, 'দুলাল, আমার কাছে এসো।'

দুলাল প্রায় খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে এল।

ফস করে সেই রবারের জুতোর পাটি বার করে জয়ন্ত শান্ত স্বরে বললে, 'দুলাল, কাল রাতে তোমার একপাটি জুতো এই ঘরে ফেলে রেখে গিয়েছিলে। ফিরিয়ে নাও তোমার জুতো।'

প্রথমটা চমকে উঠে, তারপরে সবেগে মাথা নেড়ে দুলাল বলে উঠল, 'ও জুতো আমার নয়।'

—'এ জুতো তোমারই। পায়ে পরে দ্যাখো—তোমার দুমড়ানো পায়ের সঙ্গে ঠিক খাপ খেয়ে যাবে।'

দুলাল চুপ করে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার মুখ ধরা-পড়া চোরের মতো।

জয়ন্ত বল্লে, 'নবীন, এই একপাটি জুতোর মধ্যেই আছে চোরের স্বাক্ষর। জুতোর ভিতরে যে সাদা গুঁড়োগুলোকে তুমি চুনের গুঁড়ো বলে ভ্রম করেছিলে, আসলে তা হচ্ছে শাঁখের গুঁড়ো। আমি দেখেই বুঝতে পেরেছিলুম। শাঁখারিরা ঠিক দুই পায়ের উপরে শাঁখ রেখে যখন করাত চালায়, তখন তাদের দুই পায়ের উপরেই ছড়িয়ে পড়ে শঙ্খচূর্ণ। দুলালের পায়ের দিকে তাকিয়ে দ্যাখো—শাঁখের পাউডার মেখে ওর পদযুগল এখনও শ্বেতবর্ণ হয়ে রয়েছে। ওর দুই পদ জুতোর মধ্যে প্রবেশ করলে তার ভিতরেও লেগে থাকবে শাঁখের গুঁড়ো। বেডৌল জুতোর পাটি পরীক্ষা করে খুব সহজেই ধরে ফেলেছিলুম যে, এর মালিক হচ্ছে এমন কোনো শাঁখারি, যার দক্ষিণ পদতল বিকৃত। তবু যদি দুলাল এখনও অপরাধ স্বীকার না করে, তুমি এই দারোগাবাবুটির সাহায্য নিতে পারো। এসো মানিক, আমাদের এখন বিদায় নেবার সময় হয়েছে।'

পোড়ো-মন্দিরের আতঙ্ক

কলকাতা থেকে আমার কলেজের তিনজন সহপাঠী বন্ধু এসেছিল আমাদের গাঁয়ে বেড়াতে। তাঁদের নিয়েই আমি সেদিন বৈকালে গিয়েছিলাম গাঁ ছাড়িয়ে মাইল দেড়েক দূরে ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে। ওখানকার ময়ূরাক্ষীর দুই তীরের শোভা বড়োই নয়নমুগ্ধকর। ভেবেছিলাম, সন্ধ্যার কোল অবধি নদীর ধারে বসে গল্প-গুজব করে তারপর বাড়ি ফিরব। অন্ধকারে মাঠের মধ্যে আসতে পথে সাপ-খোপের সম্মুখীন হতে পারি, এই ভয়ে বাবার পাঁচ সেলের টর্চটা সঙ্গে এনেছিলাম।

গরমকাল। সাড়ে ছ-টাতেও তখন অনেক বেলা। প্রায় সাড়ে ছ-টাই হবে তখন। আমরা চারজনে কবিগুরুর একটা গান নিয়ে আলোচনা করছি। আলোচনায় আমরা এতই মশগুল ছিলাম যে, পশ্চিম দিক থেকে কালো মেঘ উঠে কখন যে প্রায় অর্ধেকটা আকাশ ঢেকে ফেলেছে খেয়ালই হয়নি। হঠাৎ ঝড় উঠতে খেয়াল হল। আমরা ধড়মড় করে উঠে পড়ে একরকম ছুটতে ছুটতেই বাড়ির পথে হাঁটা দিলাম। আমি জানি এই দেড় মাইল পথের মধ্যে কোনো ঘরবাড়ি নেই—অর্থাৎ বৃষ্টির হাত থেকে শরীর বাঁচাবার মতো কোনও আশ্রয় নেই।

বরাত মন্দ। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই দৈত্যের মতো কালো মেঘটা সারা আকাশ ছেয়ে ফেলল এবং মুষলধারে বৃষ্টি নামল। সেই সঙ্গে ঝড়ের সে কী বেগ!

প্রাণপণে ছুটতে লাগলাম আমরা চারজনে। ছুটতে-ছুটতেই আমার খেয়াল হয়ে গেল যে, আর একটু এগোলেই আমাদের ডান পাশে পড়বে একটা পোড়ো-কালীমন্দির। সেখানে গিয়ে উঠলে ঝড়-বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচা যেতে পারে। কিন্তু সন্ধ্যার পর ওই মন্দিরের ধারে কাছে কেউ ঘেঁষে না, আমারও মন চাইছিল না ওদিকে যাবার। গাঁয়ের অন্য সকলের মতো ওই মন্দিরের প্রতি আমার মনেও ভয় আছে। অবশ্য ভয়ের কোনও কারণ আজ পর্যন্ত কিছু ঘটেনি কারও ক্ষেত্রে—ভয়টা কেবল সংস্কারবশেই। তবু আমি যদি একা থাকতাম, তাহলে হয়তো একা থাকার জন্যেই ওই মন্দিরে যেতে ভয় পেতাম। কিন্তু আমরা রয়েছি চারজন, সঙ্গে পাঁচ সেলের টর্চ। অযথা ভয় পাবার কোনও কথাই নয়। তাই মনে সাহস পেয়ে আমি বন্ধুদের নিয়ে ভিজে গোবর হয়ে ওই পোড়ো-মন্দিরটার চাতালে গিয়ে উঠলাম।

বেশ বড়োসড়ো মন্দির। মন্দিরের দুই পাশে ও পিছনে আরও খানচারেক ঘর আছে। এই মন্দির ছিল একজন তান্ত্রিকের। ঘরগুলির মধ্যে একটাতে নাকি মায়ের ভোগ রান্না হত, অন্য ঘরগুলিতে চেলা-চামুণ্ডাদের নিয়ে তান্ত্রিক বাস করত।

মন্দির ও ঘরগুলির কিছু কিছু অংশ এখন ভেঙে পড়েছে। দেওয়ালে ছাদে গাছপালা গজিয়েছে, মন্দিরপ্রাঙ্গণ লতাগুল্মের ঝোপেঝাড়ে আবৃত। এমন মুষলধারে বৃষ্টি না নামলে আমি কখনওই এই পোড়ো-মন্দিরে আশ্রয় নিতাম না।

এখন মাত্র সন্ধ্যা-রাত। কিন্তু জায়গাটার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে, যেন এখন মাঝরাত।

বন্ধু শ্যামল বলল, আচ্ছা জায়গায় আমাদের নিয়ে এলি বটে, সাপ-খোপে কামড়াবে না তো?

আমি টর্চটা জ্বেলে চারিদিকে দেখে নিয়ে বললাম, দেখে তো সেইরকমই মনে হচ্ছে। কী করব ভাই, যা বৃষ্টি নামল, বাড়ি যে এখনও অনেক দূর। এই বৃষ্টিতে এতখানি রাস্তা ভিজলে সবাইকেই জ্বরে পড়তে হত।

আরেক বন্ধু রতন বলল, সেকথা সত্যি। কী মন্দির ছিল রে এটা? দেখে তো মনে হচ্ছে এককালে খুব জাঁকজমকের সঙ্গে পুজো-আচ্চা হত এখানে।

বললাম, হ্যাঁ, মারাত্মক রকমের জাঁকজমক সহকারেই এখানে কালীপ্রতিমার পুজো হত শুনেছি। সে জাঁকজমক এতই মারাত্মক ছিল যে, কোনো লোক পুজো দেখা তো দূরের কথা, কোনোদিন প্রতিমা দেখতেও এখানে আসত না।

একথা শুনে শ্যামল, রতন ও অজয় সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসু নেত্রে আমার দিকে তাকাল।

আমি বললাম, শোন তবে এই মন্দিরের ইতিহাস, যেটুকু আমি জানি। আমার ঠাকুরদার বয়স যখন ছিল চব্বিশ-পঁচিশ, সেই সময় এই মন্দিরে কালীসাধনা করত একজন তান্ত্রিক কাপালিক। শুনেছি, সেই কাপালিকের চেহারা এতই ভয়ংকর ছিল যে, কোনো সাধারণ মানুষ তার ধারে কাছে যেত না। সাত-আট জন চেলা ছিল তার, তাদের চেহারাও ছিল ভয়ঙ্কর। ওই যে বেদিটা দেখছিস, ওই বেদির ওপর থাকত কালীমূর্তি। তখন কেউই জানত না যে, ওই মূর্তিটা নকল কি আসল মূর্তি। অর্থাৎ নীচেকার একটা গোপন কক্ষে। মন্দিরের পিছন দিকে একখানা ঘর আছে। সেই ঘরের মেঝের মধ্যে দিয়ে নীচেকার ঘরে যাবার সিঁড়ি আছে। এই ব্যাপারটা আকস্মিকভাবে টের পেয়ে যায় আমাদেরই গাঁয়ের একদল ছেলে। দলে তারা ছ-জন ছিল। সেদিন তারা গিয়েছিল পাশের গাঁয়ে এক বউভাতের নিমন্ত্রণ খেতে। খেয়েদেয়ে যখন তারা ফিরছিল, রাত তখন এগারোটা।

আমরা আজ যে কারণে মন্দিরে এসে ঢুকলাম, সেদিন তারাও ঠিক একই কারণে এই মন্দিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। আজকের মতো সেদিন রাতেও এমন মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছিল। তারা এই মন্দির চাতালে উঠে দেখে, প্রতিমার দরজা বন্ধ। মানুষের কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। তারা ভাবল, কাপালিক ও তার চেলা-চামুণ্ডারা সবাই বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। এমন সময় তাদের কানে পৌঁছায় পুজোর ঘণ্টাধ্বনি। কিন্তু ঘণ্টার যে আওয়াজ তাদের কানে আসছিল, সে আওয়াজটা ছিল খুব চাপা ও ক্ষীণ। প্রথমটা তাদের মনে হয়েছিল, খানিকটা দূর থেকে বোধহয় আওয়াজটা আসছে, তাই এমন চাপা মনে হচ্ছে। তারপরই তাদের খেয়াল হল যে, এই মন্দিরের চারিপাশের প্রায় মাইলখানেক জায়গার মধ্যে কোনও বাড়িঘর, লোকবসতি নেই। তবে... তবে ওই ঘণ্টার শব্দ আসছে কোত্থেকে? পুজোর সময় পুরোহিত যে ঘণ্টা বাজায়, সেই ঘণ্টার শব্দ। তাহলে নিশ্চয় এই মন্দিরের মধ্যেই অন্য কোনো ঘরে পুজো হচ্ছে। এই কথা মনে হতেই ওই ছ-জন ছেলে উঠে দাঁড়াল। ওদের মধ্যে তিনজনের টর্চ ছিল। একজন বলল, চল না, ভেতরের দিকটা একবার চুপি চুপি ঘুরে দেখে আসি, কোথায় কী পুজো হচ্ছে।

যতগুলো ঘর ওই মন্দিরের ভেতরে ছিল, সব ঘরের দরজাই তারা বন্ধ দেখল। ছেলেরা প্রত্যেকটি দরজার গায়ে কান দিয়ে বুঝল, না, এসব ঘরের মধ্যে কোনো আওয়াজ নেই। তবে ঘণ্টার শব্দ আসছে কোত্থেকে? তারপর তারা মন্দিরের পিছন দিকে যেতেই তাদের মনে হল, যেন ঘণ্টার আওয়াজটা এখানে স্পষ্ট। টর্চের আলোয় দেখল, সেখানে একটা ঘর রয়েছে, এবং ঘরের দরজাটাও আধখোলা অবস্থায় রয়েছে।

ছেলেরা এবার আরও হুঁশিয়ার হল। ঘরটার মধ্যে কোনও লোকজন থাকতে পারে বলে তাদের মনে সন্দেহ হওয়ায় তারা অন্ধকারের মধ্যে গা মিশিয়ে নিশ্চুপে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল। কিন্তু ওই ঘরটাও জনশূন্য রয়েছে, এ ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হয়ে তারা সকলে ধীরে ধীরে ওই কক্ষে প্রবেশ করল। ভেতরে কী আছে এটাই তারা দেখতে চায়। কিন্তু ঘরটার মধ্যে ঢুকতেই ঘণ্টার শব্দ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। এবার তারা বুঝল, ওই ঘরের মধ্যেই ঘণ্টাধ্বনির রহস্য লুকিয়ে আছে। টর্চের আলোয় তারা ঘরের মেঝেতে একটা বিরাট চৌকো ভারী লোহার পাত দেখতে পেল। লোহার পাতটা দেখে তাদের মনে কেমন যেন সন্দেহ জাগল। খুব সন্তর্পণে পাতটার দিকে এগিয়ে একজন সেটা টেনে সারাবার চেষ্টা করল। কিন্তু সেটা এত ভারী একজনের পক্ষে টেনে

সরানো সম্ভব নয়। তখন তারা করল কী, চারজনে ধরে সেটাকে এমন সাবধানে টানতে লাগল যাতে কোনো রকম শব্দ না হয়। খানিকটা টানতেই একটা গর্তের মুখ তারা দেখতে পেল এবং সেই ঘণ্টার শব্দ একেবারে স্পষ্ট হয়ে উঠল। বুঝল, এই ঘরের নীচেকার কোনো চোরাকুঠুরিতে ঘণ্টা বাজছে, এবং সেই ঘরে যাবার এটাই হল গুপ্তদ্বার।

ছেলেরা রহস্যের গন্ধ পেল। এমন গুপ্তকক্ষে পূজা-আচ্চা করার কারণ কী? নিগূঢ় কারণ নিশ্চয় কিছু একটা আছে, এবং সে কারণ জানবার জন্য তাদের সকলকার ডানপিটে মন আনচান করে উঠল। তারা সেই লোহার পাতটাকে আরও খানিকটা সরিয়ে গুপ্তদ্বার সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে ফেলল। তাদের নজরে পড়ল, কয়েক ধাপ সিঁড়ি সোজা নীচের দিকে নেমে গিয়ে ডান দিকে বেঁকে গেছে। গুপ্তকক্ষে যে আলো জ্বলছে, তারই আলোয় আলোকিত হয়ে আছে সিঁড়ির বাঁকের মুখটা। ফলে সমস্ত সিঁড়িটাই মোটামুটিভাবে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

অতঃপর ছেলেরা মুহূর্তকালের জন্য একবার চুপি চুপি যুক্তি করে স্থির করে নিল যে, তারা নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে খানিকটা নীচে নেমে দেখে আসবে কী ধরনের পুজো ওখানে হচ্ছে, যে পুজোর জন্যে এত গোপনীয়তার প্রয়োজন!

সিঁড়ির সেই বাঁক অবধি নেমে ছেলেরা সন্তর্পণে ডান দিকে দৃষ্টিপাত করে যা দেখতে পেল, তাতে তারা ভয়ে বিস্ময়ে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল! তারা দেখল, দরজা-জানালাবিহীন মাঝারি আকারের একখানা ঘর, ঘরখানার একপাশে হাত তিনেক লম্বা এক কালীপ্রতিমার সামনে একজন ভয়ংকর-দর্শন তান্ত্রিক কাপালিক পূজায় মগ্ন। তার আশেপাশে কয়েকজন চেলা-চামুণ্ডা দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের মধ্যে দুজন একটি দশ-বারো বছরের বালককে ধরে আছে, আর-একজনের হাতে রয়েছে একটি তীক্ষ্ণধার খড়্গ। এ ছাড়া ঘরখানার একটি কোণে জড়ো করা ছিল কয়েকটি সুতীক্ষ্ণ বর্শা এবং আরও গোটা চারেক খড়্গ।

ছেলেরা বুঝল, এই মন্দিরের আসল পূজা এখানেই হয়, এবং নরবলি পর্যন্ত হয়ে থাকে।

ইতিমধ্যে কাপালিক পূজা শেষ করে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল এবং ঘাতকের দিকে চেয়ে ইশারায় বলির নির্দেশ দিল। ইশারা পেয়ে ঘাতক খাঁড়াটাকে শক্ত করে বাগিয়ে ধরল, আর সেই চেলা দুজন বালকটিকে নিয়ে এগিয়ে গেল প্রতিমার সামনে।

এর পরের অমানুষিক মর্মান্তিক দৃশ্যটি দেখবার জন্যে গাঁয়ের সেই ছেলেরা

আর সেখানে অপেক্ষা করেনি। কোনো সুস্থ মানুষের পক্ষেই সে দৃশ্য দাঁড়িয়ে দেখা সম্ভব নয়। ওই অসহায় বালকটিকে বাঁচাবার জন্য সেসময় ছেলেগুলোর মনে প্রচণ্ড একটা উত্তেজনা জেগে উঠেছিল বটে, কিন্তু তারা বুঝেছিল যে, বাধা দিতে গেলে ওই সশস্ত্র দুর্ধর্ষ, কাপালিকগণের হাতে তাদের মৃত্যুবরণ করতেই হবে। তাই তারা আবার চুপি চুপি উপরে উঠে এসে লোহার পাতটা আগেকার মতোই চাপা দিয়ে রেখে গাঁয়ে ফিরে গিয়েছিল। কিন্তু ওই হিংস্র নরঘাতক কাপালিকদের কথা তারা ভুলতে পারল না। ওই কাপালিকরা ইতিপূর্বে কত যে শিশুহত্যা, নরহত্যা করেছে, তার হয়তো ইয়ত্তা নেই। তবে ওইসব বলি ওরা ছেলে চুরি যাওয়ার অপবাদের জন্য আশপাশের গাঁ থেকে জোগাড় করত না। তা যদি করত, তাহলে আমাদের গাঁয়ের মধ্যে ভীষণ একটা হইচই পড়ে যেত। কিন্তু সেরকম কিছু শোনা যায়নি কোনোদিন। ওরা নিশ্চয় কোনো দূরদেশ থেকেই বলি জোগাড় করত।

যাই হোক, ভবিষ্যতে আর যাতে তারা কোনো মানুষ খুন করতে না পারে, ছেলেরা তার যথাযথ প্রতিকার করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে উঠল। নির্জনে অনেকক্ষণ ধরে যুক্তি করে তারা স্থির করল যে, ওই কাপালিক ও তার চেলাদের সকলকে তারা হত্যা করবে। এবং কীভাবে হত্যা করবে, তারও একটা সাংঘাতিক উপায় স্থির করে ফেলল।

দিন ছয়-সাত পরই একদিন রাত দশটা নাগাদ তারা আবার এই মন্দিরের নিকটে এসে পৌঁছাল। তাদের সঙ্গে ছিল বড়ো বড়ো টিনের দু-টিন পেট্রল। এসব ব্যাপার তখনও পর্যন্ত তারা গাঁয়ের কোনো লোককেই জানায়নি। জানিয়েছিল কাপালিকদের হত্যা করার পরে।

মন্দিরের নিকটবর্তী বড়ো একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত তারা মন্দিরটার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেও কোনো জন-মনিষ্যির সাড়াশব্দ পেল না। তখন তারা নিঃশব্দে মন্দিরের চাতালে গিয়ে উঠল। তারপর পিছন দিকের সেই ঘরখানার নিকট হতেই তাদের কানে ঘণ্টার চাপা আওয়াজ ভেসে এল। এতক্ষণে তারা নিশ্চিন্ত হতে পারল। যাক, পুজো হচ্ছে এবং কাপালিকেরা তাহলে সেই পুজোর ঘরেই আছে।

অতঃপর তারা এসে হাজির হল সেই গুপ্তদ্বারের নিকট। তাদের এর পরের কার্যকলাপ অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে শেষ হল। একজন একটু তফাতে সরে গিয়ে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে একটা কাগজ ধরাল, আর-একদিকে অন্য ছেলেরা লোহার পাতটা সরিয়ে ফেলেই সেই গুপ্ত-গহ্বরের মধ্যে দু-টিন পেট্রল সম্পূর্ণ

ঢেলে দিল। তারপর সেই জ্বলন্ত কাগজের টুকরোটা ভেতরে ফেলে দিতেই দপ করে গহ্বরের মধ্যে করাল অগ্নি জ্বলে উঠল। এবং সঙ্গে সঙ্গে গুপ্তকক্ষের দরজাটাও তারা আবার বন্ধ করে দিল সেই লোহার পাতটা দিয়ে।

ততক্ষণে গুপ্তকক্ষের মধ্যে কাপালিকদের বীভৎস অন্তিম চিৎকার শুরু হয়ে গেছে! কিন্তু সে চিৎকার অতি অল্পকালের মধ্যেই থেমে গেল...প্রচণ্ড নিঃস্তব্ধতা নেমে এল তারপর।

শত্রু ধ্বংস করে ছেলের দল বীরবিক্রমে গাঁয়ে ফিরে গিয়ে সকলের কাছে প্রকাশ করেছিল তাদের দুঃসাহসিক কাণ্ডকারখানার কথা। শুনে গাঁয়ের লোক স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই মন্দিরের ধারেকাছে আগেও যেমন কেউ আসত না, কাপালিকদের মৃত্যুর পরও কেউ কোনো দিন শখ করে এদিকে আসেনি। সেদিন সেই ছেলেরা যেমন এসেছিল, আমরা আজ যেমন এলাম, তেমনি নিতান্ত দায়ে পড়ে হয়তো কেউ কদাচিৎ এদিকে এসে থাকতে পারে।

গল্প শেষ করে আমি চুপ করতেই অজয় বলল, এমন কাণ্ড!

অপর দুই বন্ধু নীরব।

হঠাৎ ভয়ে আমার সারা দেহ শিউরে উঠল। সর্বশরীর কুঁকড়ে গেল আমার। হ্যাঁ, বেশ স্পষ্টই শুনতে পাচ্ছি ঘণ্টার শব্দ! যদিও খুব চাপা তথাপি সাংঘাতিক রকমের স্পষ্ট যেন! সেই বহুকাল আগেও যেমন ছিল, এখনও তেমনি এই মন্দিরের চারিপাশে প্রায় মাইলখানেক জায়গার মধ্যে কোনো ঘরবাড়ি নেই। তবে? তবে কোত্থেকে আসছে এই ঘণ্টার শব্দ? সেই গোপন কক্ষে আবার কি কোনও নতুন কাপালিক আশ্রয় নিয়েছে? উঁহু, মন্দিরের যা পোড়ো অবস্থা, তাতে নিঃসন্দেহে বলা যায় এখানে কোনো লোক বাস করে না। মন্দিরের সর্বত্র ধুলো-বালি, শুকনো পাতা, কাঠি-কুটিতে ভরতি। দেওয়ালের ফাটলে ফাটলে গাছপালা জন্মেছে। লোক বাস করলে মন্দির চাতালে এমন এক ইঞ্চি পুরু ধুলো-বালিও জমে থাকত না—শুকনো কাঠি-কুটিও পড়ে থাকত না। তবে? এই ঘণ্টার আওয়াজ আসছে কোথা থেকে? এই মন্দিরের মধ্যে থেকেই আসছে—তা ছাড়া আবার কোথা থেকে আসবে?

শ্যামল, অজয় আর রতন এদের কানেও পৌঁছেছে ঘণ্টার শব্দ।

অজয় দুই ভ্রূ কুঁচকে সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলল, ঘণ্টার আওয়াজ আসছে না?

আমি বললাম, হুঁ!

সেই অন্ধকারের মধ্যেও দেখতে পেলাম, অপর বন্ধু জ্বলজ্বলে চোখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

অজয় হচ্ছে পয়লা নম্বরের ডানপিটে ছেলে—অত্যন্ত সাহসী। সে আমাকে শুধাল, এ ঘণ্টার আওয়াজ কোত্থেকে আসছে বলে মনে হয় তোর? আগে তো কাছাকাছি কোনো ঘরবাড়ি ছিল না শুনলাম, এখন?

—না, এখনও তেমনি—মাইলখানেকের মধ্যে বাড়িঘর কিছু নেই।—বললাম।

—তাহলে? ক্ষণকাল ভাবল অজয়। তারপর পুনরায় বলল, তাহলে কি আবার কেউ বা কারা সেই ঘরে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করে পুজো করছে? অবশ্য দেখেশুনে তো মনে হচ্ছে না, বিশ বছরের মধ্যেও এখানে কোনও লোক বাস করছে। যাই হোক, ব্যাপারটা না দেখে ছাড়ছি না। আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে, এই মন্দিরের মধ্যে থেকেই আওয়াজটা আসছে। চল তো, সেই ঘরটার মধ্যে নিয়ে চল আমাকে, যে ঘরটায় বলছিলি লোহার পাতে ঢাকা গুপ্তপথ আছে।

বললাম, সে ঘর তো আমি জানিনে—তবে শুনেছি পিছন দিকে—দেখি চল।

আমার সেদিকে যাবার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু পাছে শহরের বন্ধুদের কাছে আমি ভিতু কাপুরুষ প্রতিপন্ন হই, সেই ভয়েতেই আমাকে ওদের নিয়ে যেতে হল। মন্দিরের পিছন দিকে পৌঁছাতেই ঘণ্টার আওয়াজ খানিকটা স্পষ্ট হল।

ভয়ে থরথরিয়ে কেঁপে উঠলাম আমি। কম্পিত গলায় বললাম, হ্যাঁ, সেই ঘরেতেই ঘণ্টা বাজছে, কোনও ভুল নেই। আবার কারা এল?

আমি ভীত হয়ে পড়েছি, অজয় বোধহয় তা টের পেয়ে বলল, কী রে বিপিন, তুই কি ভয় পাচ্ছিস?

—না-না-না, ভয় পাব কেন? তবে...তবে...ভাবছি আবার কোনও নরবলি-টরবলি হচ্ছে না তো?

অজয় বলল, দেখা যাক না কী হচ্ছে?

আমি বুঝতে পারলাম, রতন বা শ্যামলেরও এসব ব্যাপারে উৎসাহের অভাব রয়েছে। ওরা দুজনও কেমন যেন মিইয়ে রয়েছে। আমার মতোই অবস্থা আর কী! ভিতু কাপুরুষ প্রতিপন্ন হতে চায় না বলেই নিরুত্তরে এগিয়ে চলেছে।

অজয় আমার কাছ থেকে আগেই টর্চটা নিয়েছিল। টর্চের আলোয় দুই পাশ দেখতে দেখতে সে এগিয়ে চলেছিল। যে ক-টা ঘর দেখলাম, কোনো ঘরেরই দরজা-জানালা নেই। সব উই-এ নষ্ট করেছে আর ভেঙেচুরে পড়েছে। সর্বত্র ধুলো-বালি, নোংরা ইত্যাদিতে ভরা। এখানে কোনো লোকের যাওয়া-আসা থাকলে এই পুরু ধুলোর ওপর পায়ের দাগ নিশ্চয় থাকত। কোনো পদচিহ্ন নেই—এমনকি কোনও জন্তু জানোয়ারের পর্যন্ত না। শুধু আমরাই ক-জন সুস্পষ্ট পদচিহ্ন ফেলে এগিয়ে চলেছি।

—অসম্ভব, এখানে কোনও মানুষ থাকতে পারে না! কথাটা আচমকা বলল অজয়।

—তবে?—আমি আর শ্যামল দুজনে একই সঙ্গে প্রশ্ন করে বসলাম।

অজয় বলল,—'তবে'টা যে কী, সেটাই তো জানতে যাচ্ছি।

আমরা সেই ঘরটার মধ্যে এসে হাজির হলাম। মুখে চোখে মাকড়সার জালের স্পর্শ পাওয়া গেল। এ ঘরে লোকের যাওয়া আসা থাকলে কি এমন মাকড়সার জাল ছড়িয়ে থাকত?

এবার উজ্জ্বল টর্চের আলোয় মেঝের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম, একটা বিরাট মরচে ধরা লোহার পাত পড়ে রয়েছে। ঘরের মেঝে ও লোহার পাতটার ওপর আধইঞ্চি পুরু ধুলোর আস্তরণ জমে রয়েছে। এখানে ঘণ্টার শব্দ আরও স্পষ্ট। একটানা ঘণ্টা বেজে চলেছে—মনে হচ্ছে যেন আরতি হচ্ছে।

আমরা প্রত্যেকেই উপলব্ধি করতে পারলাম যে, এই ঘরের নীচে থেকেই ঘণ্টার আওয়াজ আসছে। যেখানে লোকজনের কোনো অস্তিত্ব নেই, সেখানে ঘণ্টা বাজে কী করে? এ কী অলৌকিক কাণ্ড! আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল! ভীষণ একটা বিপদের ইঙ্গিত পাচ্ছি যেন।

—আশ্চর্য! অদ্ভুত!—অজয় নির্নিমেষ দৃষ্টিতে লোহার পাতটার দিকে তাকাতে তাকাতে কথাটা বলল।

শ্যামল বলল, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, বহুকাল এ ঘরে কোনও মানুষের পদার্পণ হয়নি, অথচ নীচেকার ঘরে ঘণ্টা বাজছে। ঘণ্টাটা আপনা-আপনি বাজছে না নিশ্চয়ই, মানুষেই বাজাচ্ছে তো! তবে কি সে মানুষ হাওয়ায় মিশে নীচেকার ঘরে গেছে—যার জন্য তার পায়ের ছাপ পড়েনি!

অজয় বলল, সত্যিই ভাববার কথা! এ রহস্যের কারণ জানতেই হবে।

এবার আমরা সকলে মিলে লোহাটা টেনে সরাতেই গুপ্তপথ নজরে পড়ল। আর সেই সঙ্গে ঘণ্টার আওয়াজটাও একেবারে কানের কাছে এগিয়ে এল।

কিন্তু কী অন্ধকার গর্তটা! সিঁড়ির একটা ধাপও নজরে পড়ছে না। নীচেকার ঘরে নিশ্চয় কোনও আলো জ্বলছে না। ছোটো একটা প্রদীপ জ্বললেও তার আলোর রেখা নিশ্চয় আমাদের নজরে পড়ত। এবং সিঁড়ির নীচেকার দিকটাও অন্তত আবছাভাবে আলোকিত হয়ে থাকত। তবে কি পুরোহিত অন্ধকারে বসেই পুজো করছে? এ কী অস্বাভাবিক ব্যাপার!

অজয় চুপি চুপি বলল, আমার পিছু পিছু আয় তোরা। খুব সাবধানে নামবি; টর্চ জ্বালব না। কোনো রকম শব্দ-টব্দ হয় না যেন!

দু-পাশের দেওয়াল ধরে ধরে নিঃশব্দে সিঁড়ির বাঁক পর্যন্ত নেমে দাঁড়ালাম। সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টার আওয়াজ থেমে গেল। চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না আমরা। অস্বাভাবিক অন্ধকারে আমরা চারজনে যেন অন্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি! এত নিরেট অন্ধকার জীবনে কোনো দিন দেখিনি।

আমরা সকলে গায়ে গা ঠেকিয়ে বেশ কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থেকেও কোনও মানুষ-জনের তো দূরের কথা, একটা আরশোলার অস্তিত্ব পর্যন্ত টের পেলাম না।

হঠাৎ অজয়ের হাতের পাঁচ সেলের টর্চটা জ্বলে উঠল। টর্চটায় ছিল নতুন ব্যাটারি। উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চারিদিক। দেখতে পেলাম, সেই গুপ্তকক্ষের মেঝের ওপর কতকগুলো নরকঙ্কাল পড়ে রয়েছে। প্রতিমা যেখানে ছিল, সেখানে পোড়া-প্রতিমারও কিছু অংশ খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঘরের একটা কোণে সেই বর্শা আর খাঁড়াগুলোও রয়েছে, আর একটা খাঁড়া পড়ে রয়েছে প্রতিমার কাছাকাছি জায়গায়। পূজার ঘণ্টা এবং কয়েকটা থালা কোশাকুশী ইত্যাদি প্রতিমার সামনে পড়ে রয়েছে। এ সমস্ত জিনিস আগুনে পুড়ে এবং তার ওপর ধুলোর আবরণ জমে এমন চেহারা হয়েছে যে, বোঝবার উপায় নেই কোনটা লোহার তৈরি, কোনটা তামার বা কোনটা পিতলের জিনিস।

বেশ কিছুক্ষণ ঘরটা দেখে নিয়ে অজয় গলায় বেশ জোর দিয়ে বলে উঠল, অসম্ভব! এ ঘরে কখনোই ঘণ্টা বাজছিল না। ঘণ্টার শব্দ অন্য কোথাও থেকে আসছিল। আমাদের সকলকারই শোনার ভুল হয়েছে। আর এখানে নয়—ওপরে যাওয়া যাক।

আমি বেশ স্পষ্টই বুঝতে পারলাম, কথা বলার সময় অজয়ের গলা কাঁপছিল। আর আমার নিজের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। কী যেন এক নিদারুণ ভয়ে আমি ঘেমে উঠলাম।

যাই হোক, আমরা ওপরে উঠতে শুরু করলাম। সবার আগে আছি আমি, আর সবার নীচে টর্চ হাতে অজয়।

অকস্মাৎ অজয়ের আর্ত চিৎকারে আমরা ভীষণভাবে চমকে উঠলাম। আঁ আঁ আঁ করে চিৎকার করতে করতে অজয় বসে পড়ল সিঁড়ির ওপর। তার হাত থেকে টর্চটা খসে পড়েই নিবে গেল। অজয়ের চিৎকার শুনলাম ওরে তোরা আমাকে বাঁচা—বাঁচা—

তারপরই চুপ।

আমরা হুড়মুড় করে নেমে গেলাম অজয়ের কাছে। টর্চটা কোথায় পড়েছে কে জানে, আমরা তো সেই অন্ধকারের মধ্যেই অজয়কে ধরাধরি করে কোনও রকমে নিয়ে এলাম ওপরে। বুঝলাম, অজয়ের জ্ঞান নেই।

তারপর কীভাবে অত কষ্ট করে যে অচৈতন্য অজয়কে নিয়ে সে রাতে বাড়ি পৌঁছেছিলাম, সে কথা এখানে না বললেও চলবে।

ডাক্তারকে খবর দেওয়া হয়েছিল। তিনি দেখে-শুনে ওষুধ দিয়ে বলেছিলেন, মনে হচ্ছে ভয়ংকর কিছু একটা দেখে ভয়ে জ্ঞান হারিয়েছে।

ডাক্তারের কথা সত্য প্রমাণিত হল অজয়ের জ্ঞান ফেরার পর তার মুখ থেকে সব কথা শুনে। জ্ঞান অবশ্য ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই ফিরেছিল—কিন্তু সে মোহাচ্ছন্নের মতো ছিল পরদিন বেলা প্রায় আটটা অবধি। বেলা দশটা নাগাদ তাকে বেশ খানিকটা সুস্থ মনে হতে আমরা গত রাতের ঘটনাটার কথা তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম। উত্তরে সে বলেছিল যে, তার মনে হয়েছিল একজন ভীষণ-দর্শন কাপালিক এক হাতে তাকে চেপে ধরে অন্য হাতে ধারালো খাঁড়া তুলে তার গলায় একটা কোপ বসিয়ে দিয়েছিল। তাই অমনভাবে সে চিৎকার করে উঠেছিল।

তার মুখে একথা শুনে তখুনি গাঁয়ের প্রায় বিশ-পঁচিশজন যুবক সেই পোড়ো-মন্দিরের উদ্দেশে রওনা হয়ে পড়ল। শ্যামল, রতন আর আমি আগে আগে চললাম। সকলের মনেই সেই ঘরটা দেখার তীব্র আগ্রহ। দিনের বেলা বেশ ভালোভাবেই দেখাশোনা যাবে। এতকাল কারও মনে কোনো আগ্রহ জাগেনি—আজ এত বছর এমন একটা অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে যাওয়ায় গাঁয়ের আজকালকার তরুণ যুবকেরা কৌতূহল দমন করতে পারল না।

দিনের বেলা হলেও সেই পাতালকক্ষ অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকবে অনুমান করে নিয়ে আমি গোটা চার-পাঁচ টর্চ নিয়ে যাবার পরামর্শ দিয়েছিলাম। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল প্রায় জনা দশেক টর্চ নিয়ে এসেছে।

গুপ্তদ্বারের সামনে এসে দেখা গেল, সত্যিই ভেতরটা বেশ অন্ধকার। যাই হোক, আমরা টর্চগুলো জ্বেলে একে একে নামতে লাগলাম নীচে।

সিঁড়ির শেষ প্রান্তে নেমে আমার টর্চটা পেয়ে গেলাম। কিন্তু একী! এখানে একটা নরকঙ্কাল এল কী করে? দেখেই শিউরে উঠলাম। বেশ মনে আছে, এখানে সিঁড়ির গোড়ায় তো কোনও কঙ্কাল ছিল না। কঙ্কালগুলো তো সবই দেখেছিলাম ঘরের মেঝের ওপর এদিকে ওদিকে পড়ে ছিল। আরে, পায়ের কাছে বিরাট একখানা খাঁড়া পড়ে রয়েছে দেখছি। কঙ্কাল, খাঁড়া—না কক্ষনো না,

এসব মোটেই এখানে ছিল না। ঘরের মেঝের দিকে তাকিয়ে দেখি, প্রতিমার কাছে যে খাঁড়াটা পড়ে ছিল, সেটা তো সেখানে নেই।

সবগুলো টর্চের আলোয় ঘরখানা প্রায় সাদা হয়ে গেছে। অন্য সকলে অবাক চোখে ঘরের মধ্যে যা যা রয়েছে সেই সব লক্ষ করছে। কিন্তু আমার নজরে যা পড়ছে তা আশ্চর্য—অতি আশ্চর্য, একেবারে অলৌকিক ব্যাপার! প্রতিমার কাছে যে খাঁড়াটা পড়ে ছিল, সেখানে খাঁড়াটা নেই বটে, কিন্তু সেই জায়গায় খাঁড়ার ছাপটা জ্বলজ্বল করে যেন জ্বলছে! বহুকাল ধরে ঘরের মেঝে ও জিনিসপত্রের ওপর বেশ পুরু একটা ধুলোর আস্তরণ জমেছিল। কাজেই সেখান থেকে খাঁড়াটা উঠে আসার জন্যই অমন সুস্পষ্ট ছাপটা দেখা যাচ্ছে। আর ওখানকার ওই খাঁড়াটাই যে এখানে এসে পড়েছে, এ বিষয়ে আমার মনে কোনো রকম সন্দেহ রইল না। শুধু খাঁড়াটাই নয়, ওই একই রহস্যজনক উপায়ে কঙ্কালটাও যে ঘরের মেঝে থেকে উঠে এসেছে এখানে, সে বিষয়েও আমার মনে স্থির বিশ্বাস জন্মাল। কিন্তু এই অলৌকিক কাণ্ডকারখানার মূলে কোন অলৌকিক রহস্য যে অন্তর্নিহিত রয়েছে, তার মীমাংসায় পৌঁছানোর মতো বুদ্ধিবৃত্তি আমার নেই।

অত লোকজনের মধ্যে থেকেও কী যেন এক দারুণ ভয়ে আমার সারা দেহ শক্ত কাঠ হয়ে গেল!

গুপ্তধন চাই

হাতে ছাতা থাকতে যদি বৃষ্টিতে ভেজে, তাকে তোমরা কী বলে ডাকবে? গাধা?

সামনে খাবার থাকতে যদি না খেয়ে মরে, তাকেই বা তোমরা কী সম্বোধন করবে? পাগল?

আচ্ছা, আগে আমার বাল্য জীবনের একটা ঘটনা শোনো, তারপর অন্যান্য দৃষ্টান্ত।

আমাদের সাবেক বাড়ি ছিল কলকাতার পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিটে। তারই একতলার একখানা পরিত্যক্ত ঘর ভাড়া নিয়ে বাস করত একটি বুড়ো হিন্দুস্থানি, নাম তার বদরি। যখনকার কথা বলছি আমার বয়স তখন আট-নয় বৎসরের বেশি হবে না।

বদরির ঠিক বয়স ছিল কত জানি না। তবে সত্তরের কম নয়। মাথায় ধবধবে সাদা চুল তৈলাভাবে রুক্ষ ও এলোমেলো। ঝাপসা-দেখতে চোখ দুটো একেবারে কোটরাগত, অতিশয় শীর্ণ, হাড়-বের করা দেহখানা কুমড়োর ফালির মতো বেঁকে পড়েছে। সে দুর্বল পায়ে চলা-ফেরা করে ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে।

ময়লা কপনি ছাড়া তাকে আর কিছু পরতে দেখিনি এবং ছাতু ও চানা ছাড়া তাকে আর কিছু খেতেও দেখিনি। তার ঘরের আসবাব বলতে বোঝাত একটা পিতলের লোটা, গোটা কয়েক পুরানো ও মলিন মেটে হাঁড়ি এবং একটা ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুটুলি ও একখানা ছেঁড়া কাঁথা।

বদরির একমাত্র পেশা ছিল ভিক্ষা। রোজ সকালে ছাতু বা চানা খেয়ে সে ভিক্ষে করতে বেরিয়ে যেত এবং ফিরে আসত আবার সন্ধ্যার সময়ে। অন্ধকার হলেও ঘরে সে আলো জ্বালত না। আমি ভাবতুম, পয়সার অভাবে তেল কিনতে পারে না বলেই তার ঘরে বোধহয় আলো জ্বলে না।

বদরি বুড়োকে আমার খুব ভালো লাগত এবং সে-ও ভালোবাসত আমাকে। প্রায়ই তার ঘরে গিয়ে আমি দরজার চৌকাঠের উপরে উবু হয়ে বসতুম, আর সে-ও আমাকে শোনাত তার দেশের নানা কাহিনি। হিন্দুস্থানি হলেও সে বেশ ভালো বাংলা বলতে পারত।

যদি জিজ্ঞাসা করতুম, 'বদরি তুমি দেশে যাও না কেন?'

সে বলত, 'দেশে আমার কেউ নেই খোকাবাবু!'

মাঝে মাঝে সে আমাকে আদর করে ফলমূল খেতে দিত।

শুধোতুম, 'এ-সব কোথায় পেলে?'

—'ভিক্ষে করে পেয়েছি।'

—'তুমি খেয়েছ তো?'

—'না, ও-সব আমার সহ্য হয় না।'

মাঝে মাঝে বলতুম, 'বদরি, রোজ রোজ ছাতু আর চানা খেতে কি তোমার ভালো লাগে?'

—'আমি যে ভিখিরি। ভালো না লাগলে আমার চলবে কেন খোকাবাবু?'

—'ভাত আর তরকারি খাবে বদরি? মায়ের কাছ থেকে নিয়ে আসব?'

বদরি ঘাড় নেড়ে হাসতে হাসতে বলত, 'না বাবু, ভাত-তরকারি খেলে আমার অসুখ হবে!'

হঠাৎ একদিন দেখা গেল বদরির ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। তার পরদিন ও তার পরদিনও কেটে গেল, বদরি দরজা আর খোলে না। তখন থানায় খবর দেওয়া হল। পুলিশ এসে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে আবিষ্কার করলে বদরির মৃতদেহ। কিন্তু কেবল মৃতদেহই নয়, পুলিশ আবিষ্কার করলে অভাবিত আরও কিছু! বদরির ছেঁড়া কাঁথার তলা থেকে পাওয়া গেল কয়েক হাজার টাকা। কত হাজার টাকা মনে নেই, তবে মা-বাবার মুখে শুনেছিলাম, সেই টাকা সুদে খাটালে বদরি পায়ের উপরে পা দিয়ে বসে জীবন কাটাতে পারত সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যেই!

আমার জানা ঘটনার কথা বললুম। কিন্তু খুঁজলে বদরির জুড়ি পাওয়া যাবে পৃথিবীর সকল দেশেই। এক আমেরিকাতেই ওরকম অনেক ঘটনা ঘটেছে। আমরা এখানে মাত্র তিনটি ঘটনার উল্লেখ করতে পারি।

* * *

আমেরিকার আটলান্টিক সিটি নগরে একটি ঘরভাড়া নিয়ে একটি স্ত্রীলোক বাস করত। তার নাম আনা হ্যানে, বয়স বাহান্ন বৎসর। প্রতিবেশীরা কখনও তাকে পোশাক বদলাতে দেখেনি, পরত সে একটিমাত্র পোশাক এবং তার একমাত্র খোরাক ছিল খুব শক্ত 'ক্র্যাকার' বিস্কুট। পয়সার অভাবে সে অন্য কিছু খেতে পারে না ভেবে পড়ার একটি দয়ালু স্ত্রীলোক একদিন তাকে ভালো ভালো খাবারের ডালি উপহার দিতে গেল। কিন্তু হ্যানে সে খাবার স্পর্শও করলে না। উলটে প্রতিবেশীর মুখের উপরে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। পরদিন পাওয়া গেল তার মৃতদেহ। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, হ্যানের মৃত্যুর কারণ হচ্ছে অনাহার। কিন্তু হ্যানের ঘরে একটি রন্ধন-পাত্রের ভিতরে পাওয়া গেল ৭৭,৪০০ ডলার (এক ডলারের দাম প্রায় পাঁচ টাকা)।

লুইস স্টুবারের বয়স অষ্টআশি। তিনি ওসো শহরের নিকটে একা বাস করতেন। কারুর সঙ্গে দেখা করতেন না। খাদ্যগ্রহণ করতেন যৎসামান্যই। তাঁর সময় যে কী করে কাটত ভগবান ছাড়া কেউ তা বলতে পারবেন না, কারণ তাঁর কোনো রকম শখের কথাই শোনা যায়নি। গত ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে একাকী শয্যাশায়ী হয়ে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর বাড়ির একটি গুপ্তস্থান থেকে পাওয়া যায় নগদ ৮২,০০০ ডলার এবং ব্যাঙ্কের খাতায় ৫৩,০০০ ডলার। নগদ টাকাগুলো গুনতে চারজন লোকের সময় লেগেছিল সকাল নটা থেকে সন্ধ্যা

ছয়টা পর্যন্ত। পরে এ গুপ্তধনের অংশীদার হন লুইস সাহেবের দূর সম্পর্কীয় সাতজন আত্মীয়।

হোজেকেন শহরে একখানা তিনতলা বাড়ির মালিক ছিলেন ফোস্টার সি. হেনিয়ন। বয়স্ তাঁর আশির কম নয়। লোকে তাঁকে 'বুড়ো হেনিয়ন' বলে ডাকত। তিনি কিন্তু কারুর সঙ্গে মিশতেন না। বরং তিনি প্রতিবেশীদের রীতিমতো পরিহার করেই চলতেন। পঁয়ষট্টি বৎসর-অর্থাৎ বালক বয়স থেকে ওই বাড়িতে বাস করছেন, কিন্তু পাড়ার কোনো লোকের সঙ্গে তিনি বাক্যালাপ পর্যন্ত করেননি। বাড়ির বাইরেও তিনি পা বাড়াতেন কালে-ভদ্রে, কদাচ।

এই অদ্ভুত রহস্যময় লোকটিকে নিয়ে পাড়ায় যে রীতিমতো জল্পনা-কল্পনা চলত সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। কিন্তু ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে একদিন ফুরিয়ে গেল সমস্ত জল্পনা-কল্পনা। হেনিয়ন বহুলক্ষপতি। তাঁকে কোটিপতি বলাও চলে! তাঁর সম্পত্তির মূল্য হল সাতাশ লক্ষ বাহান্ন হাজার চুয়াল্লিশ ডলার! পাছে কোনো লোভী জুয়াচোরের পাল্লায় পড়েন সেই ভয়ে হেনিয়ন মনুষ্যসমাজের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করেছিলেন। তাঁর এক ভাইপো ছিল, তার কাছেও তিনি ছিলেন অপরিচিতের মতো।

কিন্তু এত কষ্ট স্বীকার ও সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মতো জীবনযাপন করেও হেনিয়ন তাঁর ভাইপোকে ফাঁকি দিতে পারলেন না। সেই হল তাঁর বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

কৃপণদের বুদ্ধির আসল গলদ কোথায় জানি না। নিজে উপবাসী হয়ে পরের জন্যে অর্থ সঞ্চয় করার মধ্যে আমি কোনো অর্থই খুঁজে পাই না। অবশ্য এমন একাধিক ব্যক্তির নাম শুনেছি, যাঁরা সকল রকম আত্মসুখ বর্জন করে জীবনকালে কৃপণ বলে কুবিখ্যাত হয়ে মৃত্যুকালে সমস্ত সম্পত্তি দান করে গিয়েছেন, দেশ ও জাতির মঙ্গলের জন্য। তাঁরা হচ্ছেন মহাত্মা, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র।

বাড়ি

শ্রীমতী বলতে লাগলেন পাঁচ বৎসর আগে আমি কঠিন পীড়ায় শয্যাশায়ী হয়েছিলুম। সেই সময়ে প্রতি রাত্রেই দেখতুম একই স্বপ্ন।

আমি পল্লিপথ দিয়ে চলেছি। সামনে একখানা সাদা রঙের একতলা সুদীর্ঘ বাড়ি—কাগজিলেবুগাছ দিয়ে ঘেরা! বাড়ির বাঁ দিকে ময়দান, তার উপরে ঝাউগাছের সারি।

স্বপ্নের এই বাড়ির দিকে আকৃষ্ট হতুম, এবং পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতুম তার দিকে। প্রবেশপথে শ্বেতবর্ণ ফটক। তারপর চমৎকার একটি আঁকাবাঁকা পথ—দুই ধারেই তার পায়ের তলায় ছায়া ফেলে সারি সারি গাছের পর গাছ। সেই ছায়ায় হালকা হাওয়ায় নানা রঙের হিন্দোল দুলিয়ে দিয়েছে সব মরশুমি ফুলের চারা। আমি ফুল তুলি, কিন্তু তারা বেরঙা হয়ে যায় সঙ্গে-সঙ্গেই। পথ শেষ হয়। আমি বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াই।

বাড়ির সুমুখে একটা বড়ো ঘাস জমি। তারই মাঝখানে যেন কাঁচা-সবুজের ফ্রেমে বাঁধানো ফুলশয্যা—সেখানে ফুটে আছে বেগুনি, লাল ও সাদা রঙের ফুল। বাড়ির সদর দরজার উপরে কারুকার্য। কয়েক ধাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠে দরজার কাছে পৌঁছানো যায়।

এই আমার স্বপ্ন। মাসের পর মাস ধরে রোজ রাত্রে দেখি অবিকল এই একই স্বপ্ন! শেষটা আমার মনে দৃঢ় ধারণা হল, শৈশবে নিশ্চয়ই আমি স্বচক্ষে এই বাড়িখানা দর্শন করেছি। কিন্তু সে যে কোথায়, কিছুতেই তা মনে করতে পারি না। তবু বাড়িখানা আমায় যেন পেয়ে বসল। পণ করলুম, বাড়িখানা খুঁজে বার করতেই হবে।

আরোগ্য লাভ করবার পর একদিন নিজের মোটর নিয়ে শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম। মনের মধ্যে দুর্দান্ত ইচ্ছা, বাস্তব জগতে আবিষ্কার করতেই হবে আমার স্বপ্নে-দেখা বাড়িখানাকে!

আজ এ গ্রামে, কাল ও গ্রামে। এমনি ঘুরে ঘুরে বেড়াই কত গ্রামে গ্রামে। সবিস্তারে বলবার দরকার নেই আমার ভ্রমণকাহিনি। কেবল এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, ব্যর্থ হল আমার প্রথম বারের অন্বেষণ! হতাশ হয়ে আবার

শহরে ফিরে এলুম এবং আবার রাতের পর রাত দেখতে লাগলুম সেই সাদা বাড়ির স্বপ্ন!

কিছুদিন পরে আবার পল্লিভ্রমণের জন্যে যাত্রা করতে হল। এ গ্রাম, ও গ্রাম, সে গ্রাম। আজ এক পথে, কাল অন্য পথে।

আচম্বিতে একদিন আমার বাড়িটা যেন দুলে উঠল! মনে হল যেন আমি অতি-পরিচিত কোনো স্থানে এসে পড়েছি। যদিও জীবনে আর কোনোদিনই এ অঞ্চলে আসি না, তবু এখানকার সবই যেন আমার চেনা চেনা! ওই ঝাউগাছের সার, ওই কাগজিলেবুর কুঞ্জ!

বাড়িখানা এখনও দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু আমি যে আমার স্বপ্নে-দেখা বাড়ির কাছে এসে পড়েছি, সে-বিষয়ে আর কোনোই সন্দেহ নেই। আমি জানি, আর অল্পদূর অগ্রসর হলেই দেখা যাবে, বড়ো রাস্তায় এসে পড়েছে একটি ছোটো পথ। সেই ছোটো পথটি দিয়ে করেছি কত আনাগোনা!

নামলুম ছোটো পথে। হলুম অগ্রসর। এই তো সেই সাদা ফটক! এই তো সেই গাছের ছায়ায় ঘুমন্ত আঁকাবাঁকা পথটি—দুই পাশে তার মরশুমি ফুলের চারার রঙিন পাড়! ওই যে সেই কাঁচা সবুজ ঘাস-জমি, আর আমার স্বপ্নে-দেখা সাদা বাড়ি!

সদর দরজার কড়া নাড়া দিলুম। ভয় হচ্ছিল কারুর সাড়া পাব না, সে ভয় অমূলক। কারণ, দ্বিতীয় বার কড়া নাড়বার আগেই হল এক ভৃত্যের আবির্ভাব।

সে থুত্থুড়ো বুড়ো, মুখ তার বিমর্ষ। আমাকে দেখেই সে যেন অত্যন্ত বিস্মিত হল এবং অবাক মুখে আমার পানে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

আমি বললুম, 'বাড়ির মালিক কে তা আমি জানি না, কিন্তু তিনি কি আমার কথা রাখবেন? বাড়ির ভিতরটা একবার আমাকে দেখতে দেবেন?'

সে বললে, 'অনায়াসেই দেখতে পারেন। এ বাড়িখানা ভাড়া দেওয়া হবে।'

সবিস্ময়ে বললুম, 'ভাড়া দেওয়া হবে? আমার কী সৌভাগ্য! কিন্তু এমন চমৎকার বাড়িতে মালিক নিজে বাস করেন না কেন?'

সে বললে, 'মালিক এখানে নিজেই বাস করতেন, কিন্তু তারপর ভূতের উপদ্রব শুরু হওয়াতে তিনি বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছেন।'

আমি বললুম, 'ভূতের উপদ্রব? কিন্তু তবু আমি বাড়িখানা ভাড়া নেব। একালেও লোক ভূত বিশ্বাস করে, তা আমি জানতুম না।'

গম্ভীর মুখে সে বললে, 'আমিও ভূত বিশ্বাস করতুম না, যদি না তাকে নিজের চোখে দেখতুম। আমি স্বচক্ষে তাকে রাত্রিবেলায় ওই বাগানে বেড়াতে দেখেছি।'

কেমন একটা অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করলুম। হাসবার চেষ্টা করে বললুম, 'কী আজব গল্প!'

বৃদ্ধ বললে, অভিযোগ-ভরা কণ্ঠেই বললে, 'ঠাকরুন, অন্তত আপনার মুখে ও-কথা শোভা পায় না। কারণ বাগানের সেই ভূত তো আপনিই।'

ফরাসি লেখক Andre Maurois-এর গল্পাবলম্বনে।

ভূতের ভয়

আবার বৃষ্টি নামল। আজ সারাদিন ধরেই বৃষ্টি এই থামে, এই নামে। মেঘের কাজল মেখে আকাশ হারিয়ে ফেলেছে তার নীলিমা। সূর্য কখন উঠেছে আর কখন অস্তে গিয়েছে কেউ জানে না। ময়লা দিনের আলো এবং তারই ভিতরে ধীরে ধীরে ঘনিয়ে উঠছে আসন্ন সন্ধ্যার বিষণ্ণ অন্ধকার।

গঙ্গার ধারে, বাড়ির তেতলার বারান্দায় বসে আছি কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে। নদীর বুকজোড়া বৃষ্টির জলছড়া দেখতে দেখতে দ্বিতীয় বার চায়ের পেয়ালা খালি করলুম। কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ।

একটা দমকা ভিজে বাতাস গায়ের উপরে হুস করে স্যাঁতসেঁতে নিশ্বাস ফেলে চলে গেল। বারান্দার কোণ ঘেঁসে সরে বসে চোখ তুলে দেখি অন্ধকার কখন নিঃশব্দে এসে গ্রাস করে ফেলেছে গঙ্গার ওপারকে। নীল গাছের সার, বেলুড় মঠের গম্বুজ, বালি ব্রিজ ও দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরচূড়া অদৃশ্য।

এপারে আমার বাড়ি ও নদীর মাঝে জনবিরল পথ হঠাৎ মুখরিত হয়ে উঠল। রাম নামের মহিমা কীর্তন করতে করতে একদল হিন্দুস্থানি শবদেহ বহন করে নিয়ে যাচ্ছে।

জনৈক বন্ধু শুধোলেন, 'হেমেন্দ্র, এ বাড়িতে তুমি একলাই থাকো?'

—'প্রায় তাই-ই বটে।'

—'এখান থেকে শ্মশান খুব কাছে?'

—'হ্যাঁ।'

—'রোজ রাত্রেই এখান দিয়ে মড়া নিয়ে যায়?'

—'তা যায়।'

—'তখন তোমার একলা থাকতে ভয় হয় না?'

হেসে ফেলে বললুম; 'কীসের ভয়?'

—'কীসের আবার? ভূতের।'

—'আমার ভূতের ভয় নেই।'

—'তুমি ভূত মানো না?'

—'ঠিক মানি না বলতে পারি না। এ দেশের আর বিদেশের বড়ো বড়ো পণ্ডিতরাও ভূত মানেন। তাঁদের কথা অবিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না।'

—'তুমি তো নিজেও অনেক ভূতের গল্প লিখেছ?'

—'হ্যাঁ, কাল্পনিক গল্প।'

—'তুমি কখনও ভূত দ্যাখোনি তো?'

—'আমার বাবা প্রেতিনী দর্শন করেছিলেন। তাঁর নিজের মুখে সে গল্প শুনেছি। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ভূত দেখেছিলেন, তাঁর জীবনী পাঠ করলেই জানতে পারবে।'

—'কিন্তু তুমি নিজে ভূত দেখেছ?'

—'ভৌতিক কাণ্ড দেখেছি।'

—'কী রকম? কোথায়?'

—'জয় মিত্র স্ট্রিটে। একত্রিশ কি বত্রিশ বৎসর আগেকার কথা। খবরের কাগজেও সেই ঘটনা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। প্রত্যহ দলে দলে কৌতূহলী লোক ঘটনাস্থলে গিয়ে জনতার সৃষ্টি করত।'

—'ব্যাপারটা কী?'

ভৌতিক উপদ্রব। চোখের সামনে দেখেছি দুমদাম করে ইষ্টকবৃষ্টি। কিন্তু কে যে ফেলছে কিছুই বোঝা যায় না।'

—'দুষ্ট লোকের নষ্টামি।'

—'মোটেই নয়। দিনের বেলা। বাড়ি ঘিরে পুলিশ পাহারা, তবু ইটপড়া বন্ধ হয় না। ঘরের ভিতরে মেঝের উপরে রয়েছে বাসন-কোসন, হঠাৎ সেগুলো জ্যান্ত হয়ে পাখির মতো শূন্য দিয়ে উড়ে আর এক জায়গায় ঝন ঝন করে গিয়ে পড়ল।'

—'কিন্তু তুমি স্বচক্ষে আসল ভূত দেখেছ কি?'

—'আসল-নকল জানি না, একবার একটা ব্যাপার দেখেছিলুম।'

এতক্ষণে কিছু হদিস পেয়ে বন্ধু উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'তাই নাকি? ব্যাপারটা শুনতে পাই না?

—'বলছি। কিন্তু এটা বোধহয় ভূতের গল্প নয়।'

—'ভণিতা ছাড়ো। গল্প বলো।'

আরও জোরে বৃষ্টি এল—ঝম ঝম ঝম ঝম! গঙ্গাজল আর দেখা যায় না, কিন্তু শোনা যায় তার তরঙ্গ তান। এখনও আলো জ্বলেনি, বারান্দায় বন্ধুদের দেহগুলো দেখাচ্ছে ছায়ামূর্তির মতো। একটা নতুন সিগারেট ধরিয়ে চেয়ারের উপরে ভালো করে বসে আরম্ভ করলুম:

তেত্রিশ-চৌত্রিশ বৎসর আগেকার কথা। গঙ্গার ধারে আমার এ বাড়িখানার জায়গায় তখন ছিল খোলা জমি। আমরা বাস করতুম পাথুরিয়াঘাটার পৈতৃক বাড়িতে।

তেতলার ছাদে একপাশে আমার শয়নগৃহ। তার দক্ষিণ দিকের জানালা দিয়ে দেখা যায় বহুদূর পর্যন্ত। জানালার নীচেই একটা হাত দেড়েক চওড়া, কিন্তু বেশ-খানিকটা লম্বা খানা—তার ভিতরে ছিল সাপ আর ইঁদুরের বাসা, মাঝে মাঝে সেখানে প্যাঁচারাও আনাগোনা করত।

খানার পরেই পাশাপাশি তিনখানা ছোটো ছোটো পুরানো বাড়ি। পূর্ব দিকের বাড়িখানা এ-পাড়ায় ছিল কুবিখ্যাত। আমাদের বাল্যকালে ও প্রথম যৌবনে বাড়িখানা ছিল পরিত্যক্ত। সবাই বলত সেখানা হানাবাড়ি, ভাড়া নিতে চাইত না। আমার বাবা ওই বাড়ির ছাদের উপরেই গভীর রাত্রে একটি অবগুণ্ঠনবতী নারীমূর্তি দেখেছিলেন। কিন্তু তাকে ধরতে গিয়েও ধরতে পারেননি—তাঁর চোখের সামনেই মিলিয়ে গিয়েছিল মূর্তি!

আমি যখন তেতলার ওই ঘরে গিয়ে বাসা বাঁধি, তখন বাড়িখানা সংস্কার করে ভাড়া দেওয়া হয়েছিল, যদিও রাত্রে সবাই তার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করত। আমি কিন্তু বহু বৎসরেও সে বাড়ি থেকে সন্দেহজনক কিছুই আবিষ্কার করতে পারিনি।

তবে একদিনের ব্যাপারের কথা মনে আছে। আমার অভ্যাস ছিল ঘুমের আগে অন্তত মধ্যরাত্রি পর্যন্ত লেখাপড়া করা! সেদিনও তাই করছিলুম। রাত বারোটা বাজে—চারিদিক নিঝুম। আচম্বিতে সেই স্তব্ধতা বিদীর্ণ ও আকাশ-বাতাস স্তম্ভিত করে অপার্থিব নারীকণ্ঠে জেগে উঠল তীব্র ও প্রচণ্ড ক্রন্দনস্বর! তেমন ভয়াবহ চিৎকার জীবনে আর কখনও আমি শুনিনি—আমার সর্বাঙ্গ যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। মাত্র একবার সেই বীভৎস কান্না শোনা গিয়েছিল বটে, কিন্তু

তা শুনতে পেয়েছিল পাড়ার সমস্ত লোক। এ পাড়ায় সকলেই আমার আত্মীয়-কুটুম্ব। পরদিন সকালে উঠে খোঁজ-খবর নিয়ে বুঝলুম, কোনো বাড়ি থেকে কোনো নারীই কাল রাত্রে অমন করে ক্রন্দন করেননি। সকলেই মত প্রকাশ করলেন, আওয়াজটা এসেছিল আমাদের বাড়ির পাশের খানার ভিতর থেকেই। আমিও এই মতে সায় দিতে বাধ্য হলুম বটে কিন্তু মধ্যরাত্রে খানার ঘুটঘুটে অন্ধকারে বসে কোনো নারী যে অমন ভয়ানকভাবে কেঁদে উঠবে, এটাও সম্ভবপর বলে মনে হল না। আজ পর্যন্ত এই ক্রন্দন-রহস্যের কোনো হদিস পাইনি।

অতঃপর যে ঘটনার কথা বলব তারও উৎপত্তি ওই খানার ভিতরেই।

সে রাত্রে ভারী গুমোট। বাইরে চাঁদ আলো ঢালছে বটে, কিন্তু বাতাসের শ্বাস একেবারে রুদ্ধ হয়ে গেছে। রাত দুটো বেজে গিয়েছে, তবু চোখে নেই ঘুম, বিছানায় পড়ে আই-ঢাই করছি।

পাশ ফিরে পাশবালিশটা জড়িয়ে ধরে দক্ষিণের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালুম। ধবধবে জ্যোৎস্নায় ছাদের পর ছাদ ভেসে যাচ্ছে। চাঁদের আলোর ভিতরে যে ঠান্ডার আমেজটুকু আছে, এই দারুণ গুমোটে তা মনের ভিতরে গ্রহণ করবার চেষ্টা করলুম।

হঠাৎ আমার চোখ দুটো উঠল বিষম চমকে! খানার দিক থেকে জাগল দু-খানা ছোটো ছোটো হাত, তারপর চেপে ধরলে জানালার দুটো গরাদে। তারপরই দেখা গেল একটা মাথা এবং তারপরেই সমস্ত দেহটা। একটা পাঁচ-ছয় বৎসরের শিশুর দেহ! বিশেষ করে কিছুই বুঝতে পারলুম না, কারণ বাইরের চাঁদের আলোর দিকে পিছন ফিরে ছিল বলে দেহটাকে দেখাচ্ছিল যেন ঘোর কালো অন্ধকার দিয়ে গড়া।

জানালার মাঝামাঝি যে আড়াআড়ি কাঠ থাকে, মূর্তিটা তার উপরে উবু হয়ে বসল, তারপর ঊর্ধ্বোত্থিত দুই হাত দিয়ে গরাদ ধরে বোধহয় আমার পানেই তাকালে—বেশ দেখতে পেলুম তার অগ্নিময় চোখদুটো! তিন কি চার সেকেন্ড সে স্থিরভাবে বসে রইল। তারপর জানালার গরাদে ছেড়ে দেওয়াল ধরে উপর দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি ভীরু নই কোনোকালেই, তবু বুকের ভিতরটা ছমছম করে উঠল বইকি! প্রায় মিনিটখানেক ধরে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো চুপ করে বসে রইলুম বিছানার উপর। তারপরই নিজেকে সামলে নিয়ে চট করে উঠে পড়লুম এবং ঘরের কোণ থেকে একগাছা লোহা-বাঁধানো লাঠি নিয়ে দরজা খুলে ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালুম।

পরিষ্কার চাঁদের আলো। চারিদিকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কেউ নেই কোথাও। তেতলার ছাদে উঠলুম। মূর্তিটার এইখানেই আসবার কথা। সেখানেও কেউ নেই।

কী বলছ? আমি বানরের মূর্তি দেখেছি? প্রথমে আমারও সেই সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু মূর্তিটা বানরের মতো ছোটো হলেও বানর নয়। কারণ, প্রথমত, জলভরা অন্ধকার খানায় বানর থাকে না। দ্বিতীয়ত, বানররা নিশাচর জীব নয়। তৃতীয়ত, জানালার উপর ছিল মসৃণ দেওয়ালের অনেকখানি, তাই বলে কোনো বানরই টিকটিকি কি মাকড়সার মতো উপরে উঠতে পারে না।

তবে সেটা কী? জানি না। তারপরেও ওই ঘরে কাটিয়েছি অনেক বৎসর, কিন্তু মূর্তিটা আর কখনও আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেনি।

ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের কবলে পড়ে সেই রহস্যময় বাড়িখানা এবং সেখানকার বাড়িগুলো এখন অদৃশ্য হয়েছে। আমার কথা ফুরুল।

ঝুপুর ঝুপুর বৃষ্টি পড়ছে, হু হু করে বাতাস বইছে, ছলাৎ ছলাৎ করে গঙ্গাজল তীরে এসে আছড়ে পড়ছে, পৃথিবী অন্ধকার। বন্ধুরা স্তব্ধ।

সুইচ টিপে আলো জ্বাললুম। বন্ধুরা বিরক্ত হয়ে বললে, 'ধেৎ, দিব্যি একটি ভুতুড়ে অ্যাটমসফিয়ার গড়ে উঠেছিল, আলো জ্বেলে সব মাটি করে দিলে!

হেসে বললুম, 'আমি এটা ভূতের গল্প বলে মনে করি না'

বন্ধুরা বললে, 'আমরা যদি নকলে আসলের সুখ পাই, তাতে তোমার কী?'

—'বলো তো আবার আলো নিবিয়ে দি।'

—'না, ছেঁড়া তার জোড়া লাগে না। তার চেয়ে আবার গরম চা আনাও।'

গোবেচারা

আরব দেশের সিরিয়া শহর।

ধু-ধু-ধু মরুভূমির উত্তপ্ত বুক মাড়িয়ে এক পথিক সেখানে এসে হাজির। ভাবুক পথিক, সর্বদাই স্বপ্নরাজ্যে বসে মনের পুলকে করেন কাল্পনিক পুষ্পচয়ন।

হাতের লাঠি আর পরনের জামা-কাপড় ছাড়া তাঁর সঙ্গে নেই আর কোনো মোটঘাট।

সুন্দর শহর এই সিরিয়া! আকারেও মস্তবড়ো। সবিস্ময়ে এদিকে-ওদিকে তাকাতে তাকাতে পথিক অগ্রসর হয়েছেন। রাজপথের মাঝখান দিয়ে কত প্রাসাদ, কত মসজিদ, কত সরাইখানা!

পথিকের মনে জাগে জিজ্ঞাসার পর জিজ্ঞাসা, কিন্তু জবাব দেবার কেহ নেই। তিনি পরদেশী, তাঁর ভাষা বোঝে না এখানকার বাসিন্দারা।

দ্বিপ্রহর। সামনেই প্রকাণ্ড এক সরাইখানা—আগাগোড়া মার্বেল-পাথর দিয়ে বাঁধানো। তার ভিতরে-বাহিরে জনতার প্রবাহ।

পথিক নিজের মনে-মনেই বললেন, 'নিশ্চয়ই এটা হচ্ছে নমাজ পড়বার জায়গা।' তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন।

মস্ত একখানা ঘর, চমৎকার সাজানো-গোছানো। ভেসে আসছে সংগীতের সুর-লহরী। দলে দলে জমকালো পোশাক-পরা লোক সারে সারে বসে আছে, সামনে তাদের রকমারি খাদ্য এবং পানীয়।

পথিক মনে মনে বললেন, 'উঁহু, এটা তো নমাজ পড়বার জায়গা হতে পারে না! নিশ্চয় এ হচ্ছে রাজবাড়ি। যুবরাজ নিজের বন্ধুদের ভোজ দিচ্ছেন।'

একটি লোক তাঁর দিকে এগিয়ে এল সসম্ভ্রমে। পথিক তাকে যুবরাজের কোনো কর্মচারী বলেই আন্দাজ করলেন।

লোকটি পথিককে নিয়ে একটি আসনের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ইঙ্গিতে তাঁকে বসতে বললে।

পথিক আসন গ্রহণ করলেন। তাঁর সামনে সাজিয়ে দেওয়া হল নানা আকারের থালা, বাটি, গেলাস। সব পাত্র পূর্ণ করে রয়েছে চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়! ভুর ভুর করছে গন্ধ, নয়নের আনন্দ।

একমনে পথিক খাবারগুলোর সদ্ব্যবহার করতে লাগলেন। শুকনো মরুভূমি পার হয়ে আসছেন, কতদিন চোখেও পড়েনি ভালো খাবার। পাত্র যত শূন্য হয়, পূর্ণ হয়ে ওঠে তাঁর উদর। শেষটা আর তিনি পারলেন না, হাত-মুখ ধুয়ে উঠে পড়লেন।

সদর দরজার কাছে এক বলিষ্ঠ দীর্ঘদেহ লোক এসে তাঁর পথ জুড়ে দাঁড়াল।

পথিক নিজের মনেই বললেন, 'নিশ্চয়ই ইনিই হচ্ছেন যুবরাজ!' তিনি তাড়াতাড়ি কুর্নিশ করে ধন্যবাদ দিলেন।

দীর্ঘদেহী নিজের ভাষায় বললে, 'মহাশয়, খাবার-দাবার খেয়ে দাম না দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন কেন?'

পথিক সে ভাষার একটা অক্ষরও বুঝলেন না। আবার হেঁট হয়ে পড়ে কুর্নিশ করলেন।

দীর্ঘদেহী ভাবলে, এ বিদেশিটা নিশ্চয় ভবঘুরে, কাছে একটা কানাকড়িও নেই, তবু খাবার খেয়ে এখন লম্বা দেবার ফিকিরে আছে।' সে হাততালি দিলে, অমনি চারজন পাহারাওয়ালা এসে হাজির। পথিকের দুই পাশে দাঁড়িয়ে তারা সব অভিযোগ শ্রবণ করতে লাগল।

তাদের সাজগোজ ও ধরন-ধারণ পথিকের ভালো লাগল। তিনি ভাবলেন, এঁরা বোধহয় এই শহরের বিশিষ্ট লোক।

পাহারাওয়ালারা ইশারায় পথিককে তাদের সঙ্গে যেতে বললে। পথিক আপত্তি করলে না।

আদালত। লোক গিজগিজ করছে, চারিদিকে। উচ্চাসনে উপবিষ্ট এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, দীর্ঘ শ্মশ্রু, পরিধানে কারুকার্যখচিত রেশমি পোশাক।

পথিকের ধারণা হল ইনিই হচ্ছেন নরপতি। তিনি আবার হেঁট হয়ে পড়ে সেলাম ঠুকলেন।

পাহারাওয়ালারা বিচারকের কাছে খুলে বললে সব কথা।

বিচার চলতে লাগল। দুই পক্ষের উকিল গাত্রোত্থান করে জুড়ে দিলে লম্বা আইনের তর্ক। পথিকের আনন্দ আর ধরে না, ভাবলেন, তাঁরই গুণকীর্তন হচ্ছে!

অবশেষে বিচারক রায় দিলে 'আসামিকে বাইরে নিয়ে যাও। ওকে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে দাও, আর ওর গলায় ঝুলিয়ে দাও এমন একখানা পদক, যার উপরে লেখা থাকবে আসামির অপরাধের বিবরণ। তারপর ওকে ঘুরিয়ে আনবে শহরের পথে পথে। একজন পাহারাওয়ালা যেন উচ্চৈঃস্বরে আসামির অপরাধ বর্ণনা করতে করতে ঘোড়ার আগে আগে যায়।'

বিচারকের হুকুম তামিল করা হল অবিলম্বে।

ঘোড়া পথিককে নিয়ে পথে পথে ঘুরতে লাগল এবং সঙ্গে সঙ্গে দামামা ও ভেঁপু বাজিয়ে চলতে লাগল বাদকের দল। দুই পাশের বাড়িগুলোর ভিতর থেকে কাতারে কাতারে বেরিয়ে এল কৌতূহলী বাসিন্দারা। পথিকের অবস্থা দেখে তারা হেসেই অস্থির। পালে পালে ছোকরা ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলল পথিককে টিটকারি দিতে দিতে।

বিষম আনন্দের চোটে এইবারে পথিক যেন পাগল হয়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন তাঁর গলায় যে পদকখানা ঝুলছে, ওটি হচ্ছে বিশেষ রাজানুগ্রহের চিহ্ন। এবং জনতার এই চিৎকার হচ্ছে তাঁরই উদ্দেশ্যে জয়ধ্বনি। আহা, এ কী চমৎকার শোভাযাত্রা।

তারপর পথিক যখন দেখলেন পথ ধরে অগ্রসর হচ্ছে তাঁরই এক দেশের লোক, তখন আর তিনি চুপ করে থাকতে পারলেন না, সানন্দে চিৎকার করে উঠলেন।

'বন্ধু, ও বন্ধু! কী খাসা শহরে এসেছি আমি। কী উদার আর পরোপকারী এর বাসিন্দারা। এরা রাজবাড়িতে নিয়ে গিয়ে পেট ভরে খাওয়ায় অনাহুত অতিথিদের। এখানে অতিথিদের সঙ্গে মেলামেশা করেন রাজা-রাজড়ারা। এখানে অতিথিরা উপহার পায় রাজানুগ্রহের চিহ্ন আর তাদের অভিনন্দন দেবার জন্য বেরোয় শোভাযাত্রা। এ হচ্ছে স্বর্গীয় শহর।'

বন্ধু এ দেশের ভাষা জানে। সব বুঝে কোনো কথা না বলে ঘাড় নেড়ে হাসতে হাসতে চলে গেল।

এগিয়ে চলল মিছিল।

রূপকথার ঘুম

রূপকথার গুহা

গৌরীশৃঙ্গ। রোদ-মাখা ভোরবেলা। চারিদিকে অকলঙ্ক তুষারের শুভ্র আবরণ। আকাশ দিয়ে পেঁজা তুলোর মতো তুষার ঝরছে—বাতাসে তুষারের কণা উড়ছে।

থমথমে গভীর স্তব্ধতা, এত স্পষ্ট যে, হাত দিয়ে যেন স্পর্শ করা যায়!

একটি গুহা। ভিতরে কেবলমাত্র একটি পাখি চুপি চুপি নিঃসাড় গলায় গান গাইছে—সুদূর কানন-ভূমির শ্যামল গান! গুহার ফাটলে ফাটলে দু-চারটি সবুজ তৃণ, ভয়ে থরো থরো মাথা বার করে একমনে সেই গান শুনছে। তৃণগুলির গায়ে গায়ে গুটিকয় ছোটো ছোটো রঙিন ফুল,—গানের সুরের দীর্ঘশ্বাসে তারা কেঁপে উঠছে।

গুহার ভিতরে আলো-আঁধারের আবছায়া। নীচের উপত্যকা থেকে পেড়ে-আনা কচি ফুল-পাতার বিছানা পেতে, গুহার একধারে রূপকথা শুয়ে আছে—ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপন দেখে রাঙা ঠোঁট দু-খানি ফাঁক করে সে হাসছে। গোলাপি

মুখখানির আশেপাশে ভ্রমররা ঘুম-ভাঙানো গুঞ্জনধ্বনি করছে—তারা এসেছে মানস-সরোবরের কমল-রেণু গায়ে মেখে। রূপকথার নিশ্বাসে মলয়-হাওয়ার সুগন্ধ, অল্প খোলা চোখ দুটিতে জ্যোৎস্নার আভাস, পরনে বাসন্তী রঙে ছোপানো, লতার সুতায়-বোনা একখানি হালকা-মিহি কাপড়। নধর-নিটোল ডান হাতখানি একটি কুসুমলতার মতন বুকের উপরে এলিয়ে আছে, শিথিল মুষ্টিতে একগুচ্ছ পদ্মকলি।

গুহার বাইরে নীরবতার স্তব্ধ ঐকতান আচম্বিতে শিউরে উঠল। নীরবতা যেন নীরবে সভয়ে বলে উঠল—ও কে গো, ও কে গো, ও কে?

রূপকথার ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড়িয়ে সে উঠে বসে, অবাক হয়ে সে গুহার দরজার দিকে খানিকক্ষণ অপলক চোখে তাকিয়ে রইল।

কিছুই বুঝতে না পেরে বললে, কেন আমার ঘুম ভাঙল?...এ কী! আমার শ্যামাপাখির গান থেমেছে, তৃণ ফুল সব বেরঙা হয়ে ঝরে পড়েছে, কমল-কলি শুকিয়ে গেছে।...কেন এমন হল? অসময়ে কেন আমার সোনার স্বপন মিলিয়ে গেল?

গুহার দরজার উপরে সূর্যালোকের খানিকটা কালো করে কার ছায়া এসে পড়ল।

রূপকথা তাড়াতাড়ি আপনার ধবধবে আদুড় বুকখানির উপরে আঁচল টেনে দিলে। ভয়ে ভয়ে বিবর্ণ মুখখানি এগিয়ে নিয়ে উপরে গিয়ে বাইরে একবার উঁকি মেরে দেখলে, তারপর অস্ফুট আর্তনাদে বলে উঠল—মানুষ।

সে-ও রূপকথাকে দেখতে পেয়েছিল। দরজার কাছে এসে বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে সে রূপকথার মুখের পানে তাকিয়ে রইল।

রূপকথা মাথায় ঘোমটা টেনে বললে, কে তুমি?

—মানুষ।

—কোথায় থাকো?

—তিব্বতে।

—এখানে কেন?

—সায়েবদের সঙ্গে এসেছি।

—সায়েব! সায়েব কী?

—সায়েব জানো না? তারা যে পৃথিবীর রাজা।

—ও! যারা কলের গাড়ি চালায়, বিজলিকে বেঁধে রাখে, সমুদ্রকে শাসন করে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, —তারাই।

—তারা এখানে এসেছে?

—হ্যাঁ, ওই যে তাদের গলায় আওয়াজ।

—এই শিবের রাজত্বেও শান্তি নেই। কেন, কেন তারা এখানে এসেছে?

—গৌরীশৃঙ্গ দখল করবে বলে।

রূপকথা কেঁদে উঠল, গুহার দরজা বন্ধ করে দিলে।

রাজপুত্রের গুহা

রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র ও কোটাল পুত্র বসে বসে গল্প করছে।

রাজপুত্র। উঃ কী শীত!

মন্ত্রীপুত্র। আংরাটা গেল কোথায়?

কোটালপুত্র। তাতে আগুন নেই।

রাজপুত্র। সওদাগরের ছেলে নীচের উপত্যকায় কাঠ আনতে গেছে। এলে বাঁচি, আগুন পুইয়ে স্যাঁতা বুকটা তাতিয়ে নি।

মন্ত্রীপুত্র। আমরা আর কতদিন এখানে থাকব? ক্রমেই যে বুড়ো হয়ে পড়ছি।

কোটালপুত্র। রূপকথা না বললে তো আমরা আর যেতে পারি না।

রাজপুত্র। রূপকথা তো দিন-রাত ঘুম নিয়েই অজ্ঞান হয়ে আছেন।

মন্ত্রীপুত্র। আমি কিন্তু আর পারছি না—পৃথিবীর জন্যে আমার মন কেমন করছে।

কোটালপুত্র। বসে থেকে থেকে আমার গেঁটে বাত হয়েছে। পৃথিবীতে গেলে রাজবৈদ্যের কাছ থেকে আগেই একটা অব্যর্থ বাত-বিনাশক তৈল কিনতে হবে।

রাজপুত্র একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে। তারপর বললে,—আমার তরোয়ালে মরচে ধরে গেছে। অমৃতকুণ্ডের ধারে সেই যে রাক্ষসী বধ করেছিলুম সে আজ কত দিনের কথা।

মন্ত্রীপুত্র। তোমার ঘুমপুরীর রাজকন্যার ঘুম ভাঙাবার লোক আজ আর নেই, সোনার কাঠির সন্ধান তুমি ছাড়া তো আর কেউ জানে না।

রাজপুত্র। রাজকন্যা এখনও ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপনে আমাকে দেখে কি? এতদিন পরে গিয়ে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে কন্যার ঘুম যদি ভাঙাই তাহলে সে হয়তো আর আমাকে চিনতেই পারবে না।

কোটালপুত্র। আমরা চার বন্ধুতে মিলে কত দেশেই যেতুম। অন্ধকারের নদীর

ধারে, সেই তেপান্তরের মাঠের পারে, বনের গাছটিতে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমি বাসা বেঁধে থাকত, তারা আমাদের দেশ-বিদেশের পথ বলে দিত। আহা, কী দিনই গেছে হে।

রাজপুত্র। বনের ভেতরে চাঁদ যেদিন রংমশাল জ্বালত, তখন সাত ভাই চাঁপা তাদের ফুটফুটে মুখগুলো বার করে পারুলবোনকে গান গাইতে বলত, পারুল বোনের গান শুনে সাতটি চাঁপা তালে তালে দুলতে থাকত, আর জ্যোছনার মুখে হাসি যেন ধরত না।

মন্ত্রীপুত্র। তারপর সেই সোনার শ্রীফল, কাঠের ঘোড়া, সোনার চাঁপা, পাথর-পাখি, মানিকজোড় পায়রা—কত দিনই যে এ-সব চোখে দেখিনি।

কোটালপুত্র। রাজপুত্র, তোমার সুয়োরানি দুয়োরানি মায়েরা এখন না জানি কী করছেন।

রাজপুত্র। তাঁরা কি আর বেঁচে আছেন!

কোটালপুত্র। মন্ত্রীপুত্র, তোমার মেঘবতী কন্যাকে কি আর মনে পড়ে?

মন্ত্রীপুত্র। (করুণ স্বরে) হায় রে, তা আর মনে পড়ে না, দিঘির ধারে অপ্সরিকে পুঁতে রেখে, কত কষ্টেই যে তাকে উদ্ধার করে এনেছিলুম।

কোটালপুত্র। সে সব দিনের কথা ভেবে আমার কান্না আসছে।

রাজপুত্র। ইচ্ছে হচ্ছে, যাই আবার পক্ষীরাজ ঘোড়া ছুটিয়ে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে নিজের রাজ্যে ফিরে। কিন্তু প্রজারা হয়তো আর আমাকে চিনতেই পারবে না।

মন্ত্রীপুত্র। কেন চিনতে পারবে না? সেদিন মানস-সরোবরের ধারে রূপকথার জন্যে পদ্ম ফুল আনতে গিয়েছিলুম। মহাদেবের নন্দীর সঙ্গে হঠাৎ দেখা। সে পৃথিবীতে শিবরাত্রির মোচ্ছব সেরে ফিরে আসছিল। তার মুখে শুনলুম, পৃথিবীতে ঠাকুমারা এখনও নাকি আমাদের ভোলেননি। তুলসিতলায় সন্ধ্যা-প্রদীপ দিয়ে, এখনও রোজ তাঁরা হরিনামের মালা ঘোরাতে ঘোরাতে আমাদেরই নাম করেন। খোকা-খুকিরা এখনও আমাদের দেখতে চায়।

রাজপুত্র। আর যুবারা?

মন্ত্রীপুত্র। যুবারা? তারাই নাকি আমাদের শত্রু। তারা সব বড়ো বড়ো শহরে থাকে, চোখে চশমা দিয়ে দিন-রাত বড়ো বড়ো পুথি পড়ে আর খালি বড়ো বড়ো বুলি কাটে আর তর্ক করে। আমাদের কখনও চোখেও দেখেনি, আমরা যে বেঁচে আছি—তাও তারা মানতে চায় না। তারা কেবল কলকব্জা নিয়ে মেতে আছে, সারাজীবন ষোড়শোপচারে যন্ত্র-রাক্ষসের পুজো দিচ্ছে। তাদের প্রাণ শুকনো যেন

পাথর, নিংড়ালেও এক ফোঁটা রস বেরোয় না, কবিতা আর রূপকথার নাম শুনলেই তারা মারমুখো হয়ে তেড়ে আসে।

রাজপুত্র। তবেই তো!

কোটালপুত্র। ওদের ভয়েই তো আজ আমরা দেশছাড়া।

রাজপুত্র। ভয়? কীসের ভয়? আমরা কি কাপুরুষ? এই হাতে আমি কত দৈত্য-দানব বধ করেছি, তা কি তোমাদের মনে নেই? সামান্য মানুষকে আমরা ভয় করব। চলো আজ আমরা পৃথিবীতে ফিরে যাই। তাদের ভালো করে জানিয়ে দিই গে—আমরা আছি, আমরা জেগে আছি, আমরা জ্যান্ত আছি।

কোটালপুত্র। কিন্তু রূপকথার ঘুম এখনও ভাঙেনি যে।

রাজপুত্র। কবে তাঁর ঘুম ভাঙবে।

মন্ত্রীপুত্র। যতদিন না পৃথিবীর যন্ত্র-রাক্ষসকে কেউ বধ করে।

রাজপুত্র। চলো, আমরাই গিয়ে তার গলা টিপে দিয়ে আসি।

মন্ত্রীপুত্র। উঁহু, অস্ত্রে সে মরবে না। আগে তার প্রাণপাখিকে খুঁজে বার করতে হবে।

রাজপুত্র। আমরাই তা খুঁজে বার করব।

কোটালপুত্র। কিন্তু রূপকথা না বললে আমরা তো যেতে পারব না।

রাজপুত্র দমে গিয়ে চুপ করলে।

কোটালপুত্র। উঃ, কী কনকনে হাওয়া।

মন্ত্রীপুত্র। সওদাগরের ছেলে এখনও ফিরল না তো। কাঠ আনতে বুড়ো হয়ে গেল যে।

তিনজনে বসে বসে শীতের বাতাসে কাঁপতে লাগল...হঠাৎ তিনজনেই এক সঙ্গে চমকে উঠল।

রাজপুত্র। ও কী-ও!

মন্ত্রীপুত্র। কিছুই বুঝছি না তো।

কোটালপুত্র। চলো, চলো,—বাইরে গিয়ে দেখে আসি।

যন্ত্র-রাক্ষসের আক্রমণ

হিমালয়ের একটি উচ্চ শিখর। সূর্যকরোজ্জ্বল তুষারশয়নের উপরে মেঘের পর্দা দুলছে।

চারিদিকের নীরবতার মাঝে একটা অশ্রান্ত, নিষ্ঠুর শব্দ শোনা যাচ্ছে—যেন কোনো অশরীরী দানবের গভীর গর্জন।

রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র ও কোটালপুত্র আকাশের দিকে বিস্মিত চোখ তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

রাজপুত্র। শুনছ?

মন্ত্রীপুত্র। হুঁ। স্তব্ধতার বুক যেন চিরে যাচ্ছে।

কোটালপুত্র। কীসের শব্দ ও?

রাজপুত্র। কে জানে, শব্দটা কিন্তু ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে।

মন্ত্রীপুত্র। এমন শব্দ তো কখনও শুনিনি।

কোটালপুত্র। বাপরে বাপু, রাক্ষসদের চিৎকারের চেয়েও এ শব্দ ভয়ানক।

রাজপুত্র। এ কি বৃদ্ধ হিমালয়ের কান্না?

মন্ত্রীপুত্র। বোধহয় নরকের প্রেতাত্মাদের আর্তনাদ।

কোটালপুত্র। কৈলাসের শ্মশানে বুড়ি ডাকিনি হাড়ের মাদল বাজাচ্ছে না তো?

সবাই আবার চুপ করে শুনতে লাগল।

রাজপুত্র। শব্দটা খুব কাছে এসেছে।

মন্ত্রীপুত্র। হ্যাঁ, সামনের ওই শিখরটার পিছনে। কোটালপুত্র। আমার বুকটা কেমন ছমছম করে উঠছে।

রাজপুত্র। শব্দটা যেন 'কাকে খাই', 'কাকে খাই' করছে।

মন্ত্রীপুত্র। ও শিবের ধ্যান ভেঙে দেবে।

কোটালপুত্র। চলো ভাই, গুহার ভেতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিই গে।

রাজপুত্র। ও আবার কে? ঝড়ের মতন ছুটে আসছে?

মন্ত্রীপুত্র। হ্যাঁ—এই দিকেই।

কোটালপুত্র। ওকে চিনতে পারছ না? ও যে সওদাগরের ছেলে।

রাজপুত্র। ওর মাথার তাজ কোথায় গেল?

মন্ত্রীপুত্র। গায়ের উত্তরীয় কোথায় ফেলে এল।

কোটালপুত্র। নিশ্চয় কোনো বিপদ হয়েছে।

রাজপুত্র। শব্দটা কি ওরই পিছনে তাড়া করেছে?

মন্ত্রীপুত্র। তাই হবে।

কোটালপুত্র। আমার গা ঠকঠক করে কাঁপছে। সবাই গুহার ভেতরে চলো।

সওদাগরপুত্র ছুটে কাছে এসে পড়ল। হাঁপাতে হাঁপাতে বারবার পিছনে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

রাজপুত্র। বন্ধু, বন্ধু, কী হয়েছে বলো।

সওদাগরপুত্র। ভয়ানক বিপদ।

রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, কোটালপুত্র। (একসঙ্গে) বিপদ?

সওদাগরপুত্র। সাংঘাতিক বিপদ। তোমাদের সাবধান করতে ছুটে আসছি।

কোটালপুত্র। ভূতপ্রেতরা বিদ্রোহী হয়েছে কি?

রাজপুত্র। হিমালয়ের তুষার মুকুট খসে পড়েছে?

মন্ত্রীপুত্র। শিবের ষাঁড় কি চুরি করে সিদ্ধি খেয়ে খেপে গিয়েছে? তোমার পিছনে তাড়া করেছে?

সওদাগরপুত্র। না, না,—ওসব বিপদ নয়।

রাজপুত্র। তবে?

সওদাগরপুত্র। মানুষ।

রাজপুত্র। কোথায়?

সওদাগরপুত্র। মানস-সরোবরের পথে।

রাজপুত্র। মানস-সরোবরের পথে মানুষ? অসম্ভব।

সওদাগরপুত্র। আমি নিজের চোখে দেখে আসছি। এক-আধজন নয়—দলে দলে, অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে।

রাজপুত্র। অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে? কী উদ্দেশ্যে?

সওদাগরপুত্র। জানি না। তাদের সঙ্গে আছে যন্ত্র-রাক্ষস।

রাজপুত্র। যন্ত্র-রাক্ষস। মানুযরা যার গোলাম? যার জন্যে আজ আমরা দেশছাড়া? যার ভয়ে পৃথিবী থেকে রূপকথা পালিয়ে এসেছেন?

মন্ত্রীপুত্র। সর্বনাশ।

কোটালপুত্র। যন্ত্র-রাক্ষস কি এখানেও আমাদের আক্রমণ করতে এসেছে?

রাজপুত্র। কিন্তু আকাশে ও কীসের শব্দ, বলতে পারো?

সওদাগরপুত্র। যন্ত্র-রাক্ষসের গর্জন।

কোটালপুত্র। ওরে বাপরে যার গর্জন এমন ভয়ানক—না জানি তার চেহারা কী বিকট। আমার তো ভাবতেই মূর্চ্ছার উপক্রম হচ্ছে।

রাজপুত্র। আচ্ছা, আসুক সে,—আজ এসপার কি ওসপার। কতদিন আর অলসের মতন নির্বাসনে থাকব? আজ আমি যন্ত্র-রাক্ষসকে বধ করব। —এই বলেই রাজপুত্র খাপ থেকে তরোয়াল খুললে।

সওদাগরপুত্র। কিন্তু যন্ত্র-রাক্ষস বড়ো যে-সে রাক্ষস নয়। মানুষকে পিঠে করে সে আকাশে ওড়ে।

রাজপুত্র। উড়ুক। আমারও পক্ষীরাজ ঘোড়া আছে।

সওদাগরপুত্র। কিন্তু তোমার কাছে বাজ নেই! মানুষেরা দেবরাজ ইন্দ্রের বাজ কেড়ে এনেছে। তুমি পারবে কেন?

হঠাৎ দূরে বন্দুকের শব্দ হল।

সওদাগরপুত্র। ওই শোনো।

রাজপুত্র। ও আবার কীসের শব্দ?

সওদাগরপুত্র। মানুষ তার বাজ ছাড়ছে।

মন্ত্রীপুত্র। দ্যাখো, দ্যাখো,—আকাশে কী ওটা?

কোটালপুত্র। ও বাবা, ওর নাক দিয়ে হুস হুস করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

সওদাগরপুত্র। যন্ত্র-রাক্ষস।

আকাশে একখানা উড়োজাহাজ ঘুরতে ঘুরতে এগিয়ে আসছে। সকলে শ্বাস বন্ধ করে দেখতে লাগল।

রাজপুত্র। ও কার কান্না?

সওদাগরপুত্র। তাই তো, এ যে রূপকথার গলা।

কোটালপুত্র। রূপকথার ঘুম ভাঙল কী করে?

সওদাগরপুত্র। বোধহয় যন্ত্র-রাক্ষসের গর্জনে।

রূপকথা কাঁদতে কাঁদতে আলুথালু বেশে ছুটে এল। যেখানে তার পা পড়ছে, সেইখানেই তুষারের উপরে এক-একটি টুকটুকে পদ্ম ফুটে উঠছে—যেন শুচি-শুভ্র তুষার পটে তরুণী ঊষার বিকশিত রাঙা-বাসনার রেখা।

রূপকথা। বাছা, এখানেও মানুষের বিদ্রোহ মাথা তুলেছে—ত্রিভুবনে আমার কি কোথাও একটু ঠাঁই নেই।

রাজপুত্র। তোমার কোনো ভয় নেই মা, আমরা তোমাকে রক্ষা করব।

রূপকথা। পালিয়ে আয় বাছারা, পালিয়ে আয়,—ওই যন্ত্র-রাক্ষসের মুখে পড়লে তোরা কি আর বাঁচবি?

রাজপুত্র। কাপুরুষের মতো পালিয়ে যাব! মা, তুমি কী বলছ!

রূপকথা। যা বলছি, শোন, এ তোর মায়ের হুকুম।

কৈলাস

আকাশ-গঙ্গা ঝরে পড়ছে হিমারণ্যের তুষার-তাজের উপরে—দুধের মতো ধবল তার ধারা।

বিশালপুরী। সিংহদ্বারের বাইরে একপাশে দুই থাবার উপরে মুখ রেখে দুর্গার সিংগি শুয়ে শুয়ে ঝিমুচ্ছে, আর একপাশে শিবের ষাঁড় দাঁড়িয়ে ল্যাজ নেড়ে গায়ের উপর থেকে মাছি তাড়াচ্ছে।

সিংহদ্বারের ভিতরে, আঙিনার এককোণে বসে ভূতের দলের মাঝখানে নন্দি আর ভৃঙ্গির আড্ডা খুব জমে উঠেছে।

মণি-মন্দিরের দরদালানে শিবের আসর। একখানা বাঘছালের উপরে শিব বসে আছেন। সামনেই মড়ার মাথার খুলিতে ফল-মূল সাজানো।

আর-একপাশে পার্বতী বসে বসে শিবের খাওয়ার তদারক করছেন, জয়া-বিজয়া তাঁর চুল আঁচড়ে দিচ্ছে।

পার্বতী। হ্যাঁ গা, এতকাল ধরে পৃথিবীর শহরে শহরে আনাগোনা করলে, তবু এই বদ-অভ্যাসটা ছাড়তে পারছ না?

শিব। বদ-অভ্যাস আমার কী দেখলে?

পার্বতী। এই, মড়ার মাথার খুলিতে খাওয়া?

শিব। তুমিও কি আমাকে কার্তিকের মতন একেলে হতে বলো? ও-সব পুরানো অভ্যাস আমি ছাড়তে পারব না, পছন্দ না হয়, আমাকে 'ওল্ডফুল' বলে ত্যাগ করতে পারো।

পার্বতী। তোমার সঙ্গে কথা কওয়াও ঝকমারি দেখছি। একটুতেই মেজাজ একেবারে তেরিয়া! গাঁজাখোরের স্বভাব, যাবে কোথায়।

শিব সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে, সিদ্ধির বাটির দিকে হাত বাড়ালেন। আসন্ন নেশার স্ফূর্তিতে চোখদুটি তাঁর ঢুলঢুলে হয়ে এল। কিন্তু বাটিটা মুখের কাছে ধরেই দেখলেন, তাতে সিদ্ধি বড়ো কম রয়েছে! অমনি চেঁচিয়ে হাঁক দিলেন নন্দি!

নন্দি 'আজ্ঞে' বলে কাছে এসে দাঁড়াল।

শিব। সিদ্ধি আজ এত কম কেন। ক-আনা পয়সা চুরি করেছিস?

নন্দি। আজ্ঞে, আজ তো আমি বাজার করতে যাইনি।

শিব। তবে কে বাজারে গিয়েছিল শুনি?

নন্দি। আজ্ঞে, বেহ্মদত্যি।

শিব। হুঁ, ব্যাটা পাকা ছিঁচকে-চোর। বেহ্মদত্যিকে এখনই বেলগাছ থেকে কান ধরে নামিয়ে, দূর করে তাড়িয়ে দে।

নন্দি। যে আজ্ঞে।

শিব। আর শোন। বেশ করে একছিলিম গাঁজা সেজে দিয়ে যা দেখি।

নন্দি। আজ্ঞে, আজ তো বাজার থেকে গাঁজা আসেনি।

শিব। কী! একে সিদ্ধি কম, তায় গাঁজা নেই। ভৃঙ্গি, নন্দিকে এখনই ধরে খড়ম-পেটা করে দে তো।

নন্দি। আজ্ঞে, আমার দোষ কী, বাজারে দোকানিরা যে আজ 'হরতাল' করেছে—সব দোকান বন্ধ।

শিব। রোজ রোজ 'হরতাল'। দোকানিরা ভারী চালাকি পেয়েছি দেখছি। আচ্ছা শোন, এবারে অন্নপূর্ণো পুজোর সময়ে তুই পৃথিবীতে গিয়ে, ছদ্মবেশে একটা কৃষি-বিদ্যালয়ে ভরতি হবি। তারপর শিবরাত্তির সময়ে আমি গিয়ে তোকে সঙ্গে করে নিয়ে আসব। কিন্তু এর মধ্যে তোকে সিদ্ধি আর গাঁজার চাষ শিখে নিতে হবে। এবারে আমি কৈলাসপুরীর বাগানে সিদ্ধি আর গাঁজার চাষ করাব। হরতালের মজাটা টের পাইয়ে দিচ্ছি রোসো না! কেমন, পারবি তো?

নন্দি আজ্ঞে, তা আর পারব না!

এমন সময়ে শুঁড় নাড়তে নাড়তে ও ভুঁড়ি দোলাতে দোলাতে গণেশ এসে গরম হয়ে ডাকলে—বাবা।

শিব। এসো বাপধন, এসো, তোমার আবার কী আরজি?

গণেশ। ভালো চাও তো তোমার সাপকে সাবধানে রাখো নইলে এবারে আমি ওর দফা রফা করে দোব—তা কিন্তু আগে থাকতেই বলে দিচ্ছি—হ্যাঁ।

শিব। আরে গেল, আমার সাপ আবার কী করলে তোর?

গণেশ। তোমার সাপ আমার ইঁদুরকে ধরে, আজ আর একটু হলেই পেটে পুরে ফেলত।

শিব। আপদ যেত। তোর ইঁদুর রোজ আমার বাঘছাল কেটে দিয়ে যায়।

গণেশ। আচ্ছা আমার কথায় কান না দাও, মজাটা দেখতেই পাবে। কাল থেকে আমি একটা বেজি পুষব।

গণেশ মুখ ভার করে শুঁড় তুলে চলে গেল।

শিব। গিন্নির আদরে গণেশছোঁড়ার বড়ো বাড় হয়েছে। একালের ছোঁড়াগুলোর হল কী। বাপের মুখের উপরে লম্বা-লম্বা কথা।

এমন সময়ে পাশের ঘর থেকে হারমোনিয়াম বাজিয়ে কার্তিক গান ধরলে—

'যে যাহারে ভালোবাসে, সে তাহারে পায় না কেন?'

শিব চেঁচিয়ে বললেন—কেতো, কেতো! থাম ইস্টুপিড, গেরস্তবাড়িতে বসে বাপের কানের কাছে এইসব ছাই গান। একেবারে গোল্লায় ফেরে গিয়েছ?

গান থেমে গেল।

শিব। নাঃ, এমন সব ছেলেপুলে নিয়ে আর বাঁচতে সাধ নেই। কী বলব, আমি যে অমর—নইলে এখনই গলায় দড়ি দিতুম। নন্দি, শিগগির সোমরস নিয়ে আয় তো বাবা!

পার্বতী। আবার ও-সব ঢালাঢালি কেন? বুড়ো হলে, লজ্জা করে না?

নন্দি ফিরে এসে বললে—সোমরস নেই।

শিব তিন চোখের তিন ভুরু কুঁচকে বললেন—সোমরস নেই কীরকম? সবে কাল কিনে আনা হয়েছে যে।

নন্দি। আজ্ঞে, সোমরসের পাত্রটা দেখলুম, কার্তিকদাদার টেবিলের উপর উপুড় হয়ে আছে।

শিব। হুঁ, বুঝেছি—এ কেতোর কীর্তি! গিন্নি এর জন্যেও তুমিই দায়ী।

পার্বতী। তা তো বলবেই গো—ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো আছি আমি,—যত পারো বলে নাও।

শিব। বলব না তো কী? তোমাকে না ফি-বছরে বারণ করি, কেতোকে নিয়ে বাপের বাড়ি যেতে? কলকাতায় গিয়ে যত কুসংসর্গে মিশে, ছোঁড়ার চরিত্র একেবারে বিগড়ে গেছে। তুমি যদি ওকে ফি-বছর সোহাগ করে সঙ্গে না নিতে, তাহলে আজ ওকে কে চিনত?

পার্বতী। সঙ্গে করে নিয়ে যাই বেশ করি। আমার বাপের বাড়ির দোষ কী? কার্তিক যেমন দেখছে তেমনি শিখছে—তোমারই ছেলে তো, বংশাবলির ধারা বজায় রাখবে না?

শিব। তোমার লেকচার থামাও গিন্নি। এ কলকাতা শহর নয়—এ কৈলাস-ধাম, এখানে স্ত্রী-স্বাধীনতা একেবারেই আউট-অফ-প্লেস।

পার্বতী। দ্যাখো, আমাকে বেশি রাগিয়ো না বলে দিচ্ছি। আমার সেই দশবাহু-চণ্ডী মূর্তির কথা মনে নেই বুঝি? ধরব নাকি সেই মূর্তি?

শিব আর উচ্চবাচ্য করলেন না—হতাশভাবে চুপ মেরে গেলেন।

আচম্বিতে সিংগির হালুম-হুলুম আর ষাঁড়ের গাঁ গাঁ শোনা গেল।

শিব। নন্দি, দেখ, দেখ,—ষাঁড়ের সঙ্গে সিংগি ঝগড়া করছে বুঝি। সেবারে ওই হতভাগা সিংগি থাবা মেরে আমার ষাঁড়ের আধখানা ল্যাজ ছিঁড়ে দিয়েছিল।

নন্দি সিং-দরজা খুলে বললে—না, ষাঁড় আর সিংগি ঝগড়া করছে না, একটি সুন্দরী কন্যা এসেছে, তাকে দেখেই ওরা চ্যাচাচ্ছে।

শিব। পরমাসুন্দরী কন্যা!

পার্বতী। পরমাসুন্দরী কন্যা। এই কৈলাসে!

জয়া-বিজয়ার দিকে ফিরে পার্বতী চুপিচুপি বললেন—এ আবার কে, লো?

জয়া। আবার সেই ত্রেতাযুগের মোহিনী-টোহিনীর মতন কেউ এল না তো?

বিজয়া। সেবারে মোহিনী তো কর্তাবাবুকে সাত-ঘাটের জল খাইয়ে তবে ছেড়েছিল।

পার্বতী। নন্দি, মেয়েটাকে এখান থেকে চলে যেতে বল।

পার্বতীর মনের ভাব বুঝে শিব হেসে বললেন—গিন্নি, আমাকে তা বলে তুমি এতটা খেলো ভেবো না।

পার্বতী। পুরুষকে বিশ্বেস নেই।

নন্দি। এতক্ষণে চিনতে পেরে বললে, 'চিনেছি, চিনেছি। উনি রূপকথা-ঠাকরোন ওই যে, রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, কোটালপুত্র আর সওদাগরপুত্র সবাই সঙ্গে রয়েছে।

শিব। রূপকথা এখানে কী করতে?

নন্দি। উনি ভেতরে আসতে চাইছেন।

শিব। আসতে দে।

রূপকথা পুরীর ভিতরে এসে ঢুকল। —পিছনে রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, কোটালপুত্র ও সওদাগরপুত্র। সকলে একে একে এসে শিবের ও পার্বতীর পায়ের কাছে জড়ো হয়ে প্রণাম করলেন।

রূপকথার পদ্মের পাপড়ির মতন চোখে শুকনো শিশিরের ফোঁটার মতন অশ্রু টলটল করছিল।

শিব। তুমি কাঁদছ কেন বাছা? তোমার কীসের দুঃখ?

রূপকথা। বাবা, জানেন তো একদিন সারা-পৃথিবীতে আমারই রাজত্ব ছিল।

শিব। জানি বই কি! প্রত্যেক মানুষের প্রাণ ছিল তরুণ কবির মতন—তারা মর্ম দিয়ে ভাব-রস-রূপের মর্ম বুঝত।

রূপকথা। কিন্তু লোকে আর আমাকে মানে না, তারা আমাকে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দিয়েছে। তারা আগে আমাকে প্রাণের মতো ভালোবাসত। সে ভালোবাসার বিনিময়ে আমি তাদের দিতুম—কল্পনার অগাধ ঐশ্বর্য, কবিত্বের মনোরম আকাশ-কুসুম আনন্দের সুমধুর সুধাপাত্র। তাই নিয়ে আজ পৃথিবীর দুঃখ-দৈন্য-হাহাকারের মধ্যেও দু-দণ্ডের তরেও বিস্মৃতির দুর্লভ আস্বাদ পেত।

শিব। মানুষ তোমাকে এখন মানে না কেন?

রূপকথা। তারা যন্ত্র-রাক্ষসের পাল্লায় গিয়ে পড়েছে। তারা আর আমাকে বিশ্বাস করে না, আমার সব মিথ্যে। তারা এখন কল্পনার রঙিন আলোতে যা

দেখা যায়, তাকে ফেলে, স্পষ্ট সূর্যের উত্তাপে চোখ দিয়ে যা দেখা যায়, তাকেই সত্যি বলে মানে।

শিব। ভুল করে। চোখের দেখা দু-দিনের, কিন্তু মনের দেখা চিরদিনের।

রূপকথা। সেই দুঃখেই তো আমি এই কৈলাসের ছায়ায় পালিয়ে এসে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নালোকে বাস করতুম।

শিব। তা আমি শুনেছি।

রূপকথা। অবিশ্বাসীদের যুক্তিতে আমার সে-সব ভক্তের মন আজও টলেনি, তারা তবু এই ভেবেও সুখী যে, রূপকথা মিথ্যা নয়—সে তার কবিত্ব আর কল্পনাকে নিয়ে হিমালয়ের এই গোপন অন্তঃপুরে, এই অজানা রহস্যলোকে আজও বাস করছে। যন্ত্র-রাক্ষস তাদের পূজা পায়নি। সংসার-মরুর তপ্ত বালু রাশির ভিতরে এই বিশ্বাসই তাদের মনকে শ্যামল করে রেখেছে। কিন্তু অবিশ্বাসীদের প্রাণে আমার একটু পূজাও সইল না। আমাকে বধ করবার জন্যে, কল্পনার এই সর্বশেষ আশ্রয়টুকু বাস্তবের আড্ডা করে তোলার জন্যে তারা দলবল নিয়ে হই হই করে ছুটে এসেছে।

শিব। তারা কারা?

রূপকথা। মানুষ। তাদের সঙ্গে যন্ত্র-রাক্ষস।

রাজপুত্র বললে—আমি যন্ত্র-রাক্ষসকে বধ করতে চাই, কিন্তু মা আমাকে বারণ করছেন।

শিব। বাছা, তাকে তুমি বধ করতে পারবে না। মানুষ সে কাজ একদিন নিজেই করবে।

রাজপুত্র। কিন্তু মানুষ যে যন্ত্র-রাক্ষসের বন্ধু!

শিব। হ্যাঁ। কিন্তু এ বন্ধুত্ব চিরদিনের নয়। মানুষ আজ তার বন্ধু কারণ মানুষই এখন তাকে চালাচ্ছে। কিন্তু শীঘ্রই পৃথিবীতে এমন দিন আসবে, যেদিন যন্ত্র-রাক্ষসই মানুষের চালক হয়ে উঠবে। সেদিন মানুষের মোহ কেটে যাবে, তার প্রাণ বিদ্রোহী হবে। যন্ত্র-রাক্ষসের বিষ দাঁত মানুষ নিজেই সেদিন ভেঙে দেবে।

রূপকথা। কিন্তু খালি আমাকে মারতে নয়; যন্ত্র-রাক্ষসকে নিয়ে মানুষ যে এই কৈলাসপুরীও দখল করতে ছুটে আসছে।

শিব। কী করে জানলে? মানুষের এত সাহস হবে না।

রূপকথা। আমরা সকলে স্বচক্ষে দেখে আসছি।

রাজপুত্র। এতক্ষণে আজ তারা মানস-সরোবরের পথে এসে পড়েছে।

শিবের তৃতীয় নেত্র আস্তে আস্তে ডাগর হয়ে উঠতে লাগল। বিস্মিত স্বরে বললেন, এত দূরে তারা এসেছে?

রূপকথা। হ্যাঁ,—মানুষ আর যন্ত্র-রাক্ষস।

শিব। আমার এই কৈলাসপুরী অপবিত্র করবে—এতবড়ো সাহস কি তাদের হবে?

রাজপুত্র। তারা নাকি বলছে যে, এই কৈলাসপুরীর টঙে তারা বিজয় নিশান পুঁতে দিয়ে যাবে।

শিব গম্ভীর স্বরে বললেন, নন্দি কৈলাসের চুড়োয় উঠে দেখত কারা এদিকে আসছে।

কৈলাসের মেঘ-ভেদী সর্বোচ্চ শিখরের উপরে উঠে নন্দি একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করলে। সেখান থেকে পৃথিবীর সবুজ বুক পর্যন্ত শূন্যতার অবাধ বিস্তার। নন্দি তাড়াতাড়ি নেমে এসে ব্যস্ত ভাবে বললে, আজ্ঞে বিষম বিপদ।

শিব। অধীর ভাবে জটা-নাড়া দিয়ে বললেন, বিপদ! আমার আবার বিপদ! কী দেখলি আগে তাই বল!

নন্দি। আজ্ঞে দেখলুম—মানস-সরোবরের জলে নীলকমল সব শুকিয়ে গুটিয়ে গেছে, মরালরা আর জলকেলি করছে না। দেব, যক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর আর অপ্সরা-বালারা কী এক অজানা বিপদের ভয়ে ঘাট থেকে উঠে দলে দলে পালিয়ে যাচ্ছে। চারি তীরে তরু-কুঞ্জে আজ বসন্তের লীলা নেই, তাদের শ্যামশ্রীর উপরে কালিমার গাঢ় ছায়া নেমেছে, ফল-ফুল সব খসে পড়েছে, ভ্রমর আর প্রজাপতিরা মূর্ছিত হয়েছে, কোকিলরা সব দেশ ছেড়ে চলে গেছে।

শিবের তৃতীয় নেত্র ধক ধক করে জ্বলে উঠল। নন্দি ভয়ে সুমুখ থেকে সরে দাঁড়াল। মনে মনে বললে, কী জানি বাবা, ও আগুন-চাউনির একটা ফিনকি গায়ে লাগলে আর তো রক্ষে নেই—একেবারে মদন ভস্ম হয়ে যাব!

শিব রুক্ষস্বরে বললে, আর কী দেখলি?

নন্দি। আকাশ-গঙ্গার স্রোত আকাশেই স্তম্ভিত হয়ে আছে, ভয়ে আর নীচে নামতে পারছে না।

শিব। গঙ্গা-গঙ্গা-আমার গঙ্গাও ভয় পেয়েছেন! আচ্ছা, আর কিছু দেখলি?

নন্দি। আর দেখলুম দূরে, মানস-সরোবরের পথে একখানা উড়ো-রথ তার সারথি মানুষ। বরফের উপর দিয়ে আসছে দলে দলে মানুষের পর মানুষ।

শিব তার চকচকে ত্রিশূলের দিকে সুদীর্ঘ বাহু বিস্তার করে উদ্যত বজ্রের মতন প্রদীপ্ত নেত্রে গম্ভীর স্বরে বললেন, মানুষ? ভালো করে দেখেছিস?

নন্দি। আজ্ঞে হ্যাঁ,—ফিরিঙ্গি!

ত্রিশূলে ভর দিয়ে শিব উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর মাথার জটাজুট, গলায় হাড়ের

ও সাপের মালা এবং কোমরে বাঘছাল দুলতে লাগল। নিষ্ঠুর আকাশ-বাতাস চমকে দিয়ে এবং কৈলাসের শিখরের পর শিখরে প্রতিধ্বনির আর্তনাদ জাগিয়ে তিনি বললেন, মানুষ! কৈলাসের উপরে মানুষের আক্রমণ। হাঃ হাঃ। পাথরের শিব দেখে তারা কি ভেবেছে—সত্যি সত্যিই আমি অমনি প্রাণহীন? তারা কি ভুলে গেছে—আমিই বিলয়-কর্তা? এই এক লাথিতে সারা পৃথিবীটাকে গাঁজার কলকের মতো গুঁড়িয়ে, এক ফুঁয়ে ধুলোর মতো আমি শূন্যে উড়িয়ে দিতে পারি, তারা কি তা জানে না? বটে! আচ্ছা—দেখুক তবে? শিব প্রচণ্ড বেগে তাঁর দক্ষিণ পদ উপরে তুললেন।

পার্বতী প্রমাদগুণে তাড়াতাড়ি শিবের পা চেপে ধরে বললেন,—প্রভু, প্রভু! লঘুপাপে গুরুদণ্ড দেবেন না।

শিব। লঘুপাপ! কৈলাসে মানুষের আক্রমণ! —একি লঘুপাপ? পার্বতী, তুমি বলো কী? এ চিন্তাও যে অসহ্য।

পার্বতী। প্রভু, মানুষ অবোধ জীব—এ যাত্রা সামান্য দণ্ডেই তাদের চোখ ফুটিয়ে মুক্তি দাও।

রূপকথা। দেবাদিদেব, অবিশ্বাসীদের জন্যে আমার ভক্তরাও কেন দণ্ড ভোগ করবে? পৃথিবী ধ্বংস হলে আমার ভবিষ্যতের আশা দাঁড়াবে কোথায়?

পার্বতী। পৃথিবীতে আমারও তো ভক্ত আছে। বিনা দোষে তাদের উপরেও দণ্ড দেবে কেন প্রভু?

শিব আপনাকে কতকটা সামলে নিয়ে বললেন—আচ্ছা, এ যাত্রা নির্বোধগুলোকে অল্পে-অল্পেই ছেড়ে দিচ্ছি। প্রভঞ্জন।

প্রভঞ্জন এসে শিবের চরণে প্রার্থনা করে জোড়-হাতে দাঁড়াল।

শিব। প্রভঞ্জন। তোমার ঊনপঞ্চাশ বায়ুকে এখনই মানস-সরোবরের পথে পাঠিয়ে দাও, তুষারের ঝড় উঠুক, তুষারের স্তূপ ধসে পড়ুক, হিমাচলের বুক দুপদুপিয়ে কাঁপতে থাকুক, তুচ্ছ মানুষের বাচালতাকে ক্ষণিক স্বপ্নের মতো লুপ্ত করে দিক।

প্রভঞ্জন তখনই লাফাতে লাফাতে ছুটে চলে গেল।

শিব। নন্দি, তুমি আবার কৈলাসের শিখরে উঠে দ্যাখো।

শিব আবার বাঘের ছালের উপরে স্থির হয়ে বসলেন, নিবিড় মেঘে যেমন জ্বলন্ত সূর্য ঢেকে যায়, তাঁর অগ্নিবর্ষী তৃতীয় নেত্র তেমনি চোখের পাতার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।

কৈলাসের শিখরে শিখরে অকস্মাৎ প্রভঞ্জনের ভৈরব হুঙ্কার ধ্বনিত হয়ে

উঠল—সঙ্গে সঙ্গে ঊনপঞ্চাশ বায়ু অন্ধকার গিরিকন্দর থেকে ছাড়ান পেয়ে হুড়মুড় করে পিঞ্জর-খোলা বন্যের মতো নীচে নেমে গেল, তাদের নির্দয় পদাঘাতে হিমাচলের বিপুল ললাট থেকে তুষারের বৃহৎ স্তূপ সব চারিদিকে খসে খসে পড়তে লাগল—বহু যুগের শীতল নিদ্রার অনাহার থেকে জেগে উঠে, তুষার স্তূপেরা যেন সাক্ষাৎ ক্ষুধিত মৃত্যুর মতো মানস-সরোবরের ঢালু পথ ধরে, ক্রুদ্ধ আবেগে ছুটল।

মরণের পূতি গন্ধ পেয়ে, শিবের চ্যালা জীবন্ত তিমির মূর্তির মতো ভূত-প্রেতরা ঊর্ধ্ববাহু হয়ে নাচতে নাচতে, বিকট 'হর-হর-শংকর' চিৎকারে কৈলাসপুরী থেকে বেরিয়ে পড়ল।

শিব মনের খুশিতে একবার ডমরুটা ডিমি ডিমি বাজিয়ে নিয়ে দুলতে দুলতে বললেন—ব্যোম, ব্যোম, ব্যোম। অনেকদিন পরে এই খণ্ড প্রলয়ের সূচনা দেখে আমারও পা-দুটো আজ তাণ্ডবে মাতবার জন্যে উশখুশ করে উঠছে।

পার্বতী বললেন—ঢের হয়েছে, থামো! বুড়োবয়সে আর নাচের শখে কাজ নেই।

আকাশপটে আঁকা ছবির মতো, হিমালয়ের সব উঁচু শিখরের টঙে, ততক্ষণে নন্দিও ত্রিশূল ঘুরিয়ে নাচ লাগিয়ে দিয়ে বলছে—ব্যোম ভোলানাথ। ব্যোম ভোলানাথ। ব্রাভো প্রভঞ্জন, কতক মলো, কতক পালাল—পথ একেবারে সাফ। যাদুরা ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ তো দ্যাখোনি। এইবার দ্যাখো। ব্রাভো। ক্যা-পি-ট্যা-ল। এখনই থামলে কেন—এনকোর।

শিব। আমিও একবার ব্যাপারটা দেখে আসব নাকি?

পার্বতী। না, না—তাও কি হয়। তোমার কি আর ডানপিটে-গিরি করবার বয়স আছে গা? বরফে পা হড়কে পৃথিবীর গর্তে মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে যে।

মানস-সরোবর

রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, কোটালপুত্র ও সওদাগরপুত্র আগে আগে আসছেন—পিছনে রূপকথা।

রাজপুত্র। কী চমৎকার রাত।

মন্ত্রীপুত্র। প্রকৃতি যেন রূপের ধ্যানে বসেছে।

কোটালপুত্র। মানস-সরোবরে চাঁদের হাসি ফুটে উঠেছে।

সওদাগরপুত্র। গাছে গাছে আবার সবুজ পাতা গজিয়েছে, রাঙা রাঙা ফুল

ফল ফুটেছে, বসন্ত আবার কোকিলের গানের সঙ্গে দক্ষিণ হাওয়ায় বেহালার সুর মেলাচ্ছে।

রাজপুত্র। এমনি এক রাতেই ঘুম-পরির রাজকন্যার সঙ্গে আমার প্রথম চোখে-চোখে মিল হয়।

মন্ত্রীপুত্র। আমার সাধ হচ্ছে, মানস-সরোবরের অথই অপার রুপোলি জলে সাতখানা ডিঙা সাজিয়ে ভেসে যাই, আর জ্যোৎস্নার কানে কানে সারা রাত চুপিচুপি মনের কথা কই।

রূপকথা। বাছারা, দেবাদিদেবের অনুমতি পেয়েছি, আজ থেকে আমরা এই মানস-সরোবরের তীরেই বাস করব।

রাজপুত্র। তাহলে আর আমাদের নীচের সেই গুহাতে ফিরতে হবে না?

রূপকথা। না—যন্ত্র-রাক্ষসের ছায়ায় সে স্থান অপবিত্র হয়েছে। সেখানে আমাদের ঠাঁই নেই।

সকলে। আঃ, বাঁচা গেল, আর শীতে মরতে হবে না।

রূপকথা। ওই যে রাঙা ফুলের কুঞ্জটি রয়েছে, আমি এখন ওইখানেই চললুম।

রাজপুত্র। কেন মা?

রূপকথা। ঘুমুতে।

রাজপুত্র। আবার ঘুম?

রূপকথা। জেগে জেগে কষ্ট সওয়া যে বড়ো দায় বাছা।

রাজপুত্র। এবারে কতদিন পরে আবার জাগবে?

রূপকথা। যতদিন না যন্ত্র-রাক্ষসের বিরুদ্ধে মানুষের বিদ্রোহ মাথা চাগাড় দেয়।

রাজপুত্র। তারপর?

রূপকথা। তারপর আবার আমাদের দিন ফিরে আসবে—কবিত্বের দিন, কল্পনার দিন, পরির দিন, মানুষের বুকটা সেদিন আর কঠোর গদ্যে চাপা থাকবে না—সেখানে জেগে উঠবে সুরের ছন্দ, পারিজাতের গন্ধ আর রূপের আনন্দ।

রাজপুত্র। সেদিন আবার আমার পৃথিবীতে ফিরে যাব?

রূপকথা। আবার তেপান্তরের মাঠে আমার পক্ষীরাজ ছুটবে? আমি ঘুমপুরীতে যাব? আমার সোনার কাঠি খুঁজে পাব?

মন্ত্রীপুত্র। মেঘবতী-কন্যা আমাকে দেখে কেঁদে ফেলবে?

কোটালপুত্র। মানুষ আবার আমাদের আদর করবে?

সওদাগরপুত্র। সাতডিঙা নিয়ে আবার আমি কমলে-কামিনীকে খুঁজতে বেরুব?

রূপকথা। হ্যাঁ বাছা, তোদের সকলেরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। মানুষ তোদের পেলে বর্তে যাবে। বুঝবে, তোদের নির্বাসনে পাঠিয়ে এতদিন তারা কী ভুলই করেছিল।

রাজপুত্র। সে আর কতদিন—আর কতদিন!

রূপকথা। জানি না। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না, ঘুম আমাকে ডাক দিয়েছে, আমার চোখ ঢুলে আছে, আমি ঘুমোতে যাই—ঘুমোতে যাই।

গোলাপের জন্ম

সে বলছে একটি রাঙা গোলাপ এনে দিলে আমার সঙ্গে নাচবে। কিন্তু হায়, আমার সারা বাগানে একটিও রাঙা গোলাপ নেই!

গাছের ডালে বাসায় বসে পাপিয়া ছাত্রের এই করুণ কথাগুলো শুনতে পেলে। পাতার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখে পাপিয়া অবাক হয়ে ভাবতে লাগল।

ছাত্রের বড়ো বড়ো চোখদুটি অশ্রুজলে ভরে উঠল। কান্নার স্বরে সে আবার বললে, 'আমার সারা-বাগানে একটিও রাঙা গোলাপ নেই! হায়, কী তুচ্ছ জিনিসের জন্যে প্রাণের সব শান্তি-সুখ ব্যর্থ হয়ে যায়! জ্ঞানীদের সব লেখা আমি পড়ে ফেলেছি, ষড়দর্শন আমার কণ্ঠস্থ,—কিন্তু তবু, সামান্য একটি রাঙা গোলাপের অভাবে আজ আমি এমন লক্ষ্মীছাড়া!'

পাপিয়া বললে, 'হ্যাঁ, এতদিনে একজন আসল প্রেমিকের দেখা পেলাম! প্রেমিককে চিনতুম না, কিন্তু রাতের পর রাত গলা ভেঙে তারই জন্যে গান গেয়েছি, তারায় তারায় তার বার্তা পাঠিয়েছি আজ তাকে আমার সামনে মূর্তিমান দেখতে পেলাম! তার চুলগুলো কালো যেন কৃষ্ণকলি; তার ঠোঁট দু-খানি তারই চাওয়া গোলাপের মতন রাঙা! কিন্তু দুঃখ তার কপালে নিজের হাতের ছাপ রেখে গেছে, কষ্ট তার মুখকে সন্ধ্যার আকাশের মতো বিষণ্ণ করে তুলেছে!'

যুবক ছাত্র নিজের মনে গুণগুণ করে বললে, 'রাজবাড়িতে আজ উৎসবের বাঁশি বেজেছে! আমি যাকে ভালোবাসি, সে-ও আমন্ত্রণ পেয়েছে। সে বলেছে,

আমি যদি তাকে একটি রাঙা গোলাপ উপহার দি, তাহলে সে আমার সঙ্গে নাচবে। আমি যদি তাকে একটি রাঙা গোলাপ দি, তাবে তাকে আমার এই আলিঙ্গনের ভিতরে ধরতে পারব, তার মুখখানি বিরাজ করবে আমার এই কাঁধের উপরে, তার হাতদুটি এলিয়ে থাকবে আমার এই মুঠির ভিতরে। কিন্তু আমার বাগানে তো রাঙা গোলাপ নেই!...দোসর-হারা আমি নীরবে বসে থাকব, আর আমারই সুমুখ দিয়ে সে চলে যাবে—আমার পানে একটিবার ফিরেও না তাকিয়ে। হায়, অবহেলায় বুক যে আমার ভেঙে যাবে!'

পাপিয়া বললে, 'হুঁ, লোকটি প্রেমিক না হয়ে আর যায় না! যা নিয়ে আমি গান গাই, তার জন্যেই এ ব্যথা পাচ্ছে; আমার সুখ ও দুঃখ! সত্যি, কী অপূর্ব এই প্রেম! পান্নার চেয়ে অমূল্য, মণির চেয়ে দুর্লভ! মুক্তার মালার বদলে তাকে পাওয়া যায় না, হাটে-বাজারে তা কিনতে মেলে না!'

যুবক বললে, 'বাদকরা বীণার তারে তারে রিঞ্জিনী তুলবে, আর তারই তালে তালে সে নাচ শুরু করবে। তার গতি এমন মেঘের মতন লঘু, যে নরম-নধর পা-দু-খানি মাটি ছোঁয় কি না-ছোঁয় তা বোঝা যাবে না। তার চারিপাশে ভক্তের দল এসে ভিড় করে থাকবে। কিন্তু আমার সঙ্গে সে নাচবে না—কারণ আমার বাগানে রাঙা গোলাপ ফোটেনি!'—যুবক ঘাসের উপরে লুটিয়ে পড়ল এবং দুই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল।

একটা গিরগিটি ল্যাজ তুলে ছুটে যেতে যেতে বললে, 'লোকটা কাঁদে কেন?'

রবির একটি ঝিলমিলে কিরণ-ধারায় স্নান করতে করতে প্রজাপতি বললে, 'সত্যিই তো, কাঁদে কেন?'

সরোবরে কমলিনী এক সখীর কানে কানে ফিস ফিস করে বললে, 'সত্যি, কাঁদে কেন?'

পাপিয়া বললে, 'একটি রাঙা গোলাপের জন্যে ও-বেচারি কাঁদছে।'

'একটি রাঙা গোলাপের জন্যে! ও হরি, এমন সৃষ্টিছাড়া কথাও তো শুনিনি কখনও!'—গিরগিটি তো হেসেই অস্থির।

কিন্তু যুবকের বুকের দরদ পাপিয়ার বুকে বাজল। সে নীরবে গাছের ডালে বসে রইল আর ভাবতে লাগল প্রেমের কী রহস্য!...

আচম্বিতে দুই ডানা ছড়িয়ে সে একদিকে উড়ে গেল—এক টুকরো ছায়ার মতো উপবনের পুষ্পকুঞ্জ পেরিয়ে!

খানিকটা ঘাসে-ঢাকা জমি। মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে এক সুন্দর গোলাপগাছ।

তারই এক ছোটো শাখায় গিয়ে বসে পাখিরা বললে, 'আমাকে একটি রাঙা গোলাপ দাও। আমার সব গানের সেরা যে গান, তাই তোমাকে শোনাব।'

গাছ মাথা নেড়ে বললে, 'আমার গোলাপ যে সাদা-সুমুদ্দুরের ফেনার মতো! হিমালয়ের তুষারও তত সাদা নয়। তবে ঝরনার পাশে আমার ভায়ের কাছে গেলে তোমার আশা হয়তো মিটতে পারে।'

পাপিয়া আবার উড়ে গেল—ঝরনার ধারে যে গোলাপগাছ বাসা বেঁধেছে তার কাছে। বললে, 'আমাকে একটি রাঙা গোলাপ দাও। আমার সব গানের সেরা যে গান তাই তোমাকে শোনাব।'

গাছ মাথা নেড়ে বললে, 'আমার গোলাপ যে হলুদে—তৈল-স্ফটিকের আসনে পাতালের যে মৎস-নারী বসে থাকে, তারই চুলের মতো। পীত কুমুদও তত হলদে নয়। তবে যুবক ছাত্রের জানালার তলায় আমার ভাইয়ের কাছে গেলে তোমার আশা হয়তো মিটতে পারে।'

পাপিয়া আবার উড়ে গেল—যুবক ছাত্রের জানালার তলায় যে গোলাপগাছ বাসা বেঁধেছে তার কাছে। বললে, 'আমাকে একটি রাঙা গোলাপ দাও। আমার সব গানের সেরা যে গান তাই তোমাকে শোনাব।'

গাছ মাথা নেড়ে বললে, 'আমার গোলাপ রাঙা-কপোতের পায়ের মতো। সুমুদ্দুরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে যে প্রবাল দোলে সে-ও তত রাঙা নয়। কিন্তু শীতে আমার শিরা-উপশিরা হিম হয়ে গেছে, তুষার আমার কুঁড়ির উপরে খিমচি কেটে গেছে, ঝড় আমার ডালপালা ভেঙে দিয়ে গেছে! এবার সারা-বছরে আমার গোলাপ ফুটবে না।'

পাপিয়া কাতর স্বরে বলে উঠল, 'একটি—শুধু গোলাপ আমার দরকার! কিছুতেই কি তা পাওয়া যায় না?'

গাছ বললে, 'হ্যাঁ, এক উপায় আছে কিন্তু সে এমন ভয়ানক উপায় যে তোমাকে বলতেও আমার মুখ বোবা হয়ে যাচ্ছে!'

পাপিয়া বললে, 'বলো, বলো,—তুমি সব খুলে বলো। আমি ভয় পাব না।'

গাছ বললে, 'যদি তুমি রাঙা গোলাপ চাও, তবে চাঁদের আলোয় গানের সুরে তোমাকে তা রচনা করতে হবে, আর বুকের রক্তে তাকে রাঙাতে হবে। নিজের বুকে একটি কাঁটা বিঁধিয়ে আমার ডালে বসে তোমাকে গান গাইতে হবে। সারারাত ধরে তুমি গান গাইবে, কাঁটা তোমার বুকের ভেতরে গিয়ে ঢুকবে আর তোমার প্রাণের রক্ত আমার শিরায় শিরায় ঢুকে আমারই রক্ত হয়ে যাবে।'

পাপিয়া করুণ সুরে বললে, 'মরণের বদলে একটি রাঙা-গোলাপ,—দাম যে বড়ো চড়া! জীবন কার প্রিয় নয়? সোনার রথে সূর্য ওঠা, মুক্তার রথে চাঁদ ওঠা—সবুজ বনে বসে সেই দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকা কী আনন্দের!

পাহাড়ের উপরে-নীচে বিচিত্র যেসব রঙিন ফুল ফোটে, তাদের গন্ধ কী মধুর!...তবু, জীবনের চেয়ে প্রেমই শ্রেয়, আর মানুষের প্রাণের তুলনায় একটা পাখির প্রাণের মূল্যই বা কতটুকু?'

পাপিয়া দুই ডানা ছড়িয়ে আবার উড়ে এল—এক টুকরো ছায়ার মতো উপবনের পুষ্পকুঞ্জ পেরিয়ে।

যুবক তখনও ঘাসের উপরে শুয়েছিল, তার ডাগর চোখ দুটি থেকে অশ্রু তখনও শুকিয়ে যায়নি।

পাপিয়া বললে, 'খুশি হও, খুশি হও! তোমার রাঙা গোলাপ তুমি পাবে। চাঁদের আলোয় গানের সুরে আমি তা রচনা করব, নিজের বুকের রক্তে আমি তা রাঙিয়ে তুলব! তোমার কাছ থেকে আমি খালি একটি প্রতিদান চাই। তুমি যেন খাঁটি প্রণয়ী হও—কারণ সব জ্ঞান-বিজ্ঞান দর্শনের চেয়ে প্রেমই হচ্ছে শ্রেয়। আগুনের রঙের মতো রঙিন। তার ওষ্ঠাধর, মধুর মতো মিষ্ট, আর তার নিশ্বাসে ধুপ-ধুনার সুগন্ধ!'

যুবক মুখ তুলে পাপিয়ার স্বর শুনলে, কিন্তু তার কথা বুঝতে পারলে না, কারণ কেতাবে যা লেখা আছে তা ছাড়া আর কিছুই সে বুঝতে পারে না।

কিন্তু শালগাছ তার বাণী বুঝতে পারলে। কারণ পাপিয়াকে সে বড়ো ভালোবাসত, তার ডালে পাপিয়ার বাসা। সে চুপিচুপি বললে, 'আমাকে তোমার শেষ গান শুনিয়ে যাও। তোমাকে বিদায় দিয়ে একলাটি আমার মন বড়ো খাঁ খাঁ করবে।

পাপিয়া তাকে বিদায় গান শোনাতে লাগল—তার সে সুরের ধারা যেন রুপোর ঝারি থেকে উছলে-পড়া গন্ধ জলের মতন।

পাপিয়ার গান থামলে যুবক ছাত্র আস্তে আস্তে উঠে বসল এবং কাগজ-কলম নিয়ে ভাবতে লাগল; 'আমার প্রিয়ার গড়ন সুডৌল, এটা সকলকেই মানতে হবে। কিন্তু তার প্রাণে কি মমতা আছে?...বোধহয় না। আসলে, সে আর আর কলাবিদের মতো; তার ভঙ্গি আছে কিন্তু সরলতা নেই। সে দিন-রাত খালি গান আর গান নিয়েই মেতে আছে, আর কে না জানে কালমাত্র স্বার্থপর? তবু এটা বলতেই হবে যে, বাস্তবিকই তার সুর-বোধ আছে। কিন্তু বড়োই দুঃখের বিষয়, সে সুরের অর্থ পাওয়া যায় না, আর তা সংসারের কোনো কাজেই লাগে না।' যুবক তার ঘরে গিয়ে ঢুকল, তার বিছানায় শুয়ে নিজের প্রেমের কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল।

স্বর্গের ছায়ায় যখন চাঁদের মুখ জেগে উঠল, পাপিয়া তখন গোলাপগাছের ডালে গিয়ে সারারাত ধরে সে গান গেয়ে গেল, আকাশের চাঁদ পশ্চিমে ঢলে

পড়ে কান পেতে সে গান শুনতে লাগল। পাপিয়া যত গান গায়, রাত তত গভীর হয়ে ওঠে, কাঁটা তত বুকের ভিতরে গিয়ে বেঁধে, আর তার প্রাণের রক্ত ততই কমে আসতে থাকে।

পাপিয়া প্রথমে গাইলে, বালক-বালিকার হৃদয়ে প্রেমের জন্ম-কাহিনি। সঙ্গে সঙ্গে গাছের টঙের ডালে অপূর্ব এক গোলাপের কুঁড়ি ফুটে উঠল। সুরের ধারার পর সুরের ধারা আসে, আর সেই কুঁড়িতে পাপড়ির পর পাপড়ি ফোটে। প্রথমে সে ফুল ছিল পাণ্ডু-নদীর জলের উপরে দোলায়মান কুয়াশার মতো। রূপের আয়নায় যেমন গোলাপের ছায়া, সরোবরের জলে যেমন গোলাপের ছায়া,— গাছের টঙের ডালে ফোটা তেমনি বেশ অপরূপ গোলাপটি!

গাছ হেঁকে বললে, 'আরও জোরে, আরও জোরে বুক চেপে ধরো, নইলে গোলাপ ফোটা শেষ হবার আগেই দিন এসে পড়বে।'

পাপিয়া কাঁটার উপরে আরও জোরে বুক চেপে ধরলে, তার গানের সুর পর্দায় পর্দায় আরও চড়তে লাগল—তখন সে যুবক-যুবতীর হৃদয়ে প্রেমের জন্ম-কাহিনি গাইছিল।

গোলাপের পাতার উপরে একটুখানি কোমল লালচে আভা ফুটে উঠল। কিন্তু কাঁটা তখনও পাপিয়ার অন্তরের মাঝখানে গিয়ে পৌঁছোয়নি, তাই গোলাপের হৃদয় শুভ্র হয়ে রইল—কারণ পাপিয়ার বুকের রক্ত ভিন্ন গোলাপের বুক রাঙা হতে পারে না।

গাছ হেঁকে বললে, 'আরও জোরে, আরও জোরে, বুক চেপে ধরো, নইলে গোলাপ ফোটা শেষ হবার আগেই দিন এসে পড়বে।

পাপিয়া আরও জোরে কাঁটার উপরে বুক চেপে ধরলে, কাঁটা তার হৃদয়কে স্পর্শ করলে এবং তীব্র এক যাতনা বিদ্যুতের মতো তার সর্বাঙ্গ ভেদ করে বয়ে গেল। তিক্ত,—বড়ো তিক্ত সে যন্ত্রণা! তার গানের সুর তখন ক্রমেই উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠতে লাগল—কারণ পাপিয়া তখন সেই প্রেমের কাহিনি গাইছিল, মরণের দ্বারা যা পরিপূর্ণ এবং শ্মশানের চিতা যাকে গ্রাস করতে পারে না।

অপূর্ব সেই গোলাপ লাল হয়ে উঠল—পূর্বাকাশের নিত্য-বিকশিত জ্বলন্ত গোলাপের মতো।

পাপিয়ার স্বর কিন্তু ক্রমেই ঝিমিয়ে এল, তার ডানা কাঁপতে লাগল, তার চোখের উপরে একটা পর্দা ঘনিয়ে উঠল। তার গান হল মৃদু হতে মৃদুতর এবং তার মনে হল, গলা যেন বন্ধ হয়ে আসছে।

পাপিয়া তখন প্রাণপণে সংগীতের শেষ সুরের মূর্ছনা দিলে চাঁদ তাই শুনে

ঊষার কথা ভুলে আকাশের উপর স্থির হয়ে রইল। রাঙা গোলাপ তা শুনতে পেল, তার সর্বাঙ্গে এক পুলকহিল্লোল বয়ে গেল এবং শীতার্ত ভোরের বাতাসে তার পাপড়িগুলো ছড়িয়ে পড়ল। পাপিয়ার শেষ সুরের ঝঙ্কার নিয়ে প্রতিধ্বনি চারিদিকে ছুটে গেল এবং রাখালদের রাতের স্বপন থেকে জাগিয়ে তুলল। তটিনীর জল-বাঁশির রন্ধ্রে সে সুর ব্যাপ্ত হয়ে গেল এবং সমুদ্রের কাছে আপনার বার্তা পাঠিয়ে দিলে।

গাছ চেঁচিয়ে বললে, 'দ্যাখো, দ্যাখো! এতক্ষণে গোলাপ-ফোটা শেষ হয়েছে!'

কিন্তু পাপিয়া শুনতে পেলে না। সে তখন ঘাসের উপরে মরে পড়ে আছে,—তার বুকের উপরে বেঁধা সেই নিদারুণ কাঁটা।

দুপুরবেলা যুবক ছাত্র জানালা খুলে দেখে সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'কী সৌভাগ্য! এই যে একটি রাঙা গোলাপ ফুটেছে...মরি, মরি, এমন গোলাপ তো জীবনে কখনও দেখিনি! আহা, কী সুন্দর! উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে নিশ্চয়ই এর একটা কোনো জমকালো নাম আছে!' যুবক ঝুঁকে পড়ে গোলাপটি চয়ন করলে।

তাড়াতাড়ি জামাকাপড় পরে গোলাপটি হাতে করে সে তার অধ্যাপকের বাড়ির দিকে ছুটল—অধ্যাপকের কন্যাই তার প্রিয়তমা।

অধ্যাপকের কন্যা দরজার কাছে এসে বসে বসে লাটিমে রেশমের সুতো জড়াচ্ছে, তার পায়ের তলায় ঘুমিয়ে আছে একটি ছোটো কুকুর।

যুবক উল্লাসভরে বললে, 'একটি রাঙা গোলাপ পেলে তুমি আমার সঙ্গে নাচবে বলেছিলে। এই নাও দুনিয়ার সব চেয়ে রাঙা গোলাপ! এটিকে তোমার বুকের উপরে আজ সন্ধ্যায় গুঁজে রেখো। মনে রেখো, আমি তোমাকে কত ভালোবাসি।'

ভুরু কুঁচকে যুবতী বললে, 'উঁহু, আমার পোশাকের সঙ্গে এ গোলাপ তো খাপ খাবে না। আর এখন আমার গোলাপের দরকারও নেই, আমার এক ধনী বন্ধু আমাকে আসল জড়োয়া গয়না পাঠিয়ে দিয়েছে। দামি গয়নার কাছে আবার ফুল!'

যুবক ক্রুদ্ধস্বরে বললে, 'তুমি পাষাণী।'—কাছ দিয়ে একটি ময়লা-ফেলা গাড়ি যাচ্ছিল, যুবক হাতের গোলাপটি সেইদিকে নিক্ষেপ করলে, গাড়ির চাকা গোলাপটিকে ছিন্নভিন্ন করে থেঁতলে চলে গেল।

যুবতী বললে, 'আমি পাষাণী। তোমার কথা এমন অভদ্র কেন? আর সত্যি কথা বলতে গেলে, তোমাতে-আমাতে কীসের সম্পর্ক? তুমি তো সামান্য এক গরিব ছাত্র! আমাকে যে গয়না পাঠিয়েছে, তার মূল্য কত টাকা, সে খবর কিছু রাখো?—এই বলে যুবতী বাড়ির ভিতরে চলে গেল।

যুবক ধীরে ধীরে চলতে আপন মনে বললে, 'প্রেম কী বোকামির ব্যাপার! ন্যায়-শাস্ত্রের মতন উপকারীও নয়, তার দ্বারা কোনো কিছু প্রমাণিত হয় না, সে যা বলে তা কখনও ঘটে না, সে যা বিশ্বাস করে তা কখনও সত্য হয় না। আসলে প্রেমটা অচল। আর আমার প্রেমে কাজ নেই, তার চেয়ে ষড়দর্শন আর মনোবিজ্ঞানে মনোযোগ দিলে ঢের বেশি লাভ হবে।'

যুবক তখন বাড়িতে ফিরে এল এবং একখানা ধুলাভরা মস্ত কেতাব টেনে নিয়ে পড়তে বসল।

Oscar Wild-এর The Nightingle and the Rose হইতে

আজও যা রহস্য

ফ্রান্সের ইতিহাসে সব থেকে রহস্যজনক প্রেতের আগমন ঘটেছিল সম্ভবত মেরি অ্যান্টয়নেটের উপস্থিতি। ভার্সাই-এর প্রাসাদ সংলগ্ন বাগানে দুজন সম্ভ্রান্ত ইংরাজ মহিলা একবার হারিয়ে যান। সেই বাগানে প্রকাশ্য দিবালোকে তাঁরা কাকে দেখেছিলেন? মেরি অ্যান্টয়নেটকে? নাকি এ সবই তাঁদের দেখার ভুল? এটি একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা, যার রহস্য আজও আমাদের কাছে অনাবিষ্কৃত। কিন্তু তদানীন্তনকালে এ ঘটনা খুব আলোড়ন তুলেছিল একথা সবাই স্বীকার করেছেন। পরবর্তীকালেও সেই দুই ইংরাজ রমণীর চাক্ষুষ অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে কিছু গবেষণা নতুন করে আলোকপাত করলেও—সত্যিই সেদিন মেরি অ্যান্টয়নেট এসেছিলেন কি না তা আজও রহস্য এবং সন্দেহের পর্যায়ে রয়ে গেছে।

ভার্সাই-এর বাগানে সেদিন দুই মহিলা যা দেখেছিলেন তা নির্ভরযোগ্য সত্য কি না তা কেউ হলফ করে বলতে না পারলেও, গবেষকরা যে এই দুই প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণকে এত মূল্য কেন দিয়েছিলেন তাও একটি ভাববার বিষয়। এই দুই মহিলা ছিলেন পেশায় সম্মানিতা। বয়েস এবং বংশ মর্যাদায় ছিলেন রানি ভিক্টোরিয়ার সমগোত্রিয়া। এঁদের একজনের নাম শার্লো অ্যানি মোবার্লি। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৮৪৬ সালে। পনেরোটি ভাই-বোনের মধ্যে তিনি দশম। লেখাপড়াতেও তিনি ছিলেন উচ্চশিক্ষিতা। মেধায় ছিলেন অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। এর জন্যে তাঁর পারিবারিক পরিবেশ তাঁকে খুবই সাহায্য করেছিল। বাবা ছিলেন

উইনচেস্টার কলেজের কৃতী প্রধানশিক্ষক এবং স্যালিসবেরির বিশপ। অন্য ইংরেজ মহিলার নাম ছিল এলিনর জর্ডেন। বংশমর্যাদায় তিনিও খুব একটা হেলাফেলার নন। তাঁর পিতা ছিলেন ডার্বিশায়ারের অন্তর্গত অ্যাসবোর্ন-এর ধর্মযাজক। যাই হোক শার্লোর সঙ্গে জর্ডেনের বয়েসের বেশ কিছু পার্থক্য সত্ত্বেও দুজন ছিলেন দুজনের পরম মিত্র।

১৮৬৬ সাল। মিস মোবারিল অক্সফোর্ডের সেন্ট হুগস হলে অধ্যক্ষা হয়ে এলেন। তখন তাঁর বয়েস চল্লিশ। বিবাহও করেননি। দিনরাত পড়াশুনা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। অবসর সময় কাটান দেশ ভ্রমণে। সেন্ট হুগস হলটি ছিল মেয়েদের আবাসিক হোস্টেল। বিদেশ থেকে বা দূর দূর অঞ্চল থেকে যারা লেখাপড়া করতে আসত তারাই ওখানে বসবাস করত। রাসভারী অধ্যক্ষা হিসেবে মিস মোবারলিকে প্রত্যেকেই বেশ সমীহ করে চলত।

দেখতে দেখতে অনেকগুলো বছর ওই হোস্টেলে প্রধান অধ্যক্ষা হিসেবে কাটিয়ে দিলেন মিস মোবারলি। আসলে তিনি হয়তো ওই পেশাটিকে মনেপ্রাণে ভালোবেসে ছিলেন। তাই এতদিন তাঁর মধ্যে কোনো কর্মশৈথিল্য আসেনি। কিন্তু বয়েস সবসময় মনের ইচ্ছা পূরণ করে না। শরীর এসে বাদ সাধে। দেখতে দেখতে প্রায় পঞ্চান্ন বছর বয়েস হয়ে গেল। কর্তৃপক্ষের কাছে তিনি আবেদন জানালেন এক সহকারিণীর জন্য। আবেদন মঞ্জুর হল। নতুন সহকারিণী হয়ে এলেন মিস জর্ডেন। মিস মোবারলির থেকে ইনি বয়েসে অনেক ছোটো। জর্ডেনকে প্রথম সাক্ষাতে মোবারলি বেশ ভালো লাগল। বেশ চটপটে আর করিতকর্মা। তবুও হোস্টেল কর্তৃপক্ষের নির্দেশে উভয়কে একই সঙ্গে একটি ছোট্ট ভ্রমণে বের হতে হল।

ঠিক হল পনেরো দিনের ছুটিতে উভয়ে প্যারিস যাবেন। যদিও মিস জর্ডেনের অনেকবারই প্যারিস ভ্রমণ করা ছিল তবুও তিনি নতুন সহকর্মিণীর সঙ্গিনী হলেন। কারণ মিস মোবারলির একবারও প্যারিস যাওয়া হয়নি। বলাবাহুল্য জর্ডেন ছিলেন বেশ মিশুকে ধরনের মহিলা। আর মোবারলির তো মিস জর্ডনকে ভালোই লেগেছিল। ট্রেনে ওঠার পর উভয়ের বন্ধুত্ব হতে বেশি সময় লাগল না।

এরপরের কাহিনি সেই ঐতিহাসিক রহস্যময় ভ্রমণ বৃত্তান্ত। সেই বৃত্তান্ত শোনার আগে আমার মনে হয় একবার ইতিহাসের পাতায় কিছুক্ষণের জন্যে ঘুরে আসা দরকার। মেরি অ্যান্টয়নেটের জীবন ইতিহাস সামান্য জানা থাকলে পরবর্তী কাহিনির রহস্যময়তা অনুধাবন করতে সাহায্য করবে।

মেরি অ্যান্টয়নেট—পৃথিবীর ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য নাম। বিশেষ করে ফ্রান্সের ইতিহাসে তৎকালীন সভ্যতায় মেরি অ্যান্টয়নেট রানি হয়েও

জীবদ্দশায় তিনি জনখ্যাতি পাননি। বরং জনমানসে তিনি ছিলেন বিলাসী, খামখেয়ালি এবং হঠকারিনী।

মেরি অ্যান্টয়নেট যখন ফ্রান্সের রানি তখন ফ্রান্সের ঘোর দুর্দিন। ফ্রান্সের জনগণ মনে করত তাদের দুঃখ-দুর্দশার জন্যে রানির দায়িত্ব কিছু কম ছিল না।

১৭৫৫ সালের ২রা নভেম্বর অ্যান্টয়নেট ভিয়েনায় জন্মগ্রহণ করেন। অষ্ট্রিয়ার সম্রাট প্রথম ফ্রান্সিস এবং মারিয়া থেরেসার কন্যা ছিলেন এই মেরি অ্যান্টয়নেট।

সম্রাটদুহিতা অ্যান্টয়নেট আজন্ম সুখ আর ভোগে লালিতা পালিতা। তার ওপর বাবা-মায়ের চোখের মণি তিনি। দুঃখ এবং দারিদ্র্য যে কী জিনিস সেটুকু বোঝার ক্ষমতা বা ইচ্ছা কোনোটাই ছিল না মেরির। আর তার খোঁজ রাখার প্রয়োজনই বা কী? ফলে খুব ছোটো থেকেই মেরি হয়ে উঠলেন খামখেয়ালি আর বিলাসী প্রকৃতির। যখন যেটি দরকার সেই মুহূর্তেই সেটি হাতের সামনে পাওয়া চাই। নইলে? নইলে যে কী তা বলার কোনো প্রয়োজন নেই।

কন্যার এই খামখেয়ালিপনা আর অতি আদুরে স্বভাব বাবা-মাও লক্ষ করেছিলেন। তাই তাঁরা বেশিদিন কন্যাকে নিজেদের কাছে রাখতে চাইলেন না। মাত্র পনেরো বছর বয়েসে মেরির বিয়ে দিয়ে দিলেন। আশা করেছিলেন বিয়ের পর স্বামীর গৃহে গেলে হয়তো বা কন্যার স্বভাব পালটাতে পারে।

বিয়ে হল ফ্রান্সের যুবরাজের সঙ্গে। ১৭৭৪ সালে ফ্রান্সের রাজার মৃত্যুর পর যুবরাজ সিংহাসনে বসলেন রাজা ষষ্ঠদশ লুইস নামে। ফ্রান্সের নতুন রানি হলেন মেরি আন্টয়নেট।

মেরির বাবা-মা ভেবেছিলেন স্বামীর গৃহে গেলে মেয়ের হয়তো মতি ফিরবে। কিন্তু তা হল না। পনেরো বছর বয়েসে যুবরাজের পত্নী হলেন আর উনিশ বছর বয়সে হলেন রানি। জীবনের দুঃখ-কষ্টের দিক তাঁর দেখা হয়নি। আশপাশের জগতে কেবল সচ্ছলতা আর স্বাচ্ছন্দ্যের জোয়ার। উনিশ বছরের রানির পক্ষে তাই বেহিসেবী হওয়া ছাড়া অন্য কোনো গতি ছিল না। নিত্যনতুন উপায়ে তিনি সুখ খুঁজে বেড়াতেন।

ফ্রান্সের তখন ঘোর দুর্দিন। বিশেষ করে রাজা ষষ্ঠদশ লুইসের রাজত্বকালে সাধারণ মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য চরমে উঠেছিল। বিশেষ করে দিনমজুর আর চাষি সম্প্রদায়ের মধ্যে অভাবের জ্বালা তীব্র আকার ধারণ করেছিল। অনাহার আর রোগ একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাদের উপর। একবেলাও পেটপুরে খাবার সংস্থান তাদের ছিল না।

জনগণের ক্রোধ আর রোষ বেশিদিন চাপা রইল না। প্রতিদিন অবস্থা সঙিন থেকে সঙিনতর হয়ে উঠল। আর শেষপর্যন্ত সেই জনরোষ একদিন 'ফরাসি বিপ্লবে' রূপান্তরিত হল।

মাত্র ক-টা বছর। ১৭৭৪ থেকে ১৭৭৯। পাঁচ বছরের মধ্যে সারা দেশ একসঙ্গে জ্বলে উঠল। ১৭৭৯ সালে অক্টোবরে ভার্সাই-এর রাজপ্রাসাদে বিপ্লবের আগুন ধরে গেল। ক্রুদ্ধ জনতার রোষ রাজপরিবারকে প্রাসাদ থেকে প্যারিসে পলায়ন করতে বাধ্য করল। সাধারণ মানুষের ছদ্মবেশে তাঁরা পালাতে চেয়েছিলেন উন্মত্ত জনতার হাত থেকে বাঁচার জন্যে। কিন্তু তা হল না। রাজা-রানিকে আশ্রয় দেবার মতো কেউ ছিল না। দেশের আপামর জনতা যে রাজার শত্রু। উভয়েই শেষ পর্যন্ত জনতার হাতে বন্দি হলেন। সশস্ত্র প্রহরা বসল বন্দিনিবাসের দরজায়। বিদ্রোহী এবং দেশপ্রেমিক বিপ্লবীরা চাইল প্রকাশ্যে তাঁদের বিচার করা হোক।

অবশেষে বিচার শুরু হল। ফল কী হবে তা জানাই ছিল। ১৭৯৩ সালের ২১শে জানুয়ারি গিলোটিনের করাত রাজা ষষ্ঠদশ লুইসের মাথাটি কেড়ে নিল।

মুক্তি পেলেন না রানি অ্যান্টয়নেট।

অবশেষে ১৭৯৩ সালের ১৬ই অক্টোবর। রাজা ষষ্ঠদশ লুইসের মতো তিনিও নিজের মাথা দিয়ে গেলেন গিলোটিনের নীচে।

এরপর কেটে গেছে অনেক বছর। পৃথিবীর ইতিহাসে ঘটেছে অনেক বিবর্তন। জীবনের সব ঋণ শোধ করে মেরি অ্যান্টয়নেট হয়েছেন ইতিহাসের একটি চাঞ্চল্যকর এবং করুণ নাম। মেরির জীবন-ইতিহাস বারবার স্মরণ করিয়ে দেয় স্বেচ্ছাচারিতার পরিণাম। কিন্তু সেটাই কি শেষ কথা? সত্যিই কি মৃত্যুর পর আর কোনো কিছুই অবশিষ্ট থাকে না? অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে কেউ মারা গেলে আমরা দেখেছি সে সব আত্মারা বারবার পৃথিবীর আশেপাশে ফিরে আসতে চেয়েছে। মেরিরও কি অতৃপ্ত বাসনা কিছু ছিল? তাঁরও কি জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে পুনর্বার বাঁচার বাসনা জেগেছিল? অন্তত ষষ্ঠদশ লুইসের জীবদ্দশায় আমরা দেখেছি মেরি বাঁচার জন্য শেষ সংগ্রাম করেছেন। কিন্তু রাজার মৃত্যুর পর মেরিকে আমরা পেয়েছি শান্ত এবং স্থির উদাসীন এক মূর্তির মতো। অনেক ঝড়ের শেষে পৃথিবী যেমন শান্ত হয়, মেরিও ঠিক তেমনি সারাজীবন ভোগবিলাসের শেষে হয়ে পড়েছিলেন নির্বিকার। শান্তভাবে এসেছেন নিজের বিচারের এজলাসে। দৃঢ় উন্নত ভঙ্গিতে শুনেছেন নিজের মৃত্যু পরোয়ানা। তারপর রানির মতো বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে গেছেন গিলোটিনের নীচে।

তবু যেন মনে হয় সব শেষ হয়েও সব কিছু শেষ হয়ে যায়নি। অন্তত পরবর্তী ঘটনা যদি সত্যি হয় তাহলে ধরে নিতে হবে মেরি অ্যান্টয়নেটেরও ছিল কিছু শেষ কথা বলার যা তিনি জীবদ্দশায় বলে যেতে পারেননি।

সেদিন ১০ই আগস্ট। ১৯০১ সাল। এই শতাব্দীর বছর শুরু। রানির মৃত্যুর

পর কেটে গেছে একশো আট বছর। পৃথিবীর মানুষ ইতিহাসের পাতা ব্যতিরেকে তাঁর সব কিছু ভুলে গেছে। সচরাচর মনে পড়ে না তাঁর জীবনের করুণ আলেখ্য।

মিস মোবারলি আর মিস জর্ডেন গেছেন প্যারিস ভ্রমণে। বাড়িতে বসে না থেকে দুই অসমবয়সি নারী প্রতিদিন বিকেলে বেরিয়ে পড়েন। আজ এখানে কাল সেখানে। কখনও ট্রেনে কখনও অন্য কোনো যানে। সেদিন হঠাৎ মিস জর্ডনের খেয়াল হল ভার্সাই-এর বিখ্যাত রাজপ্রাসাদ দেখতে যাবেন। মিস মোবারলির প্যারিস ঘোরা হয়নি এর আগে। ভার্সাই-এর রাজপ্রাসাদের ঐতিহাসিক মূল্যও আছে যথেষ্ট। দুই মহিলা ট্রেনে চেপে উপস্থিত হলেন ভার্সাইতে। যতটা উৎসাহ নিয়ে তাঁরা এসেছিলেন, ভার্সাই-এর রাজপ্রাসাদ তাঁদের তেমন মুগ্ধ করল না। তখন মিস মোবারলিই জানালেন তিনি প্রেটিট ট্রায়ানোঁতে যাবেন। বিখ্যাত 'প্রেটিট ট্রায়ানোঁ' মেরি অ্যান্টয়নেটের সাধের বাড়ি। ভার্সাই রাজপ্রাসাদ থেকে কিছুদূরে বাগানের মধ্যে অবস্থিত এই প্রেটিট ট্রায়ানোঁ।

পায়ে হেঁটেই তাঁরা রওনা হলেন। সাধারণত অন্যান্য দর্শনার্থীরা কোনো পথ নির্দেশককে সঙ্গে নেন। অপরিচিত স্থান। পথ ভুল হতেই পারে। সঙ্গে পথ নির্দেশক থাকলে অনেক পরিশ্রম আর হয়রানি লাঘব হয়। কিন্তু মহিলাসুলভ লজ্জায় তাঁরা কোনো পথ নির্দেশক অথবা কোনো পথ নির্দেশিকার বইও কিনলেন না। তাঁরা ভাবলেন, বিখ্যাত স্থান, স্থানীয় লোকজনদের জিজ্ঞাসা করলেই তাঁরা প্রেটিট ট্রায়ানোঁতে পৌঁছে যাবেন।

আগেই বলেছি অপরিচিত স্থানে পথ ভুল হবার সম্ভাবনা প্রতি পদে পদে। অচিরেই তাঁরা রাস্তা ভুল করলেন এবং পথ হারালেন। বড়ো রাস্তা ছেড়ে তাঁরা একটি গলির মধ্যে ঢুকে পড়লেন। ফলে প্রেটিট ট্রায়ানোঁতে পৌঁছনোর বদলে এসে উপস্থিত হলেন একটি গ্রাম্য আর মেঠো বাড়ির সামনে। মিস মোবারলির হঠাৎ কেমন যেন সন্দেহ হল, হয়তো তাঁরা ঠিক রাস্তায় আসেননি। সেই কুঁড়ে-ঘরটির জানালার সামনে দাঁড়িয়ে তখন একটি গ্রাম্য মহিলা কাপড় থেকে জল ঝাড়ছিলেন। এবার তাঁর মনে হল মহিলাটিকে প্রেটিট ট্রায়ানোঁ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু তিনি ফরাসি ভাষা জানতেন না। তবে আশ্চর্য হলেন মিস জর্ডেন যৎসামান্য ফরাসি ভাষা জানা সত্ত্বেও গ্রাম্য মেয়েটিকে কিছু জিজ্ঞাসাই করলেন না। আসলে মিস জর্ডেন বোধহয় মেয়েটিকে লক্ষই করেননি।

যে গলি ধরে ওঁরা যাচ্ছিলেন কিছুদূর এগোবার পরই দেখলেন গলিটি তিনভাগে ভাগ হয়ে গেছে।

দুজনে একবার থমকে দাঁড়ালেন। দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকালেন।

দুজনের মুখে তখন একটা প্রশ্নই আটকে আছে—এবার কোন রাস্তায়? কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করতে না করতেই তারা মধ্যবর্তী রাস্তায় দুজন লোককে দেখতে পেলেন। তাদের দেখে প্রাসাদের মালি বলেই মনে হয়েছিল। সুতরাং আর কিছু চিন্তা না করে মাঝের রাস্তা ধরে এগিয়ে চললেন।

মিস মোবারলি পরে অবশ্য বলেছিলেন, লোকদুটোকে দেখে তাঁর মনে হয়েছিল সাধারণ মালি নয় এরা। নিশ্চয় সৈন্যবিভাগের কোনো উচ্চপদস্থ অফিসার হবেন। তাঁদের পরনে ছিল ধূসর সবুজ রঙের লম্বা কোট। আর মাথায় ছিল তিন-কোনা টুপি। মিস জর্ডেনও পরবর্তী কালে বলেছিলেন তিনিও ওই রকম দুজন লোককে দেখেছিলেন। এমনকি তাদের হাতে যে ছড়ি জাতীয় কিছু ছিল তারও উল্লেখ করেছিলেন। যাই হোক, লোক দুটিকে দেখার পর মিস মোবারলিই এগিয়ে গিয়ে প্রেটিট ট্রায়ানোঁ কোন রাস্তায় পড়বে তার হদিস জিজ্ঞাসা করেছিলেন। লোকদুটি ইংরেজি প্রশ্নের কী মানে করেছিল কে জানে। তারা ফরাসি ভাষায় উত্তর দিয়েছিলো, 'টুট্য ড্রাআ' (Tout Droit)।

ভুল হয়েছিল এখানেই। Droit শব্দটির ইংরেজি আভিধানিক অর্থ হল right মানে দাবি বা অধিকার। কিন্তু মিস মোবারলি ধরে নিলেন তাঁদের বুঝি ডান দিকের গলিতে যেতে বলা হচ্ছে। কালবিলম্ব না করে তাঁরা ডান দিকের রাস্তা ধরে কিছুদূর এগিয়ে গেলেন। একটু পরেই মিস জর্ডেনেরই প্রথম নজরে এল একটি ছোট্ট কুঁড়েঘর। বাড়িটির নির্মাণ কৌশল ছিল বহু পুরনো আমলের ফরাসি কায়দায়। কুঁড়েঘরটির সামনে দাঁড়িয়ে ছিল একজন মধ্যবয়সি স্ত্রীলোক ও একটি অল্পবয়সি কুমারী মেয়ে। সম্ভবত ছোটো মেয়েটি ওই বয়স্কা মহিলারই কন্যা হবে। মিস মোবারলি আর মিস জর্ডেন দুজনেই একটু আশ্চর্য হলেন। কারণ ওই দুজন গ্রাম্য মহিলার পরনে ছিল অতি পুরনো দিনের পোশাক-আশাক। কম করেও এক শতাব্দীর আগের পরিচ্ছদ। এসব পোশাকের চলন ১৯০১ সালে ছিল না। কিন্তু বিস্ময়ের এখানেই শেষ নয়। আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে তাঁরা একটা জিনিস লক্ষ করে বেশ চমকেই উঠেছিলেন। মেয়ে দুটির মুখে কোনো কথা ছিল না। বয়স্কা মহিলাটিকে দেখে মনে হল সে যেন হাতে একটা বালতি জাতীয় কিছু নিয়ে কোমর ভেঙে নিচু হয়ে কী যেন করছে। কিন্তু তার ওই ভঙ্গির মধ্যে জীবনের কোনো স্পন্দনই ছিল না। মনে হল কেউ যেন তাকে শাস্তি দিয়ে ওই ভাবে আজন্মকাল ধরে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। মিস জর্ডেন তো অস্ফুটে বলেই ফেললেন, দেখে মনে হচ্ছে 'ট্যাবলো ভিভাঁ'র মতো জীবন্ত কোনো প্রতিমূর্তি। কেউ যেন মোম দিয়ে জ্যান্ত মানুষের মতো প্রতিকৃতি তৈরি করে রেখেছে।

তাঁদের এই প্রথম অদ্ভুত অভিজ্ঞতাটি পরবর্তীকালে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

মেয়েদুটিকে ওই ভাবে নিশ্চল এবং নিথর অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দুজনেই বেশ হতভম্ব হয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। যখন তাঁরা ভাবছিলেন এরপর কী করবেন, ঠিক তখনই অকল্পনীয় ঘটনা ঘটতে শুরু করল। মুহূর্ত মধ্যেই সুস্পষ্ট তাঁরা অনুভব করলেন, চারিদিকের প্রকৃতির মধ্যে অভাবনীয় সব পরিবর্তন। আকাশের রং একটু আগেও ছিল নীল। হঠাৎই কেমন যেন সেই রং হয়ে উঠল বিবর্ণ হলুদ। আশপাশে সমস্ত প্রকৃতির বুকে নেমে এল রাতের নিস্তব্ধতা।

এমন একটা পরিবেশ, চারিদিক অসহ্য নিস্তব্ধ, আশেপাশে একটা জীবন্ত প্রাণি পর্যন্ত নেই, এমনকি গাছে গাছে যে সব পাখিরা ওড়াউড়ি করছিল তারাও ছবির মতো স্থির; মিস মোবারলি আর মিস জর্ডেনের মতো শিক্ষিতা দুই মহিলা রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁরা তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ওই অভিশপ্ত জায়গাটি পার হয়ে আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কয়েক পা এগিয়েই আবার থমকে দাঁড়াতে হল।

কুঁড়েঘরটার ঠিক পিছনেই ছিল একটা জঙ্গল। কিন্তু জঙ্গলটাকে দেখে তাঁদের মনে হল কে যেন থিয়েটারের জন্যে একটা চিরকালীন দৃশ্যপট এঁকে দিয়েছে। সেখানেও মৃত্যুর শীতলতা ছড়িয়ে রয়েছে। তারপর হঠাৎই তাঁরা দেখতে পেলেন মাটির একটা ছোট্ট ঢিপি। সেখানে বসে আছে একটি মাঝবয়সি লোক। লোকটির পরনে রয়েছে একটা পুরনো আমলের কালো আলখাল্লা। আর মাথায় ঢাউস টুপি।

অন্য সময়ে হলে এই লোকটিকে দেখে তাঁদের এমন কিছুই মনে হত না। কিন্তু সেই অস্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে দুজনেই তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। মনে মনে তাঁরা দুজনেই যখন ভাবছেন এখন কী করা যায় ঠিক সেই মুহূর্তে সামনের সেই বসে থাকা লোকটি হঠাৎ যেন নড়ে উঠল। অনেকক্ষণ পর এই প্রথম মৃত্যুপুরীর শীতলতায় প্রাণের স্পর্শ লাগল যেন। লোকটি বসা অবস্থায় ধীরে ধীরে ওদের দিকে ফিরে তাকাল।

ওঃ সে কী বীভৎস মুখ! আর কী জঘন্য চাউনি লোকটির। মিস মোবারলি তো আঁতকে দু-পা পিছিয়ে এলেন।

অবশ্য অত ভয়ের মধ্যেও দুজনের মনেই একটা কথার উদয় হয়েছিল। লোকটা তাঁদের দিকে তাকিয়ে ছিল বটে কিন্তু তার দৃষ্টি ঠিক তাঁদের দিকে নিবদ্ধ ছিল না। তার ওই কুৎসিত শয়তানি দৃষ্টিটা যেন বারবার বলছিল,—কেন, কেন তোমরা এখানে? তোমরা এখান থেকে যাও। পালাও এখান থেকে।

সেই মায়াময় পরিবেশে, সেই রহস্যময় বিকেলে রাস্তা হারিয়ে ফেলা দুই ইংরেজ মহিলা মনে মনে হয়তো এটাই চাইছিলেন যে এই ভয়াবহ পরিবেশ থেকে এক্ষুনি পালিয়ে যাওয়া উচিত। নইলে যে কোনো মুহূর্তে আরও ভয়াবহ কিছু ঘটে যেতে পারে।

ঠিক তখনই ঘটল আরও এক অদ্ভুত কাণ্ড। আশেপাশে কোনো জনমানবের চিহ্ন ছিল না। কিন্তু হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল আর-একজন লোক। অবশ্য এই লোকটির মধ্যে অত ভীতিজনক তেমন কিছু ছিল না। তবে লোকটি যে ভাবে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির হল তাতে মনে হল সে যেন অনেক দূর থেকে ছুটতে ছুটতে আসছে। লোকটি তখন রীতিমতো উত্তেজিত। চিৎকার করে সে বলে উঠল, 'মহাশয়ারা, আপনারা এখনও কেন এখানে দাঁড়িয়ে আছেন? আর এক মুহূর্ত এখানে দাঁড়াবেন না। আপনারা যা দেখতে চাইছেন সেটা এদিকে নয়, ওদিকে।' বলেই হাত তুলে অন্য রাস্তা দেখিয়ে দিল। মিস জার্ডেন বোধহয় কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু লোকটি সে অবকাশই দিল না।

লোকটির দেখিয়ে দেওয়া রাস্তা ধরে উভয়ে কিছুদূর এগিয়ে গেলেন। সামনেই পড়ল অতি প্রাচীন একটি গ্রাম্য সেতু। সেতুটি পার হতেই এসে পড়লেন বাগান ঘেরা একটি বাড়ির সামনে। তখন কিন্তু আর সেই আগের থমথমে অবস্থাটা ছিল না। প্রকৃতিও অনেক স্বাভাবিক। চারদিকের পরিবেশ দেখে মনে হল তাঁরা যেন কোনো ব্যারাকে এসে পড়েছেন। যে বাড়িটার সামনে এসে ওঁরা দাঁড়ালেন ওটাই সেই বিখ্যাত প্রেটিট ট্রয়ানোঁ। মেরি অ্যান্টয়নেটের সাধের বাড়ি।

অস্বাভাবিকতা পার হয়ে স্বাভাবিক এবং জাগতিক পরিবেশের মধ্যে আসতে পেরে উভয়েই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। প্রাণ ভরে প্রকৃতির নির্মল বাতাস নিলেন। কিন্তু এখানেই মিস মোবারলির জন্যে সব থেকে বেশি চমক আর বিস্ময় অপেক্ষা করে ছিল।

সবুজ ঘাসে মোড়া শান্ত লনটির দিকে চোখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিলেন দুজনেই। সামনেই প্রেটিট ট্রায়ানোঁ। মেরি অ্যান্টয়নেটের প্রিয় আবাসস্থল। ঐতিহাসিক মূল্যেও এ স্থান বেশ উল্লেখযোগ্য। সহসা, বিকেলের অর্ধম্রিয়মান আলোয় চমকে উঠলেন মিস মোবারলি। কোনো ভুল ছিল না তাঁর দেখায়। বিকেলের আলোয় দৃশ্য অপেক্ষাকৃত কম উজ্জ্বল হলেও মিস মোবারলির চোখের দৃষ্টি খুবই প্রখর। তিনি দেখলেন বাড়ির দিকে পিছন ফিরে এক সুবেশা রমণী ছোট্ট একটি টুলের ওপর বসে আছেন। তাঁর হাতে ধরা একটি কাগজ। বাঁ হাতটিকে সোজা টান টান রেখে কাগজটি চোখের সামনে ধরে আছেন। দেখে

মনে হচ্ছিল তিনি যেন ছবি আঁকার স্কেচ করছেন। মিস মোবারলি বেশ আশ্চর্য হলেন। এই পরিবেশে এখন একজন মহিলাকে একা একা বসে থাকতে দেখা একটু অস্বাভাবিক। কনুই-এর ঠেলা দিয়ে তিনি পাশে দাঁড়ানো মিস জর্ডেনকে বললেন, 'কী ব্যাপার বলো তো? এমন এক নির্জন জায়গায় ওই মহিলা একা একা বসে কী করছেন?'

মিস জর্ডেন বেশ অবাক হয়ে চারদিক দেখে বললেন, 'কার কথা বলছেন মিস মোবারলি? কে বসে আছেন?

'সে কী, তুমি দেখতে পাচ্ছ না? ওই তো এক মহিলা ওখানে বসে কিছু বোধহয় আঁকছেন।

'আপনি যে কী বলছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি তো কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না। তবে...হ্যাঁ, হ্যাঁ, আবছা মতো একটা কিছু ওখানে রয়েছে বলে মনে হচ্ছে?'

'আবছা! কী বলছ তুমি? তোমার কি চোখের দৃষ্টি শক্তি কমে গেছে! আমি তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ওই তো, ওই তো উনি আমাদের দিকে মুখ ফেরালেন—ওঃ ঈশ্বর! এ আমি কী দেখছি—উনি, উনি তো মেরি অ্যান্টয়নেট—'

মিস মোবারলি পরবর্তীকালে তাঁর জবানবন্দিতে বলেছিলেন, 'সেই অভিশপ্ত বিকেলে আমি যা দেখেছিলাম তা বিস্ময়ের হলেও বেশ স্পষ্ট।

এই ঘটনার কিছু পরেই মিস মোবারলি এবং মিস জর্ডেনের আর সেখানে দাঁড়াবার মতো মানসিক ক্ষমতাই ছিল না। তাঁরা চটপট বাগান সংলগ্ন বাড়িটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। এমন সময় বাড়ির ভেতর থেকে খুব প্রাণবন্ত এবং হাসিখুশি ভরা এক তরুণ এসে তাঁদের সামনে দাঁড়াল। জিজ্ঞাসা করল তাঁরা কোথায় যেতে চান। তরুণটিই শেষ পর্যন্ত তাঁদের প্রেটিট ট্রায়ানোঁর প্রধান ফটকের কাছে নিয়ে যায়। কিন্তু সেখানকার পরিবেশ সম্পূর্ণ অন্যরকম। এই যে এতক্ষণের দেখা অলৌকিক সব কাণ্ডকারখানা তার কোনো চিহ্নই ছিল না। প্রেটিট ট্রয়ানোঁর প্রধান ফটক পার হতেই তাঁরা দেখলেন হাসিখুশি ভরা বহু দর্শনার্থীর ভিড়। সেই মুহূর্তে তাঁদের মনে হয়েছিল মৃত্যুপুরী থেকে তাঁরা ফিরে এসেছেন।

মেরি অ্যান্টয়নেটের ঐতিহাসিক বাড়ি দেখে একসময় ওঁরা দুজনে অন্যান্য দর্শনার্থীদের সাথে নির্বিঘ্নে ফিরে এসেছিলেন প্যারিসে।

এই ঘটনার সপ্তাহকাল পরেও মিস মোবারলিকে বেশ চিন্তাচ্ছন্ন এবং ভারাক্রান্ত দেখাত। তাঁকে দেখে মনে হত তিনি সর্বদাই কী যেন ভাবেন। এমনকি মনের ভার হালকা করার জন্যে তিনি ইংলন্ডে তাঁর বোনকে সবকিছু জানিয়ে চিঠিও লিখেছিলেন।

একদিন কথায় কথায় মিস জর্ডেনকেও জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আচ্ছা জর্ডেন, তোমার কি মনে হয় প্রেটিট ট্রায়ানোঁর বাড়িটা ভূতুড়ে বাড়ি? মিস জর্ডেন এক কথায় উত্তর দিয়েছিলেন, 'হ্যাঁ মিস মোবারলি। কোনো সন্দেহ নেই ও বাড়িতে ভূত আছে।'

এরপর ওই দুই ইংরেজ মহিলা অনেকদিন ধরে সেদিনের ঘটনার মানে খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন। পুরনো দিনের শোনা সব ভূতের গল্পের সঙ্গে নিজেদের অভিজ্ঞতা বার বার মিলিয়ে দেখেছিলেন। তাঁরা দুজনেই একমত হয়েছিলেন যে সেদিন তাঁরা যা দেখেছিলেন তাতে তাঁরা দুজনেই একই সঙ্গে ভয়চকিত হয়েছিলেন। দুজনেই সেই বিকেলে একই সঙ্গে এক অজানা শিহরণে শিহরিত হয়েছিলেন। এমনকি দুজনে আলাদা আলাদাভাবে নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা লিখেছিলেন। পরে মিলিয়ে দেখেছিলেন দুজনের বক্তব্য আর অভিজ্ঞতা হুবহু এক। সেদিনটা ছিল ১০ই আগস্ট। পুরনো ইতিহাসে ওই দিনটার একটি ঐতিহাসিক ঘটনাও তাঁরা পেয়েছিলেন। ১০ই আগস্ট ১৭৯২ সাল। রাজার সুইস রক্ষীদল সেদিন সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়েছিল যার ফরে আর রাজার পক্ষে নিজের রাজতন্ত্রবাদ বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি।

এরপর তাঁরা দুজনে তাঁদের পূর্ব অভিজ্ঞতা স্মরণ করে এবং মেরি অ্যান্টয়নেটের জীবন ইতিহাসের সঙ্গে মিল ঘটিয়ে লিখলেন একটি বই। বইটির নাম দিলেন— 'অ্যান অ্যাডভেঞ্চার'।

'অ্যান অ্যাডভেঞ্চার' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১১ সালে। আর ওই একই বছরে বইটির এডিসন হু হু করে বিক্রি হয়ে যায়।

ভূত যখন বন্ধু হয়

ভূতেরা বন্ধু হয় এমন কথা ভাবতেও অবাক লাগে। আমাদের ছোটো থেকে একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে ভূত মাত্রেই মানুষের শত্রু। আমরা অনেক গল্পে দেখেছি ভূত কেমন ভাবে তার প্রতিহিংসা গ্রহণ করে। কেমন করে তার

জীবিত কালের শত্রুকে মৃত্যুর পর তাকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করে। কিন্তু এর ব্যতিক্রমও আছে। একটি গল্পে তার সামান্য দৃষ্টান্ত আছে। রণক্ষেত্রে মৃত এক সৈনিকের ভূত সেখানে সিজারকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে নির্দেশ দিয়েছিল। এবং সেই যুদ্ধে সিজারের জয় হবেই এমন ভবিষ্যতবাণীও করে গিয়েছিল। পরম বন্ধুর মতো ভূত সেখানে পথের সন্ধান দেখিয়েছে। আমাদের এবারের গল্প আর এক বন্ধুভূতের। ভূত এখানে পরম হিতৈষীর মতো এক নরপতিকে ইঙ্গিত দিয়েছে তার আসন্ন বিপদের। যদিও সে রাজাকে বিপদের হাত থেকে বাঁচাতে পারেনি তবুও তার উপদেশ মতো কাজ করে রাজা সাময়িক অব্যাহতি পেয়েছিলেন। কিন্তু ভবিতব্যের হাত থেকে রাজা শেষ পর্যন্ত নিষ্কৃতি পাননি। কে-ই বা পায়?

তখন ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম চার্লস। চার্লসের রাজত্বকাল বেশ অশান্তিতেই কেটেছিল। এর কারণ চার্লসের রাজনীতি। চার্লস মনে করতেন রাজা ঈশ্বরের প্রতিভূ। ঈশ্বরই রাজাকে প্রেরণ করেন এবং রাজাই পারেন ঈশ্বরের বিধান মতো রাজ্যশাসন করতে। চার্লস তাঁর সংস্কারে ছিলেন ভীষণ একগুঁয়ে। ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে তিনি গির্জা প্রভৃতির মধ্যেও রাজকীয় আড়ম্বর আনতে চেয়েছিলেন। গির্জা ইত্যাদি ধর্মীয় স্থানে রাজকীয় আসবার এবং বিলাসবহুল সামগ্রীর জোগান দিতে গিয়ে বহু অর্থের প্রয়োজন হয়ে পড়ল। অর্থের সংকুলান করতে গিয়ে চার্লসকে নিত্যনতুন কর চাপাতে হল রাজকোষ ভরতি করার জন্য। করভারে পীড়িত মানুষ তখন প্রায় খেপে গেল। কমনস সভাও ছিল এর বিরোধী। তারা চিৎকার করে জানাল রাজার প্রবর্তিত এই করনীতি বে-আইনি। ফলে রাজার সঙ্গে কমনস সভার লাগল বিরোধ।

১৬২৯ সালে চার্লস তাঁর রাজ্যসভা ভেঙে দিলেন। তারপর রাজ্যসভা ছাড়াই এগারো বছর তিনি নিজের খুশিমতো রাজত্ব চালালেন। রাজকীয় অত্যাচারে সাধারণ মানুষের জীবন বিব্রত হয়ে উঠল। দেশের চারিদিকের মানুষ, বিশেষ করে পিউরিটান গোষ্ঠীর লোকেরা বিদ্রোহী হয়ে উঠল। কারণ রাজার ধর্মীয় সংস্কার পিউরিটান গোষ্ঠীর বিরুদ্ধেই কার্যকরী হয়েছিল। এ ছাড়াও আমদানিকৃত জিনিসের ওপর প্রচুর শুল্ক চাপানোর ফলে ব্যবসায়ী মহলও হয়েছিল ক্ষুব্ধ। বলপূর্বক ঋণদানও সাধারণ মানুষের রাগের আরও একটি বড়ো কারণ হয়ে উঠল। দেশের চারদিকে যখন বিক্ষোভ ভয়ংকর আকার ধারণ করল তখন রাজা বাধ্য হলেন আবার রাজ্যসভার অধিবেশন ডাকতে। রাজার ধর্মীয় নীতির বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহের পুরোধায় ছিল স্কটল্যান্ডবাসীরা। বিদ্রোহ যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে

পৌঁছল তখন চার্লস বাধ্য হলেন রাজ্যসভার অধিবেশন ডাকতে। অবশেষে ১৬৪০ সালে যে পার্লামেন্টের অধিবেশন বসল সেই অধিবেশনে সদস্যরা একযোগে রাজাকে নমনীয় না হলে তাঁকে কোনো ভাবেই সাহায্য করবে না এমন কথাও জানিয়ে দিল।

কিন্তু চার্লস ছিলেন বরাবরই একগুঁয়ে এবং দাম্ভিক। তিনি সদস্যদের স্পর্ধা মেনে নিতে পারলেন না। এবং রাজ্যসভা সঙ্গে-সঙ্গেই ভেঙে দিলেন।

স্কটল্যান্ডের বিদ্রোহীরাও রাজার এই স্বেচ্ছাচারিতা মেনে নিল না। তারা একযোগে বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি করে রাজাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। ফলে চার্লস বাধ্য হলেন আবার পার্লামেন্ট ডাকতে। এই পার্লামেন্ট অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। ১৬৪০ থেকে ১৬৫৩ সাল পর্যন্ত। ইংল্যান্ডের ইতিহাসে এই পার্লামেন্টের গুরুত্ব অনেকখানি। এই পার্লামেন্ট অনেক প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিল।

যাই হোক আমাদের লক্ষ্য ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টের বা চার্লসের ইতিহাস নয়। ঐতিহাসিক এক প্রেত কী ভাবে প্রথম চার্লসকে তাঁর বিপদের আভাস দিয়েছিল এ কাহিনির গল্প তাই নিয়েই। চার্লসের জীবনের দুরবস্থার কথা বলার কারণ তাঁর আত্মম্ভরিতা, তাঁর অবিবেচকতা এবং ধর্মান্ধতাই যে তাঁর শোচনীয় পরিণতি ঘটিয়েছে এটুকু বোঝার সুবিধে হবে বলেই এই ইতিহাস কথন।

পার্লামেন্টের সঙ্গে রাজার বিরোধের অনেক কিছুর মীমাংসা হলেও একটা ব্যাপারে দ্বন্দ্ব প্রবল হয়ে উঠল। পার্লামেন্ট চেয়েছিল বিশপের ক্ষমতা হ্রাস করতে। আমাদের দেশে যেমন পুরোহিতদের অত্যাচারে সাধারণ মানুষ—বিশেষ করে নীচজাতীয় লোকেরা চিরকালই অত্যাচারিত হয়েছে ঠিক সেই রকমই চার্লসের আমলে বিশপদের একচেটিয়া ক্ষমতা সাধারণ মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করত। বিশপরা ছিলেন রাজার হাতের পুতুল। আর ধর্মের নামে বিশপেরা রাজার ইচ্ছাকে যেমন খুশি তেমনভাবে চালিয়ে দিতেন। তাই রাজা বিশপের ক্ষমতা হ্রাস করতে চাইলেন না কিছুতেই। অবশ্য পার্লামেন্টের অনেক সদস্যই রাজার পক্ষেও মত দিলেন। এর মধ্যে আবার অনেকে মনে করলেন রাজার ক্ষমতা সম্পূর্ণ নষ্ট করে পার্লামেন্টের ক্ষমতা বাড়ানো দেশের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক। আবার পার্লামেন্ট বাদ দিয়ে রাজাকে একাধিপত্য দেওয়াও অত্যন্ত কুফল দায়ক। এর ফলে দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল সমস্ত সৈন্যদল। ১৬৪২ সালে রাজা তৈরি করলেন নিজস্ব সেনাবাহিনী। পার্লামেন্টও বসে ছিল না। তারা তৈরি করল নিজেদের বাহিনী। শুরু হল গৃহযুদ্ধ। এজহিলের রণাঙ্গনে মুখোমুখি হল দু-পক্ষ।

পার্লামেন্টের বাহিনীর অধিনায়ক হলেন ওলিভার ক্রমওয়েল। তাঁর নেতৃত্বে ১৬৪৫-এ গৃহযুদ্ধ ভীষণ আকার ধারণ করল। প্রায় পাঁচ হাজার পদাতিক এবং বিপুল সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে চার্লস নর্দাম্পটনে এসে হাজির হলেন। চারদিকে তখন যুদ্ধের বীভৎসতা ছড়িয়ে পড়েছে। যে সমস্ত সৈন্যরা একদা একই সঙ্গে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ শিখেছে—একই সঙ্গে দিনের পর দিন পাশাপাশি সুখে-দুঃখে কাটিয়েছে একই শিবিরে, এক সর্বনাশা গৃহযুদ্ধে তারা হয়ে পড়ল পরস্পরের শত্রু। সুযোগ পেলেই একে অপরকে নিধন করার যজ্ঞে মেতে উঠল।

বোধ হয় গৃহযুদ্ধ এমনই ভয়াবহ। সেখানে ভাই বন্ধু আত্মীয়-স্বজন কখন যে পর হয়ে যায় কেউ বলতে পারে না। এক সর্বনাশা ধ্বংসের খেলায় মানুষ তখন পশুতে পরিণত হয়ে যায়।

শিপ স্ট্রিটের সুইটসেফ হোটেলে রাজা তাঁর শিবির তৈরি করেছেন। সেখানে বসেই তিনি পরামর্শ করছেন যুদ্ধ কীভাবে চালাবেন। ক্রমওয়েলের বাহিনীকে কীভাবে পর্যুদস্ত করবেন সেই নিয়ে ঘন ঘন বৈঠক বসাচ্ছেন। ভবিষ্যত রণনীতি কী হবে তা নিয়েও বেশ সময় অতিবাহিত হয়েছে। তারপর সভা শেষে রাজা গেলেন শুতে। মানসিক এবং দৈহিক দুই ভাবেই রাজা তখন ক্লান্ত। বিছানায় শোবার সঙ্গে-সঙ্গেই ঘুমে তাঁর চোখের দু-পাতা জুড়ে এল।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলেন কে জানে! হঠাৎ একটা অস্পষ্ট খসখসে আওয়াজে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। প্রথমটায় তিনি তেমন কিছু বুঝতে পারলেন না। আসলে তখনও তাঁর ঘুমের রেশ কাটেনি। চোখে তন্দ্রাও লেগে আছে। এরই মধ্যে প্রায় অন্ধকার ঘরে শুনতে পেলেন কে যেন ঘরের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যুদ্ধের সময়। গোপনে তাঁর ঘরে শত্রুপক্ষের কারও আসাও বিচিত্র নয়। বিছানার পাশে রাখা নিজের তলোয়ারটা নিমেষের মধ্যে টেনে নিলেন। তারপর মনে সাহস এনে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে, কে তুমি? এত রাতে আমার ঘরে কী করতে এসেছ?'

রাজা যেন হাওয়ার সঙ্গে কথা বললেন। কারণ কেউই তাঁর প্রশ্নের কোনো উত্তর দিল না। কিন্তু স্পষ্ট বোঝা গেল কেউ যেন তাঁর শয্যার চারপাশে হেঁটে বেড়াচ্ছে। আর সুযোগ দেওয়া সমীচীন নয় ভেবে রাজা তলোয়ার নিয়ে বিছানায় উঠে বসতে গেলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল ফিসফিস স্বরে আগন্তুক তাঁকে যেন কিছু বলতে চাইছে। আওয়াজটা কেমন যেন ফ্যাসফেঁসে আর হিসহিসে ধরনের।

রাজা অধৈর্য হয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে তুমি? কী বলতে চাইছ এত রাতে, আমার ঘরে এসে?'

আবার সেই হিসহিস শব্দ। এবারও রহস্যময় কিন্তু খানিকটা স্পষ্ট। রাজা

কান পেতে শব্দটার মানে বুঝতে চাইলেন। আগন্তুক হঠাৎ তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। লোকটাকে চাক্ষুষ দেখা যাচ্ছিল না কিন্তু একটা অশরীরী উপস্থিতি তিনি ঠিকই টের পাচ্ছিলেন।

আবার হিসহিস শব্দ হতেই রাজা স্পষ্ট শুনতে পেলেন, সেই ছায়া ছায়া মূর্তি বলছে, 'আমাকে চিনতে পারছ না রাজা? আমি তোমার বন্ধু।'

'বন্ধু? কিন্তু কে তুমি? কী তোমার নাম? বন্ধুই যদি হবে তাহলে আলোটা জ্বালাও। সামনে এসে দেখা দাও।'

রাজা বোধহয় আলো জ্বালাবার জন্য উঠতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সেই ছায়ামূর্তি বাধা দিল, 'আলো জ্বালিয়ো না। আলো জ্বালালে আমি এখানে থাকতে পারব না।'

'বেশ। আলো জ্বালাব না। কিন্তু তোমার পরিচয়টা দাও।'

'আমি স্ট্রাফোর্ড।'

'স্ট্রাফোর্ড? কী আশ্চর্য? সে তো অনেকদিনই মারা গেছে।'

'হ্যাঁ। তোমার জন্যেই আমি মারা গিয়েছিলাম। জীবিতকালে আমি সর্বদাই তোমার বন্ধু ছিলাম। সর্বদাই তোমাকে আমি সুপরামর্শ দিতাম।'

'আমি তো সে কথা অস্বীকার করিনি। চারিদিকে আমার অনেক শত্রুর মধ্যে তুমিই ছিলে আমার যথার্থ বন্ধু। রাজপরিবারের জন্য তোমার আত্মত্যাগ আমি ভুলিনি বন্ধু।'

'চার্লস, তোমার নিশ্চয় মনে আছে তোমার রাজতন্ত্রের নীতি-প্রতিষ্ঠার জন্য যারা যারা আত্মত্যাগ করেছে—তাদের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম প্রাণ দিই।'

'যতদিন বাঁচব সেকথা আমি মনে রাখব। এ যুদ্ধে জয়লাভ করলে তোমার জন্যে আমি স্মৃতিসৌধ স্থাপন করব রাজকীয় মর্যাদায়।'

'কিন্তু' বলেই হঠাৎ স্ট্রাফোর্ড চুপ করে গেল। তারপর বেশ কিছুক্ষণ আর কোনো শব্দ নেই। রাজাও অধৈর্য হয়ে পড়েছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিন্তু কী? তুমি চুপ করে গেলে কেন বন্ধু? বলো তুমি কী বলতে চাইছিলে?'

আবার ধীরে ধীরে সেই ফ্যাসেফেঁসে আওয়াজটা ভেসে এল। 'জীবিত অবস্থায় আমি যেমন তোমার বন্ধু ছিলাম মৃত্যুর পরও, আমার প্রেতাত্মা এখনও তোমার বন্ধুই আছে। তুমি একটু আগে বলেছিলে না আমার জন্যে স্মৃতিসৌধ স্থাপন করে দেবে। রাজা, তুমি আর কোনোদিনও সে সুযোগ পাবে না।'

রাজা যেন আর্তনাদ করে উঠলেন, 'কী বলছ স্ট্রাফোর্ড?'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলছি, স্থূল দেহে তোমরা যা দেখতে পাও না, সূক্ষ্মদেহে আমরা

ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান, সব কিছুই দেখতে পাই। আমি বন্ধু হিসেবেই তোমাকে বারণ করতে এসেছি—এ যুদ্ধ বন্ধ করো।'

'না, না তা হয় না। আমি রাজা চার্লস। ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি। আমরা শরীরে রাজরক্ত বইছে। সামান্য এক ক্রমওয়েলের দম্ভ আমি সহ্য করব না। তাকে আমি ধ্বংস করে ছাড়ব।'

'পারবে না বন্ধু। তুমি তা পারবে না। আর কোনোদিনও তোমার পক্ষে তোমার প্রবর্তিত রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে না। মৃত্যুর পর আমি জেনেছি একনায়কতন্ত্রের দিন ফুরিয়ে আসছে। ক্রমওয়েল সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি। ওকে হারানো তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি তোমাকে এও বলে রাখছি জীবনে আর কোনোদিনও কোনো যুদ্ধে তুমি জয়লাভ করতে পারবে না। তাই বলছি বন্ধু—আপোষে সব কিছুর মীমাংসা করে নাও।'

কথাগুলো বলেই লর্ড স্ট্রাফোর্ডের ভূত যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। এরপর রাজা শূন্য বিছানায় অনেকক্ষণ একা একা বসে রইলেন। একটু আগের সব কিছু ভালোভাবে তলিয়ে দেখলেন। তারপর হঠাৎ তাঁর মনে হল এ সবই অলীক এবং দুঃস্বপ্ন। মুখে চোখে ঠান্ডা জল দিয়ে আবার তিনি শুয়ে পড়লেন।

সেই রাতেই, বোধহয় ভোর রাতেই আবার স্ট্রাফোর্ডের আত্মা তাঁকে দেখা দিল। পূর্বের কথাগুলি আবারও তাঁকে জানিয়ে সাবধান করে দিল। এবার আর রাজা দুঃস্বপ্ন বলে উড়িয়ে দিতে পারলেন না। তিনি ঠিক করলেন স্ট্রাফোর্ডের আত্মার উপদেশ গ্রহণ করবেন।

তিনি আর যুদ্ধে অগ্রসর হলেন না। ১৬৪৫ এর ১৪ই জুন জেসবিতে ক্রমওয়েলের বাহিনীর কাছে চার্লস প্রচণ্ডভাবে পরাজিত হলেন। তারপর ১৬৪৬ এর গোড়ায় তিনি ক্রমওয়েলের কাছে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হলেন।

স্ট্রাফোর্ডের প্রেতাত্মা বন্ধুর কাজই করেছিল। রাজাকে সসৈন্যে বিনষ্ট হওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। কিন্তু ভবিতব্য খণ্ডন করা যায় না। তা মেনে নিতেই হবে। রাজা প্রথম চার্লসকেও তাঁর নির্দিষ্ট ভাগ্য মেনে নিতে হল।

প্রায় তিন বছর পর পার্লামেন্টে রাজার বিচার চলল। বিচারের শেষে রাজাকে পার্লামেন্টে চুক্তিবদ্ধ হবার নির্দেশ দিল। কিন্তু রাজরক্তের দম্ভ কাটিয়ে উঠতে পারলেন না চার্লস। ভুলে গেলেন বন্ধু স্ট্রাফোর্ডের প্রেতাত্মার সাবধান বাণী। স্ট্রাফোর্ডের প্রেত রাজাকে মীমাংসায় আসতে বলেছিল। রাজা তা শুনলেন না। তিনি স্পষ্ট জানালেন, তিনি রাজা। তিনি সর্বশক্তিমান। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কোনোরকম কোনো চুক্তিতে আসা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এবং গোপনে তিনি নিজের সৈন্যদলকে সাজাতে শুরু করলেন পুনর্বার যুদ্ধের জন্য।

ক্রমওয়েল রাজাকে আর বিশ্বাস করতে পারলেন না। তাঁর শক্তি তখন অনেক বেড়ে গেছে। যাঁরা পার্লামেন্টে রাজার সপক্ষে ছিলেন তাঁদেরকে তিনি বিতাড়িত করলেন। আর 'রাম্প' নামে পরিচিত পার্লামেন্টের বাকি সদস্যরা রাজাকে পুনর্বিচারে বসালেন এবং শেষ পর্যন্ত রাজাকে স্বৈরাচারী ও দেশের পরমশত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করলেন। শেষ বিচারে ১৬৪৯ সালে রাজাকে গদিচ্যুত করে তাঁর মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হল। ১৬৪৯ সালেই তাঁর শিরশ্ছেদ করা হয়।

স্ট্রাফোর্ডের প্রেত অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে রাজাকে বাঁচাতে চেয়েছিল। প্রেত বলে গিয়েছিল পার্লামেন্টের সঙ্গে একটা মীমাংসায় আসতে। কিন্তু অহংকারী রাজরক্ত পরমবান্ধবের হিতোপদেশ কানে তোলেনি। তাহলে হয়তো ইতিহাসের ধারাটাই পালটে যেত—হয়তো অন্য কিছু হত...।

এথেন্সের শেকল বাঁধা ভূত

সে অনেক দিন আগের কথা। তখনও যিশু খ্রিস্টের জন্ম হয়নি। আড়াই কি তিন হাজার বছর হবে। প্রাচীন গ্রিসে এথেন্স বলে একটা জায়গা ছিল। এথেন্স কিছু অপরিচিত নাম নয়, সবাই এর নাম শুনেছে। সেই এথেন্সেরই একটা পাহাড় ঘেরা ছোট্ট গ্রামে এক জঙ্গলের মধ্যে পুরনো একটা বাড়ি ছিল। বাড়িটা অবশ্য অনেক দিন ধরেই খালি পড়েছিল। একে তো নির্জন পাহাড়ি অঞ্চল। তার ওপর ঘন জঙ্গল দিয়ে ঘেরা পরিবেশ। তায় পরিত্যক্ত। লোকজনও না থাকলেও বাড়িটা কিন্তু খুব একটা ভাঙাচোরা অবস্থায় ছিল না। অর্থাৎ ইচ্ছে করলে পরিষ্কার করে বা সামান্য সাজিয়ে-গুছিয়ে নিলে লোকে অনায়াসেই সেখানে বসবাস করতে পারত। আসলে সবাই কি আর লোকজনে ঠাসা ভিড় হই-হট্টগোলের মধ্যে বাস করতে পছন্দ করে? অনেকেই নির্জন শান্ত পরিবেশে নিজের মতো করে থাকতে ভালোবাসে।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার ওই বাড়ির যে মালিক সে কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও

অনেকদিন পর্যন্ত কাউকে ওই কুঠিটা ভাড়া দিতে পারেনি। আসলে পাহাড়ের উপর নির্জন জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত কুঠিটার বেশ বদনাম হয়ে গিয়েছিল। একবার এক শান্তিপ্রিয় ভদ্রলোক কুঠিটা দেখে লোভ সামলাতে পারেননি। তিনি ছুটির অবকাশ কাটাবার জন্য ওই নির্জন কুঠিটাকে বেছে নিয়েছিলেন কয়েকদিন শান্তিতে কাটাবেন বলে। কিন্তু পরদিন সকালে দেখা গেল লোকটির মৃতদেহ পড়ে আছে কুঠির দালানে। প্রথম প্রথম ব্যাপারটা নিয়ে তেমন কেউ মাথা ঘামায়নি। তবে যারা তাঁর মৃতদেহ দেখেছিল তাদের মধ্যে কিছু সন্দেহ দানা পাকিয়েছিল। কারণ মৃত্যুর পরেও লোকটির চোখে-মুখে একটা অস্বাভাবিক ভয় লগে ছিল। আর চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল। কিন্তু, পরে, মানে বেশ কিছুদিন পর আর-একজন সৈনিক ধরনের লোক সেই বাড়িতে এসেছিল রাত কাটাতে। লোকটি ছিল অসম্ভব সাহসী। সেই লোকটি প্রাণে মরেনি ঠিকই, কিন্তু তার মুখ থেকে রাত্রির অভিজ্ঞতা যা শোনা গিয়েছিল তা ছিল রীতিমতো ভয়াবহ। খাওয়া-দাওয়া সেরে রাত্রে সবে সে শুতে গিয়েছিল এমন সময় সে হঠাৎ দেখতে পেল ছাই রঙের দাড়িওয়ালা ইয়া চেহারার বিশাল এক বুড়ো হাতে-পায়ে শেকল লাগানো অবস্থায় ঘুমন্ত সৈনিকের সামনে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। তার মুখ থেকে কেমন এক ধরনের গোঁ গোঁ আওয়াজ বেরুচ্ছিল। সৈনিক পুরুযটি মারা যায়নি। কিন্তু অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। পরদিন জ্ঞান ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে সে সেই কুঠি ছেড়ে পালিয়ে এসেছিল। সৈনিকটির মুখে সব কথা শোনার পর সারা গ্রামে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। এমনকি দিনের বেলাতেও আর কোনো সাহসী লোক ওই কুঠির ত্রিসীমানায় পা বাড়াত না। কুঠির মালিক যে ছিল সে লোকটি কুঠিটা ভাড়া দিয়ে নিজের সংসার চালাত। কিন্তু যে মুহূর্তে ওই ধরনের একটা ভূতুড়ে প্রবাদ ছড়িয়ে পড়ল তারপর থেকে আর কেউই কুঠিটা ভাড়া নিয়ে কয়েকদিন থাকার কথা ভাবতেও পারত না। ফলে হল কী কুঠিটা সবার কাছে 'ভূতকুঠি' নামে পরিচিত হয়ে গেল। কেই-বা সাধ করে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে যাবে? শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই জলের দরে কুঠিটা বিক্রি করে দিতে চাইল কুঠির মালিক। কিন্তু কিনবে কে? শখ করে ভূতের হাতে প্রাণ খোয়াতে কেউ রাজি নয়।

তবু একজন রাজি হল। কুঠির মালিক একজন খদ্দের পেল্লো। লোকটি ছিলেন তখনকার দিনে একজন নামকরা দার্শনিক। দার্শনিক মানুষেরা সাধারণত নির্জন জায়গায় থাকতেই ভালোবাসেন। লোকমুখে কুঠিটার অপবাদের কথা তাঁরও কানে এসেছিল। কিন্তু দার্শনিক ভদ্রলোক মনে-প্রাণে কোনো অলৌকিক

ব্যাপার বিশ্বাস করতে চাইতেন না। তিনি ভাবলেন বাড়িটায় গিয়ে তিনি উঠবেন। মানুষের মধ্যে ভূতের ভয়ে অযৌক্তিক সংস্কারকে উড়িয়ে দিতে চাইলেন। কুঠির মালিকের কাছে গিয়ে তিনি কুঠিটি কেনার বাসনা জানালেন। মালিক তো হাতে স্বর্গ পেলেন। তিনি ধরেই নিয়েছিলেন এমন ভূতুড়ে বাড়ি কোনোদিনও ভাড়া বা বিক্রি হবে না। তাই দার্শনিক ভদ্রলোকের প্রস্তাব শুনে মালিক আকাশ থেকে পড়লেন। বলে কী এই বুড়ো, ভাড়া নয় একেবারে কিনতে চাইছেন? অত্যন্ত কম দামে তিনি সঙ্গে সঙ্গে কুঠিটি বিক্রি করে হাঁফ ছাড়লেন।

আগেই বলেছি যুক্তি ছাড়া দার্শনিক চলেন না। যা চোখে দেখা যায় না, হাত দিয়ে যাকে ছোঁয়া যায় না অথবা অন্তর দিয়ে যাকে উপলব্ধি করা যায় না তেমন কিছুতে তাঁর বিশ্বাস আসবে কেন?

নিজের সব জিনিসপত্তর নিয়ে গিয়ে উঠলেন সদ্য কেনা সেই বাড়িটায়। সারা দিন ধরে নিজের হাতে সব কিছু সাজালেন। নিজের হাতেই তাঁকে সব কিছু করতে হয়েছিল, তার কারণ বাড়িটার ভূতুড়ে কাণ্ডকারখানা নিয়ে এমন সব গল্পগুজব তৈরি হয়েছিল যে তিনি অনেক বেশি পয়সার লোভ দেখিয়েও কোনো চাকর-বাকর পাননি।

যাই হোক, সারাদিন পরিশ্রমের পর দার্শনিক ভদ্রলোক বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। খুব একটা খাওয়া-দাওয়ার ইচ্ছেও ছিল না। সামান্য রুটি-মাংস আর কফি দিয়ে রাতের আহার শেষ করলেন। তারপর গিয়ে শুলেন তাঁর ছোট্ট বিছানায়। মাথার কাছে বিশাল সেকেলে ধরনের একটা জানালা ছিল। সেটাও খুলে রাখলেন। গরমের দিন। সন্ধেরাতের ফুরফুরে হাওয়া বইছিল। দেহেও ছিল অত্যন্ত ক্লান্তি। বাতি নিবিয়ে শোবার সঙ্গে সঙ্গে দু-চোখের পাতায় নেমে এল রাজ্যের ঘুম।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলেন কে জানে! হঠাৎ একটা অদ্ভুত আওয়াজ আর অস্বস্তির মধ্যে তাঁর ঘুমটা গেল ভেঙে। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন মানুষের হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে সামান্য সময় লাগে প্রকৃতিস্থ হতে। দার্শনিক ভদ্রলোকেরও সামান্য সময় লাগল তিনি কোথায় আছেন, কেমনভাবে আছেন এটুকু বুঝতে। তারপর তাঁর সব কিছু একে একে মনে পড়ে গেল। তাঁর মনে পড়ল তিনি এসেছেন এক নতুন বাড়িতে। আর এই নতুন বাড়িতেই তাঁর প্রথম রাত্রিবাস। কান খাড়া করে অদ্ভুত আওয়াজ আর অস্বস্তিটা তিনি বোঝার চেষ্টা করতে চাইলেন। মিনিট দুই-তিন মড়ার মতো বিছানায় শুয়ে থেকে তিনি বুঝলেন আওয়াজটা অনেকটা শেকলের ঝনঝন আওয়াজের মতো। কিন্তু খুব স্পষ্ট নয়। কে যেন অনেক দূর থেকে

শেকল টেনে টেনে আসছে। ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালেন। জমাট অন্ধকার সারা ঘরে ছড়িয়ে আছে। মাথার কাছে জানালা দিয়ে কেবল আকাশটুকু দেখা যায়। অবশ্য সেই সময় আকাশটাকে আলাদা করে চেনা যাচ্ছিল না। আকাশের রং আর ঘরের রং এক হয়ে গিয়েছিল। দার্শনিক ভদ্রলোক কিন্তু চট করে বিছানা ছেড়ে উঠে বসলেন না। তিনি লক্ষ করতে চাইলেন ব্যাপারটা কী? আরও একটা জিনিস তিনি অনুভব করলেন। সমস্ত ঘরের বাতাস যেন স্তব্ধ হয়ে আছে। একটা দম বন্ধ করা গুমোট পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

অনেকটা সময় যখন এইভাবে কেটে গেল, আর জমাট বাঁধা অন্ধকারটা যখন ধীরে ধীরে সয়ে এল, হঠাৎই তিনি আবিষ্কার করলেন হাতে পায়ে শেকল বাঁধা একটা অশরীরীর হাল্কা ছায়া মূর্তি আস্তে আস্তে ভেসে উঠছে। হাত নেড়ে সেই ছায়ামূর্তিটা কী যেন বলতে চাইছে। মূর্তিটার দুটো চোখ আর মুখের হাঁ থেকে জ্বলন্ত আগুনের আভা ঠিকরে বেরুচ্ছে।

দার্শনিক ভদ্রলোক ছিলেন প্রচণ্ড সাহসী। ভৌতিক কিছুতে তাঁর তেমন বিশ্বাস বা সংস্কার কিছুই ছিল না। তবু, ভয় না পেলেও, একটা অদ্ভুত বিস্ময় তাঁকে কিছুক্ষণের জন্য আচ্ছন্ন করে রাখল।

তিনি বুঝতে চাইলেন, এটা কী? কোনো ভয়ংকর দানব নাকি কোনো অসৎ মানুষ ওইভাবে সাজগোজ করে তাঁকে ভয় দেখাতে চাইছে?

শুয়ে শুয়ে এইসব নানান যুক্তি তর্ক যখন তাঁর মনে ঝড় তুলেছে তখনই তিনি দেখলেন সেই হাতে-পায়ে শেকল পরা ছায়া ছায়া মূর্তিটা ধীরে ধীরে তাঁরই দিকে এগিয়ে আসছে। শেষ পর্যন্ত মূর্তিটা তাঁর একেবারে খাটের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। দু-চোখ আর মুখের গহ্বর থেকে তখনও সেই লাল আগুনের আভাটা ঠিকরে পড়ছিল। সে যেন মুখ হাঁ করে হাত পা নেড়ে কিছু একটা বলতে চাইছিল। আর তার হাত নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শেকলের ঝনঝন আওয়াজটাও ক্রমাগত শব্দ তুলে যাচ্ছিল। অন্য কেউ হলে এতক্ষণে নিশ্চয় অজ্ঞান হয়ে যেত অথবা দুর্বল হৃদয়ের কোনো রোগী হলে নির্ঘাৎ তার মৃত্যু হত। কিন্তু অত্যন্ত সাহসী সেই দার্শনিক ভদ্রলোকটির কিছুই হল না। বরং তিনি যেমন ছিলেন সেইভাবেই তাকিয়ে রইলেন ছায়ামূর্তিটার দিকে। আসলে তিনি দেখতে চাইছিলেন অশরীরী মূর্তিটি এরপর কী করে?

একমুখ দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল, আর একমাথা রুক্ষ চুলে মূর্তিটিকে তখন বেশ বীভৎস এবং ভয়াবহ বলে মনে হচ্ছিল। তার উপর তার হাতের নখগুলো ছিল বেশ বড়ো বড়ো। হাতের তীক্ষ্ণ আর বড়ো বড়ো নখ দেখে দার্শনিকের মনে একটা

অন্য ধরনের ভয় এল। ভূত তিনি বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু জ্যান্ত দেহের কোনো চোর-ডাকাতকে তাঁর ভয় না করার কোনো কারণ ছিল না। মৃত্যুর পর প্রেতাত্মা মানুষের কতটা ক্ষতি করতে পারে সে সম্বন্ধে তাঁর কোনো ধারণাই ছিল না। অদেখা এমন কিছু পৃথিবীতে আছে বলেও তাঁর বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু জ্যান্ত চোর-ডাকাত মানুষের অনেক ক্ষতি করতে পারে। তাছাড়া তাঁর কাছে আত্মরক্ষার মতো তেমন কোনো অস্ত্রই ছিল না। মনে মনে যখন তিনি ভাবছিলেন সত্যিই যদি লোকটি কোনো চোর-ডাকাত হয় তাহলে তাঁর করার কিছু থাকবে না। তার উপর লোকটাকে দেখে মনে হয় তার গায়ে বেশ জোরও আছে। তাই তিনি যখন সম্ভাব্য বিপদের হাত থেকে বাঁচার জন্য কী করা যায় তাই ভাবছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করলেন মূর্তিটি আর এক পা-ও না এগিয়ে এসে ক্রমাগত পিছু হটতে শুরু করল। পিছতে পিছতে সে একসময় ঘর পরিত্যাগ করল।

অশরীরী মূর্তিটিকে পিছিয়ে যেতে দেখে দার্শনিক ভদ্রলোকটি ক্ষণিকের অবশ অবস্থা ত্যাগ করে তড়াক করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন। তারপর নিজেও ছুটে ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

অশরীরী মূর্তিটি ভূত বা অদ্ভুত যাই হোক না কেন দার্শনিক পরম বিস্ময়ে লক্ষ করলেন বারান্দা পার হয়ে মূর্তিটি ধীরে ধীরে নীচে নেমে গেল। তারপর লম্বা উঠোনের ঠিক মাঝ বরাবর গিয়ে হঠাৎই যেন কর্পূরের মতো উধাও হয়ে গেল। দার্শনিক ঠিক তখনই একবার চিৎকার করে উঠলেন 'কে কে' বলে। কিন্তু উত্তরে কেবল অনেক দূর থেকে ভেসে আসা অস্পষ্ট গোঙানি ছাড়া আর কিছুই শুনতে পেলেন না।

উঠোনের ঠিক যে জায়গায় মূর্তিটি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল সেইখানে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ গুম হয়ে কী যেন ভাবলেন। আরও দু-এক বার ডাকাডাকি করেও কারো উত্তর কিছু পেলেন না। বিফল মনোরথে তিনি ঘরে ফিরে শুয়ে পড়লেন। বাকি রাতটা এই অদ্ভুত ব্যাপারটি নিয়ে চিন্তা করতে করতে কাটিয়ে দিলেন।

ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে গত রাত্রে ঠিক যে জায়গা থেকে মূর্তিটা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল সেখানে এসে অনেক কিছু পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করতে থাকলেন। কিন্তু দিনের আলোয় কোনো কিছুই তাঁর অস্বাভাবিক বলে মনে হল না।

পাহাড়ের টিলায় এই বাড়িটি ছিল লোকালয় থেকে বেশ কিছু দূরে। লোকজন কেউ তেমন থাকত না। হয়তো সেটা কুঠিবাড়িকে কেন্দ্র করে যে সব গল্প এবং গুজব আছে তারই ভয়ে কোনো সাহসী পুরুষ এ বাড়ির ত্রিসীমানায় আসত না।

নির্বান্ধব এবং নির্জন বাড়িটায় দার্শনিক আবার তন্ময় হয়ে গেলেন তাঁর নিজের কাজে। নিজের চিন্তায়। নিজের পড়াশুনায়। প্রায় সারাদিনই তিনি বই-এর জগতে ডুবে রইলেন। ফলে রাতের সেই অশরীরী এবং অদ্ভুত ঘটনার কথা তিনি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন। রাতের খাওয়া দাওয়া সেরে যখন তিনি বিছানায় শুতে গেলেন তখনই একবার গত রাতের কথা মনে হল। কিন্তু ঘটনাটিকে তিনি তেমন আমল দিলেন না। ভাবলেন অত্যধিক চিন্তাগ্রস্ত থাকার জন্য আধা ঘুম আধা জাগরণে কী দেখতে কী দেখেছিলেন। বিছানায় শোবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম না এলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন।

ভয়ডর না থাকার জন্যে সমস্ত কিছুকে অলীক বলে উড়িয়ে দিলেও পরের রাতে কিন্তু সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। তার পরের রাতেও সেই একই ব্যাপার। পর পর তিন রাত্রি একই ভাবে অশরীরী মূর্তির আবির্ভাব এবং একই ভাবে হাত নেড়ে কিছু বলতে চাওয়ার চেষ্টা এবং একই ভাবে উঠোনের ঠিক একই জায়গায় এসে মিলিয়ে যাওয়া, তাঁকে বেশ ভাবিয়ে তুলল। তিনি কিছুতেই কোনো ব্যাখ্যা দিয়েই বুঝতে পারছিলেন না—এটা কেমন করে হয়? কীভাবে হয়? তবে কি এটা নতুন ধরনের যাদুবিদ্যা? অবশেষে চতুর্থ দিন সকালে দার্শনিক কিন্তু আর নিছকই কল্পনা বলে সব কিছু উড়িয়ে দিতে পারলেন না। আবার ভয় পেয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়েও গেলেন না। তিনি মনে মনে ভাবলেন নিশ্চয় এর মধ্যে কিছু অনুসন্ধানের আছে। নিছক মায়া বা যাদুবিদ্যা নয়। আর সত্যিই যদি অশরীরী কোনো প্রেত হয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয় সে কিছু বলতে চাইছে। আর সব থেকে দার্শনিককে বেশি আকৃষ্ট করল উঠোনের সেই নির্দিষ্ট স্থানটি। কেনই বা প্রতি রাতে অদ্ভুত এবং বীভৎস আকৃতির সেই মূর্তি ওই বিশেষ একটি জায়গায় এসে হারিয়ে যাচ্ছে। তাহলে কি ওই জায়গাটিতেই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কিছু লুকিয়ে আছে? এর একটা বিশেষ তদন্ত হওয়ার প্রয়োজন।

চতুর্থ দিন সকালে আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে দার্শনিক আর বাড়িতে বসে রইলেন না। চলে গেলেন শহরে। প্রথমেই তিনি যোগাযোগ করলেন স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে। সব কথা তাঁকে খুলে বললেন। অন্য কেউ হলে হয়তো পাগলের খেয়াল ভেবে ম্যাজিস্ট্রেটসাহেব উড়িয়ে দিতেন। কিন্তু এই দার্শনিক ছিলেন বেশ নামী লোক। জ্ঞান এবং বুদ্ধিমান হিসেবে তিনি প্রায় সকলেরই পরিচিত। ম্যাজিস্ট্রেটসাহেবের মতো একজন গণ্যমান্য লোকের সঙ্গে যে তিনি মশকরা করবেন না এটা ম্যাজিস্ট্রেটসাহেব নিজেও জানতেন। কালবিলম্ব না করে তিনি বেশ কিছু মজুর নিয়ে ফিরে এলেন দার্শনিকের কেনা নতুন বাড়িতে।

উঠোনের ঠিক যে জায়গায় এসে অশরীরী মূর্তিটি গত তিন রাত্রে অদৃশ্য হয়ে যেত সেই জায়গায় মাটি খোঁড়া শুরু হল। অবশ্য বেশি দূর খুঁড়তে হল না। সামান্য কয়েক হাত জমির নীচেই পাওয়া গেল একটি সম্পূর্ণ কঙ্কাল। কঙ্কালটির হাত-পা শিকল দিয়ে বাঁধা। শিকলে মরচে ধরেছে বেশ পুরু হয়ে।

প্রেত বা ভূত কোনোদিনও বিশ্বাস ছিল না দার্শনিক ভদ্রলোকটির। কিন্তু গত তিন রাত ধরে শৃঙ্খলাবদ্ধ একটি মূর্তির সঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ কঙ্কালটির কোথায় যেন কী সাদৃশ্য রয়েছে। এটা অনুমান করতে তাঁর কোনো অসুবিধা হল না। সহজ এবং যুক্তিগ্রাহ্য বুদ্ধি দিয়ে দার্শনিক এর কোনো অর্থই করতে পারলেন না।

ম্যাজিস্ট্রেটসাহেবের পরামর্শে নিয়মকানুন মেনে তাঁরা কঙ্কালটি যথাযথভাবে কবর দিলেন। আর সব থেকে অদ্ভুত ব্যাপার যা, তা হল কঙ্কালটি ভালোভাবে কবরস্থ হবার পর আর কিন্তু কোনোদিনও কোনো রাতেই দার্শনিকের ঘরে সেই অশরীরী মূর্তির আবির্ভাব ঘটেনি।

এরপর দার্শনিক বহুদিন সেই বাড়িতে বাস করেছিলেন। বহুদিন ধরে তিনি কবরস্থ কঙ্কালটির সম্বন্ধে খোঁজখবরও করেছিলেন। কিন্তু সঠিকভাবে কেউ বলতে পারেনি ওই বাড়িতে কাউকে কোনোদিনও কবর দেওয়া হয়েছিল কি না। তবে ওই গ্রামের এক অতি বৃদ্ধের মুখে শোনা যেত, অনেক-অনেক দিন আগে এক বৃদ্ধ ক্রীতদাসকে সামান্য অপরাধের জন্য ওইভাবে হাতে-পায়ে শেকল বেঁধে জীবন্ত কবর দেওয়া হয়েছিল। এ ঘটনা সত্য কি মিথ্যা তা জানার উপায় নেই। তবে দার্শনিক এটুকু বুঝেছিলেন মৃত্যুর পর আত্মার আসা-যাওয়া থাকে। আর সে আত্মা যদি অতৃপ্ত হয় তাহলে অশরীরী রূপ নিয়ে মানুষকে দেখা দিতে চায়। হয়তো বা তার অতৃপ্ত আত্মার তৃপ্তির পথ খোঁজে।

আধ খাওয়া মড়া

রূপনারায়ণ নদের বিরাট একটা চর।

নদীর বাঁধটা একটা বিরাট অজগরের মতো এঁকে বেঁকে চলে গেছে দূর থেকে

বহুদূরে। বাঁধের ধারে ধারে, দু-পাশেই বট, অশ্বত্থ, জাম, তেঁতুল, শিরীষ, অর্জুন, প্রভৃতি গাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

বাঁধ থেকে নেমে খানিকটা এগিয়ে গেলেই গ্রামের সীমানা। প্রথমেই জেলেপাড়া। তার ডান দিকে বাগদিপাড়া, উত্তর দিকে বিভিন্ন জাতের লোক বাস করে। অপর দিকে রূপনারায়ণ নদ ঢেউ তুলে তরতর করে এগিয়ে চলেছে। বাঁধের উপর দিয়ে প্রায় মাইল খানেক গেলেই রূপনারায়ণের প্রকাণ্ড চর। এই চরেই গাঁয়ের লোকেরা মড়া পোড়ায়।

আশপাশের প্রায় দশখানা গাঁয়ের মধ্যে ওই একটাই শ্মশান।

শ্মশানের কাছাকাছি অনেক নাম না জানা বড়ো বড়ো গাছ আর ঝোপঝাড়।

পাড়াগাঁয়ের শ্মশান যে কত ভয়ংকর না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। শ্মশানের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে পোড়া কাঠ, আধপোড়া বাঁশ, ছেঁড়া কাঁথা, ছেঁড়া কাপড়, ছেঁড়া মাদুর, মড়ার হাড়, ভাঙা হাঁড়ি আর সরা।

যারা মড়া পোড়াতে পারে না, তারা সব মড়া আর ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের মড়া মাটিতে পুঁতে দিয়ে যায়। তারপর সেই সব মড়া মাটির ভেতর থেকে টেনে বের করে শেয়াল-কুকুর আর শকুনে মনের আনন্দে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। কাছের ঝাঁকড়া শিরীষগাছটায় একদল শকুন থাকে।

হঠাৎ একদিন ঘটে গেল একটা ব্যাপার। বাগদিপাড়ার নগেন দলুই বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি থেকে চলে যায়। প্রায় চার দিন কেটে গেল, সে আর বাড়ি ফেরে না দেখে, সবাই চিন্তায় পড়ল। যেখানে যত আত্মীয় ছিল, খোঁজ নেওয়া হল। কিন্তু কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না তার।

সেদিন সকালে জেলেপাড়ার জনাকয়েক লোক ডিঙি ভাসিয়ে মাছ ধরতে ধরতে এসে পড়েছে শ্মশানের বেশ কাছাকাছি।

হঠাৎ তাদের নাকে দুর্গন্ধ লাগল। আর সেই সঙ্গে শকুনের ডানা ঝাপটানির শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে তারা দেখল, নগেন দলুই-এর পচা-গলা মৃতদেহটা চরে এসে আটকে আছে। শকুনে খানিকটা ছিঁড়ে খেয়েছে। চোখ দুটোও শকুনে খুবলে খেয়ে নিয়েছে। শুধু চোখের গর্ত দুটো আছে।

জেলেরা এই বীভৎস দৃশ্য দেখে বাগদিপাড়ায় সংবাদ ছিল। সকলে তখন সেখানে ছুটে এসে দেখল, এত দুর্গন্ধ ছাড়ছে যে কার সাধ্য সেখানে দাঁড়ায়। তখন সবাই নাকে কাপড় চাপা দিয়ে, মড়াটার পায়ে দড়ি বেঁধে, শ্মশানের ভেতর এনে মাটি চাপা দিয়ে চলে এল। রাত্তির বেলা মাটির ভেতর থেকে নগেনের মৃতদেহটা তুলে শিয়াল-কুকুরে খেয়ে ফেলল।

নগেন দলুই-এর অবস্থা মোটামুটি ভালোই ছিল। তার দুটি ছেলে, তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। তারা ভালোভাবেই বাপের শ্রাদ্ধ করলে। জেলেপাড়া-বাগদিপাড়ার অনেকেই নিমন্ত্রণ খেয়ে গেল।

এই ঘটনার পর প্রায় এক মাস কেটে গেল। তারপর থেকেই নানারকম অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটতে লাগল। কখনও বাগদিপাড়া থেকে আবার কখনও জেলেপাড়া থেকে হাঁস-মুরগি-ছাগল চুরি যেতে লাগল।

একদিন নগেনের বউ রাত্রে একটা শব্দ শুনে বাইরে এসে দেখলে—তাদের আমগাছটার নীচে, যেন কে একজন সাদা কাপড় গায়ে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে ভয় পেয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দিল।

মায়ের চেঁচানি শুনে ছেলেরা হ্যারিকেন হাতে নিয়ে বাইরে এসে চারিদিক দেখল। কিন্তু কাউকেই দেখা গেল না। তখন তারা বলাবলি করতে লাগল, ও সব মনের ভুল, গাছের ছায়া দেখে মা ভয় পেয়েছে।

রাত্রে বাঁধের ওপর আর শ্মশানেও একটা কঙ্কালকে ঘোরাফেরা করতে দেখে গাঁয়ের সবাই ভয় পেয়ে গেল। রাত্রে শ্মশানে মড়া নিয়ে আসা বন্ধ করে দিল সবাই। জেলেরা সারাদিন রূপনারায়ণে মাছ ধরে, সন্ধ্যা হলেই যে যার বাড়ি ফিরে আসতে লাগল। এমনকি বাঁধের ওপর দিয়েও লোক চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। সন্ধে হলেই রাস্তা একেবারে ফাঁকা।

সে দিন রাখাল জেলের একটা বাছুর গেল হারিয়ে। সারাদিন খোঁজ করা হল কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না বাছুরটাকে। এক দিন পরে একজন লোক শ্মশানের দিকে এসে দেখল। রাখাল জেলের বাছুরটা মরে পড়ে আছে, তার আধখানা কে যেন চিবিয়ে খেয়েছে। বাকিটা পড়ে আছে একটা গাছের তলায়।

খবরটা শুনে রাখাল এসে দেখল ব্যাপারটা। কী করবে? তাই সে কিছু না বলে চলে এল সেখান থেকে। মনে মনে সে বুঝল, নগেন দলুই ভূত হয়ে এইসব কাণ্ড করছে।

জেলেপাড়ার ফকির আর নিধিরাম ভোরবেলায় জাল কাঁধে নিয়ে মাছ ধরতে গেল। নগেনের বাড়ির পাশ দিয়েই তাদের যাবার রাস্তা। তাই তারা সেই রাস্তা দিয়েই যাচ্ছিল আপনমনে। হঠাৎ তাদের চোখে পড়ল নগেন দলুইয়ের বাস্তুভিটেটার দিকে।

অবাক হয়ে ফকির আর নিধিরাম দেখল নগেনের বাড়ির দরজার কাছে একটা আবছা মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। সারাদেহ তার সাদা কাপড়ে ঢাকা। ওরা চোর ভেবে জিজ্ঞাসা করলে, ওখানে কে রে? সঙ্গে সঙ্গে আবছা মূর্তিটা ঘুরে দাঁড়াল।

ওরা আশ্চর্য হয়ে দেখল লোকটার মুখ দেখা যাচ্ছে না। শুধু চোখ দুটো যেন আগুনের গোলার মতো জ্বলছে। দেখতে দেখতে মূর্তিটা বিরাট লম্বা হয়ে গেল।

এই ব্যাপার দেখে ফকির আর নিধিরাম ভয় পেয়ে, ওরে বাবারে গেলুম রে, বলে ছুটে পালাল প্রাণপণে।

সবার মুখে মুখে খবরটা জানাজানি হয়ে গেল। পাড়ার লোক ভয় পেয়ে সন্ধে সাতটার পর নগেন দলুই-এর বাড়ির পাশের রাস্তা দিয়ে যাওয়া-আসা বন্ধ করে দিল।

ফকির জেলে নগেনের ছেলেদুটোকে বললে, বাপু, ব্যাপার খুব সুবিধের মনে হচ্ছে না। তোদের বাপ ভূত হয়েছে। তোরা ছেলেপুলে নিয়ে থাকিস, একটা কিছু ব্যবস্থা কর। তা না হলে কোনোদিন তোদের বিপদ হতে পারে।

নগেনের বড়োছেলেটা ভয় পেয়ে বললে, কী ব্যবস্থা করা যায় বলো দেখি খুড়ো? মা-ও একদিন দেখেছিল, আমরা তার কথা বিশ্বাস করিনি। কিন্তু এখন দেখছি বিশ্বাস না করে উপায় নেই।

নগেনের ছোটোছেলে বললে, আমিও সেদিন ভোরের দিকে বাইরে বেরিয়ে সাদা কাপড় ঢাকা একটা মূর্তি দেখেছিলাম, কিন্তু সবাই ভয় পাবে বলে কাউকে আর কিছু বলিনি।

নিধিরাম সব শুনে কিছুক্ষণ ধরে কী যেন ভাবলে। তারপর গম্ভীরভাবে বললে, এখানে তো তেমন ভূতের ওঝাও নেই। তবে শুনেছি মহেশপুরে একজন লোক আছে। সে নাকি ভূত ছাড়ায়, তোরা তার কাছে যা, সে কী বলে দেখ।

এই পরামর্শ দিয়ে ফকির আর নিধিরাম যে যার বাড়ি চলে গেল।

নগেনের বড়োছেলে তার ছোটোভাইকে বললে, মহেশপুর এখান থেকে প্রায় চার ক্রোশের ওপর। যেতে-আসতে প্রায় নয়-দশ ক্রোশ। আজকে তো আর যাওয়া সম্ভব নয়। কাল সকালেই সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে যাব। বিকেলে তাহলে ফিরে আসতে পারব। এইভাবে দু-ভাই যুক্তি করলে।

সেদিন রাত্রেই ঘটনাটা ঘটল নগেনের বাড়িতে।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিল।

রাত প্রায় তখন দুটো-আড়াইটে হবে। হঠাৎ হাঁস-মুরগির ঘরে ঝটপটানি আর কোঁক কোঁক শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল নগেনের বউ-এর।

নগেনের বউ ভাবলে, বোধহয় হাঁস-মুরগির ঘরে শেয়াল ঢুকেছে। এই কথা মনে করে সে একটা হ্যারিকেন আর একটা লাঠি নিয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

উঠোনে পা দিতেই সে দেখল, খুব লম্বা একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে উঠোনের

মাঝখানে। তার লম্বা লম্বা লিকলিকে হাত দুটোতে দুটো মুরগি, আর সে মুরগি দুটো ছিঁড়ে চিবিয়ে খাচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে নগেনের বউ আঁ-আঁ করে চিৎকার করে উঠোনে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল।

সেই শব্দ শুনে ছেলেরা বউরা সব ছুটে এল হ্যারিকেন নিয়ে।

উঠোনের মাঝে মাকে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতে দেখে তাড়াতাড়ি জল পাখা নিয়ে এসে সবাই শুশ্রূষা করতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ সেবা-শুশ্রূষা করার পর জ্ঞান ফিরে এল নগেনের বউ-এর।

ছেলেরা জিজ্ঞাসা করলে, কী হল মা? তুমি অজ্ঞান হয়ে গেলে কেন? নগেনের বউ তখন হাঁপাতে হাঁপাতে দু-এক কথায় ছেলেদের সব ব্যাপারটা বলে, উঠোনের যেখানে কঙ্কালটা দাঁড়িয়েছিল, সেই জায়গাটা ইশারা করে দেখিয়ে দিল।

সবাই আলো হাতে নিয়ে উঠোনের মাঝখানে গিয়ে দেখল, চারদিকে মুরগির পালক আর রক্ত ছড়ানো রয়েছে। কিন্তু ধারে কাছে কাউকেই দেখা গেল না।

ছোটোছেলে বললে, হয়তো শেয়াল ঢুকে মুরগি খেয়েছে। রাতের অন্ধকারে শেয়ালের চোখ দুটো তো দপদপ করে জ্বলে, মা হয়তো তাই দেখেই ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছল।

ছেলেদের কথা শুনে নগেনের বউ বললে, তোরা আমার কথা বিশ্বাস করলি না। কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখেছি খুব লম্বা একটা মূর্তি উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে। তার সারাদেহ সাদা কাপড়ে ঢাকা। মুখটাও দেখা যাচ্ছে না। চোখ দুটো দপদপ করে জ্বলছে। তার লিকলিকে লম্বা হাত দুটোয় দুটো মুরগি—সে মুরগি দুটো ছিঁড়ে ছুঁড়ে খাচ্ছে।

এইসব কথাবার্তা হচ্ছে নিজেদের মধ্যে। এমন সময় বাড়ির পিছন দিকে শোনা গেল একটা ভয়ংকর হাসির শব্দ। সেই হাসির শব্দ শুনলে বুক কেঁপে ওঠে। সেই শব্দ শুনে সবাই চমকেঁ উঠল। তারা বুঝতে পারল এটা একটা ভৌতিক কাণ্ড ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

ভয় পেয়ে সবাই ঘরে ঢুকে বসে রইল সকাল হবার অপেক্ষায়।

পরের দিন নগেনের বড়োছেলে সাইকেল নিয়ে চলে গেল সেই প্রায় চার ক্রোশ দূরে মহেশপুরে ওঝার বাড়িতে। কিন্তু মুশকিল হল, ওঝা তখন অসুস্থ। নগেনের ছেলে একে একে সব কথা বললে তাকে।

ওঝা সব কথা মন দিয়ে শুনে বললে, দ্যাখো বাবা, আমার বয়েস হয়েছে। তাছাড়া আজ এক সপ্তাহের ওপর আমি উঠতে হাঁটতে পারছি না। একটু সুস্থ

হলেই আমি গিয়ে সব ব্যবস্থা করে আসব। এখন বলো, তোমাদের ঘরে মোট কতজন লোক?

নগেনের ছেলে বললে, সবসুদ্ধ আটজন।

ওঝা বললে, আমি তোমাকে আটটা মাদুলি দিচ্ছি। কালো সুতোয় বেঁধে হাতে বেঁধে রাখবে। আর ছেলেদের গলায় বেঁধে দেবে। আর এই চারটে পেরেক দিচ্ছি তোমাদের ভিটের চার কোণে পুঁতে দিয়ো। তাহলে সে আর তোমাদের বাড়ির সীমানায় আসতে পারবে না।

এই কথা বলে ওঝা আটটা মাদুলি আর চারটে বড়ো বড়ো পেরেক তার হাতে দিল।

পেরেক আর মাদুলি নিয়ে নগেনের বড়োছেলে বিকালের দিকে ফিরে এল। তারপর ওঝার কথামতো সকলকে মাদুলি পরানো হল, আর পেরেক পুঁতে দেওয়া হল।

সেদিন থেকে নগেন দলুই-এর বাড়িতে ভূতের উপদ্রব কমে গেছে বটে, কিন্তু গ্রামে উপদ্রব বেড়ে গেল।

গাঁয়ের লোকের ঘর থেকে হাঁস-মুরগি আর ছাগল প্রায়ই চুরি হতে লাগল। অন্ধকারে সেই ছায়ামূর্তিকেও দেখল অনেক লোক। তাছাড়া কারও বাড়িতে গভীর রাতে ইট পড়তে থাকে দুমদাম করে। আবার কারও বাড়িতে গোরুর হাড়, মোষের হাড়, মানুষের হাড় পড়তে থাকে। আবার কারও ঘরের চালে মড়া পোড়া কাঠ, বাঁশ পড়তে থাকে।

সারা গাঁয়ের লোক ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। সন্ধে হতে না হতেই যে যার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বসে ভয়ে রাত কাটাতে লাগল। সন্ধের পর অতবড়ো গ্রামটা যেন শ্মশানের মতো জনশূন্য মনে হয়। সেদিন রাত্রে অনেক দূর থেকে একদল লোক একটা মড়া নিয়ে শ্মশানে এল পোড়াতে। লোকগুলো চিতা সাজিয়ে, মড়াটাকে তার ওপর তুলে আগুন দিল। তারপর শবযাত্রীরা একটু দূরে বসে আপন মনে তামাক টানতে লাগল।

এদিকে সেই অবসরে পাশের বটগাছ থেকে লম্বা হাত বাড়িয়ে নগেন মড়াটাকে চিতা থেকে তুলে নিয়ে গাছের ওপর বসে চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে লাগল।

তামাক খেয়ে লোকগুলো চিতার কাছে এসে দেখেই অবাক হয়ে গেল। শুধু চিতাটাই জ্বলছে মড়ার পাত্তা নেই। লোকগুলো রীতিমতো ভয় পেয়ে গেল। নদীতে তখন মালপত্র বোঝাই করা একটা বেশ বড়ো নৌকা বাঁধা ছিল। মাঝি

বসে অপেক্ষা করছিল জোয়ারের আশায়। নৌকার ছাদের ওপর হালের কাছে বসে মাঝি তামাক খাচ্ছিল।

অনেক আগেই সে ব্যাপারটা লক্ষ করেছিল, কিন্তু শবদাহকারীরা পাছে ভয় পায়, এজন্যে সে চুপচাপ দেখেই যাচ্ছিল। শবযাত্রীরা যখন ভয় পেয়ে বাঁচাও বাঁচাও বলে চেঁচাতে লাগল, আর নৌকোর আলো দেখে সেদিকে ছুটে গেল, তখন নৌকার মাঝি চেঁচিয়ে বললে, ভয় পেয়ো না তোমরা। ওইখানে দাঁড়িয়ে থাকো, আমি যাচ্ছি।

মাঝির কথা শুনে শবযাত্রীরা সেইখানেই দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপতে লাগল।

নৌকোর মাঝিটি ছিল একজন বেশ নামকরা ভূতের ওঝা। সে একটা পুঁটলি হাতে নিয়ে আর এক হাতে হুঁকো নিয়ে নৌকো থেকে নেমে এলো শ্মশানে।

লোকগুলোকে তখন মাঝি তার কাছে বসিয়ে বিড়বিড় করে কীসব মন্ত্র বলতে বলতে লোকগুলোর চারপাশে কী যেন সব ছড়িয়ে দিয়ে বসে হুঁকোয় দু-একটা টান দিয়ে বললে, কোনো ভয় নেই তোমাদের। ভূতের বাবারও সাধ্য নেই যে আর তোমাদের কাছে আসে। আমি গণ্ডি দিয়ে দিয়েছি। যতক্ষণ তোমরা এই গণ্ডির মধ্যে থাকবে, ততক্ষণ তোমাদের ভূতে কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তারপর সকাল হলে বাড়ি চলে যাবে। দিনের বেলা ভূত লোকের কাছে আসে না।

একজন জিজ্ঞাসা করল, মড়াটা তাহলে গেল কোথায়?

মাঝি বললে, তাকে চিতা থেকে তুলে নিয়েছে।

মাঝির কথা শুনে সবাই ভয় পেয়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। কারও মুখে আর কথা নেই।

মাঝি বললে, হ্যাঁ, তাকে তুলে নিয়েছে।

ওদের মধ্যে একজন যুবক বললে, আগুনের ভেতর থেকে তুলে নিল কী করে?

মাঝি বললে, গাছের ওপর থেকে হাত বাড়িয়ে।

মাঝির কথা শুনে যুবকটি যেন একটু অবজ্ঞার হাসি হাসল।

তাই দেখে মাঝি বললে, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? দেখতে চাও?

যুবক বললে, বেশ দেখান, তাহলে বিশ্বাস করব।

-দ্যাখো, আবার অজ্ঞান হয়ে যাবে না তো?

—এখনও যখন হইনি, তখন আর হব না।

—বেশ তাহলে এসো আমার সঙ্গে। এই কথা বলে মাঝি তাদের সঙ্গে নিয়ে বটগাছের ওপর ইশারা করে দেখিয়ে দিল। —ওই দ্যাখো।

সকলে দেখল, বটগাছের মগডালের ওপর বসে একটা বীভৎস কঙ্কাল তাদের সেই মড়াটাকে চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে! কী ভয়ঙ্কর দৃশ্য!

ভয় পেয়ে সবাই চোখে হাত চাপা দিয়ে মাঝির কাছে সরে এল।

মাঝি বললে, এবার বিশ্বাস হল তো? যাক তোমাদের কোনও ভয় নেই। ও গাছ থেকে নেমে আসতেও পারবে না। আর কোথাও যেতেও পারবে না। আমি গাছটাকে গণ্ডি দিয়ে দিয়েছি।

এই কথা বলে মাঝি হুঁকোটা সেখানে রেখে, পুঁটলিটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, তোমরা এখানে চুপচাপ বসে থাকো।

মাঝিকে চলে যেতে দেখে, লোকগুলো ভয় পেয়ে কাতরভাবে বললে, আপনি আমাদের এভাবে ফেলে রেখে যাবেন না, সকাল হলে তারপর যাবেন। দয়া করে সকাল না হওয়া পর্যন্ত আপনি অপেক্ষা করুন।

মাঝি হেসে বললে, ভয় নেই, আপনারা এখানে বসুন। আমি ওর পরিচয় নিয়ে আসছি।

মাঝি চলে গেল বটগাছের দিকে। লোকগুলো ভয়ে কাঠ হয়ে বসে রইল। স্পষ্ট শোনা যেতে লাগল, মাঝি বলছে, তুই কে?

—আমি নগেন দলুই।

—তোর বাড়ি কোথায়?

—বাঁধের ওপারে বাগদিপাড়ায়।

—বাড়িতে তোর কে আছে?

—আমার বউ, দুটো ছেলে, তাদের বউ, নাতি-নাতনি।

—ঠিক আছে, তুই গাছেই বসে থাক। পালাবার চেষ্টা করলেই, জ্বলে-পুড়ে মরবি। আমি তোকে বেঁধে দিয়ে যাচ্ছি।

মাঝি আবার ফিরে এল, লোকগুলোকে বললে, সকাল হলেই আপনারা গাঁয়ে গিয়ে লোকজনদের ডেকে আনবেন।

দেখতে দেখতে পূর্ব দিক ফর্সা হয়ে এল। গাছে গাছে পাখি ডেকে উঠল। একটু পরে সকাল হল।

দুজন লোক গাঁয়ে গিয়ে এই সংবাদ দিল। গ্রাম থেকে বহুলোক এল দেখতে। নগেন দলুই-এর ছেলেদুটোও এল।

সবাই এল বটগাছের নীচে।

গাছের ওপর তখন কিছুই দেখা যাচ্ছে না, শুধু একটা মড়া ঝুলছে দেখা গেল।

মাঝি বললে, মড়াটাকে ফেলে দে নগেন।

সঙ্গে সঙ্গে ধপাস করে মড়াটা মাটিতে পড়ে গেল।

সবাই দেখে তো অবাক। মড়াটার খানিকটা মাংস কে যেন খুবলে খেয়েছে।

মাঝি বললে, নগেনের ভূতই মড়াটাকে চিতা থেকে তুলে গাছে নিয়ে গিয়ে বসে খেয়েছে। দিনের বেলা তো ওদের দেখা যায় না। তা না হলে আমি দেখিয়ে দিতাম।

মাঝি এবার বিড়বিড় করে কী সব মন্ত্র বলে উঠতেই, গাছের ওপর থেকে খনখনে গলায় নগেন বলে উঠল—এবার আমাকে ছেড়ে দে।

মাঝি বললে, তুই একেবারে এদেশ থেকে চলে যাবি।

নাকিসুরে উত্তর এল, না, যাব না। আমি এখানেই থাকব।

—এখানে থাকবি কেন?

—এখানে আমার বউ-ছেলে রয়েছে। তাছাড়া বউটার জন্যই আমি জলে ঝাঁপ দিয়ে মরেছি। ওকেও আমি ঘাড় মটকে শেষ করব।

এই কথা শুনে নগেনের ছেলেরা ভয় পেয়ে মাঝিকে বলল, দয়া করে আপনি আমাদের রক্ষা করুন।

মাঝি বললে, তোমাদের বাবা ভূত হয়ে কষ্ট পাচ্ছে। শুধু শুধু ওকে কষ্ট দিয়ে লাভ কী?

নগেনের বড়োছেলেকে মাঝি বললে, তুমি গয়ায় গিয়ে ওর নামে পিন্ডি দাও, তাহলেই তোমার বাবা প্রেতযোনি থেকে উদ্ধার পাবে।

তখন গাঁয়ের একজন বয়স্ক লোক বললে, এখন ওরা কী করবে? যদি আজ রাতেই কারও ঘাড় মটকে দেয় বা গ্রামবাসীদের ক্ষতি করে?

মাঝি বললে, তা পারবে না। আমি গাছের চারদিকে গণ্ডি দিয়ে যাচ্ছি। ও গাছ থেকে কোথাও যেতে পারবে না। সাত দিন এই গাছে ও বন্দি হয়ে থাকবে, তার মধ্যে পিন্ডি দেওয়া না হলে, ও আবার গ্রামে গিয়ে উপদ্রব করবে।

নগেনের ছেলে বললে, আমি আজই রওনা হয়ে যাচ্ছি।

মাঝি বললে, তুই উদ্ধার হলে কী চিহ্ন রেখে যাবি?

এবার কিন্তু কোনও উত্তর এল না, গাছের ওপর থেকে খোনা গলায় চেঁচিয়ে উঠল নগেনের ভূতটা, ওরে বাবা রে—গেছি রে—জ্বলে মলুম রে।

মাঝি বললে, বল কী চিহ্ন রেখে যাবি?

নগেনের ভূত বললে, দাঁড়াও দাঁড়াও বলছি—বলছি।

এই বলে একটু থেমে, তারপর বললে, এই গাছের একটা মোটা ডাল ভেঙে দিয়ে যাব।

মাঝি তখন লোকগুলোকে বললে, আপনারা মড়াটা নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে দিন। তারপর গ্রামবাসীদের বললে, আপনারা ফিরে যান, আজ থেকে আর গাঁয়ে কোনও উপদ্রব করবে না নগেন।

এই কথা বলে মাঝি ফিরে গেল নৌকায়।

শবযাত্রীরা আবার নতুন করে চিতা সাজিয়ে আধ খাওয়া মড়াটাকে পুড়িয়ে ফিরে গেল যে যার ঘরে।

নগেনের বড়োছেলে রওনা হয়ে গেল গয়ায়। সে যেদিন নগেনের নামে গয়ায় পিন্ডি দিল, সেইদিন দুপুরেই মড়মড় করে ভয়ংকর শব্দে বটগাছের একটা ডাল ভেঙে পড়ল। অবাক হয়ে গ্রামবাসীরা দেখল সেই দৃশ্য।

সেদিন থেকে গাঁয়ে আর কোনও ভূতের উপদ্রব রইল না।

স্বপ্ন হলেও সত্য

কেন জানি না আমার হঠাৎই খেয়াল হল লন্ডন শহরে বনেদি এলাকায় গিয়ে থাকবার। অনেক খুঁজেপেতে একটা বনেদি ও সেকেলের পুরানো বাড়ির সন্ধান পেলাম, এই বাড়িটা ছিল নদীর পাশ দিয়ে প্রধান রাস্তার উপর দিয়ে গিয়ে ভিতর দিকে টেম্পলে কিংসফোর্ড ওয়াকের। এই বাড়িটা দেখতেও ছিল অদ্ভুত ধরনের। বাড়িটা দেখেই আমার পছন্দ হয়ে গেল। ভাবলাম, যাক এতদিনে একটা মনের মতো বাড়ি পেলাম। একটু নির্জনে থাকতে পারব। চিন্তা-ভাবনা করবার পক্ষে খুবই উপযুক্ত বাড়ি ছিল এটা। বাড়িটা পেয়ে খুব খুশিই হলাম।

আমার পাঠকেরা নিশ্চয় এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে, যেখানে আমি আছি সেখানে ভূত-প্রেতের গন্ধ থাকবেই। কিন্তু এই বাড়িটার ব্যাপারে আমার মনে কোনো ভূত-প্রেতের সন্দেহও উঁকি মারেনি। তাছাড়া আমি কোনো প্রেত-চর্চাসঙ্ঘের সদস্যও নই। কিন্তু কী করব আমার ভাগ্যটাই এমন। যেখানেই যাই সেখানেই আমার গন্ধে ভূতপ্রেতেরা এসে হাজির হয়। তাই এই বাড়িটাও আমাকে শান্তিতে থাকতে দিল না।

আমার বাড়িওলি বেশ বয়স্ক ধরনের মহিলা। দেখলেই বোঝা যায় পাকা

গিন্নিবান্নি মানুষ, তাছাড়া উনি সৎ, কর্মঠ ও পরিশ্রমী। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, এই বাড়িতে এসে আমার ব্রেকফাস্ট বন্ধ হল। কোনো দিনই সকালে ব্রেকফাস্ট পেতাম না। তার কারণ আমি রোজ সকালে দশটার পর ঘুম থেকে উঠতাম আর দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে তা টেবিল থেকে তুলে নেওয়া হত। এই ছিল বাড়িওলির নিয়ম। নিয়মমতো টেবিলে উপস্থিত না থাকার জন্যে আমার কপালে খাওয়া জুটত না। ঘুম থেকে উঠে খিদেয় ছটফট করতাম। তাই খিদের জ্বালা মেটাতাম হোটেলে গিয়ে।

এইভাবে বেশ চলতে লাগল। মনে মনে খুবই অশান্তিতে ভুগছিলাম। ব্রেকফাস্ট খাই না অথচ তার টাকাগুলো আমাকে দিতে হচ্ছে। একদিন ভাবলাম, না আর অপেক্ষা করা চলে না, বাড়িওলিকে সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলব। এইভাবে দিনের পর দিন না খেয়ে বিল মেটানোর কোনো মানে হয় না।

খুব সাহস করেই একদিন মহিলাকে বলে ফেললাম—দেখুন, আমার রাতে ঘুম হয় না। ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়ি, তাই আপনি যদি দয়া করে ব্রেকফাস্টটা দশটার সময় না সরিয়ে আরও দশ মিনিট পরে সরান তাহলে আমার খাওয়াটা হয়। এই ব্যাপারে আপনি একটু ভেবে দেখবেন।

আমার কথা শুনে মহিলাটি তো খেপে আগুন। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বললেন—তোমার কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই। আমি বলি, তোমার বিবেক বলেও কিছু নেই। তুমি আমার অসুবিধে বোঝো না। তোমার চেয়ে আমার দ্বিগুণ বয়স, দ্যাখো তো আমি কত পরিশ্রম করি। আর তুমি রবিবার গির্জায় যাও, রাতে প্রার্থনা করো, আর সকাল সকাল খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়ো। তার পরেও তোমার ন-টার সময় ঘুম ভাঙে না, ব্রেকফাস্ট খেতে পারো না, আমার মনে হয় তুমি একটা দুর্বৃত্ত। তোমাকে আমার বাড়িতে থাকতে দেওয়াই অন্যায় হয়েছে। যুবক বয়সে যে ছেলে এমন অকর্মণ্য হয় তাকে দিয়ে আর কোনো কাজই হয় না।

আমি আর কথা বাড়ালাম না, ভাবলাম ওনাকে বোঝাতে পারব না। এ আমার সাধ্যের অতীত, কী করে বোঝাব যে, এই ঘরে যে শোবে তার ঘুমের সর্বনাশ হবে। আমি বেশ কিছুদিন থেকে বুঝতে পারছিলাম এই ঘরে কোনো ভৌতিক ব্যাপার আছে। তা-ই রাতের পর রাত আমাকে জাগিয়ে রেখে ঘুম কেড়ে নিয়েছে, সারারাত জেগে জেগে বই পড়ে ক্লান্ত হয়ে ভোরবেলায় ঘুমিয়ে পড়ি, যার জন্যে কিছুতেই সকাল দশটার আগে ঘুম থেকে উঠতে পারি না। এই কথা কাকে বোঝাব, কেউই আমার কথা বিশ্বাস করতে চাইবে না।

একদিন দুপুরবেলায় খুবই ক্লান্ত ছিলাম, তাই আমার বৈঠকখানার ছোটো শোফাটায় ঘুমিয়ে পড়লাম। এত গভীর ঘুম দিয়েছিলাম যে আমি দুপুর থেকে

অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমালাম। হঠাৎ জেগে উঠে দেখি আমার হাতে একটা পেনসিল ধরা রয়েছে, আর মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা স্বপ্ন হয়ে রয়েছে। স্বপ্নের কথাগুলো আমার মনের মধ্যে ছবির মতো ফুটে উঠল কিন্তু পেনসিলটা কোথা থেকে এল তা কিছুতেই মনে পড়ল না। আরও অবাক হয়ে গেলাম যখন দেখলাম পাশেই কয়েকটা কাগজের টুকরো পড়ে রয়েছে। কাগজের টুকরোগুলো হাতে তুলে আমি চমকে উঠলাম, কারণ যে স্বপ্নটা আমি ঘুমের ঘোরে দেখেছি, আর তারই সব কথা এই কাগজগুলোতে আমি ঘুমের মধ্যে লিখে রেখেছি। ঘুমের মধ্যে আমি কী করে লিখলাম, কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

তবুও আমি যা স্বপ্নের কথা লিখেছিলাম তাই পাঠকদের জানাচ্ছি—আমি যে ঘরটায় থাকতাম সেটা জেমসের রাজত্বকালে স্টেলা নামে একটি সুন্দরী মেয়ে, আর তরুণ এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গোপনে দেখাশোনার জায়গা ছিল। তরুণটি ছিল প্রোটেস্টান্ট আর স্টেলা ছিল ক্যাথলিক। একদিন ক্যাথলিক রাজার কাছে তাদের গোপন অভিসারের কথা জানিয়ে দেওয়া হল। এই খবর পেয়ে তরুণটি রাগে ক্রোধে উন্মাদ হয়ে তার উপপত্নীকে খুন করে এই বাড়ির নীচে একটা কুয়োর মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। এই মারাত্মক স্বপ্নের কথাগুলো পড়ে আমি শোফা ছেড়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু কী আশ্চর্য ব্যাপার, তারপর আমি শান্তিতে ঘুমিয়েও পড়লাম।

পরের দিন রাতে আবার সেই একই স্বপ্ন দেখলাম। এমনকি স্বপ্নে অশরীরীকে অনুসরণ করে আমি তার সঙ্গে অচেনা একটা ঘরে ঢুকলাম। এই ঘরে আগে আমি কখনও আসিনি, কিন্তু স্বপ্নে আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম মাটির নীচের ঘরটা, যার মেজেটা মস্তবড়ো একটা চৌকো, পাথরের টুকরো দিয়ে তৈরি, বহুদিনের অব্যবহারের ফলে কালো হয়ে গেছে।

স্বপ্নে আরও অনেক কিছু দেখলাম। আমি এই ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানানো হল, আর যেইমাত্র প্রার্থনাটা শেষ হল অমনি সব কিছু অদৃশ্য হয়ে গেল, এমনকি জায়গাটাও আবার ফাঁকা আর পোড়া হয়ে গেল।

পর পর তিন দিন একই স্বপ্ন দেখে আমি ঠিক করলাম, এই রহস্যের সমাধান করতে হবে। অনেক ভেবে-চিন্তে পরের দিন বাড়িওলিকে বললাম—এই বাড়িতে কোনো গোপন ঘর আছে? আমাকে একটু বলুন না সেই ঘরটা কোথায়?

আমার কথা শুনে মহিলাটি রেগেই গেলেন, বললেন, এই ঘরটা ভাড়া দিলেই যত জ্বালাতন বাড়ে! যে-ই এই ঘরে রাত কাটিয়েছে তারাই এই একই প্রশ্ন করেছে আমাকে। কেন যে তারা এই গোপন ঘরের প্রশ্ন করে তা আমি আজও জানতে পারিনি। তারপর বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বললেন—হ্যাঁ, একটা গোপন ঘর আছে। সেটা রান্নাঘরের নীচে।

আমি ভদ্রমহিলাটির কাছে যা জানতে চেয়েছিলাম তার সঠিক উত্তর না পেয়ে মনে মনে অখুশি হলাম। তারপর ভাবলাম, ওঁনাকে প্রশ্ন করে কোনো লাভ নেই। উনি ঠিক বলতে পারবেন না। তাই ঠিক করলাম, বাড়িওলি বাড়ি থেকে বের হলেই আমি একলাই অনুসন্ধান চালাব। একটু পরেই বাড়িওলি বেরিয়ে গেলেন। তারপর আমি উঠে রান্নাঘরে গিয়ে হাজির হলাম। এই রান্নাঘরটা রাস্তার সমতলের ঠিক নীচে। বেশ খানিক খোঁজাখুজি করে পুরানো ওক কাঠের একটা দরজা খুঁজে পেলাম। তারপর সেই দরজার ভিতর দিয়ে গোপন ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। দেখলাম, আমার স্বপ্নে দেখা এই সেই ঘরটা। স্বপ্নের সঙ্গে হুবহু মিলে গেল। এমনকি মেজেটাও গাঢ় কালো রঙের পাথর দিয়ে বাঁধানো। আর আমি বেশিক্ষণ এই ঘরটায় থাকলাম না। তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ফিরে এলাম। মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। এটা কী ধরনের রহস্য বুঝতে পারলাম না। মন থেকে ব্যাপারটা মুছে ফেলবার জন্যে ড্রেস করে বাইরে বেরিয়ে গেলাম। যাতে এই বাজে চিন্তার থেকে আমি মুক্তি পেতে পারি।

সারা সন্ধ্যাটা আমি বাইরেই কাটালাম, থিয়েটার দেখলাম, তারপর অনেক রাতে বাড়ি ফিরে এলাম। খুবই পরিশ্রান্ত ছিলাম। বিছানায় শুয়ে পড়তেই সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লাম। আবার সেই একই স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। কিন্তু আজকের স্বপ্নটা ছিল অন্যদিনের চেয়ে একটু আলাদা। স্টেলা নামে সুন্দরী মেয়েটি আমাকে পথ দেখিয়ে সেই মাটির নীচের ঘরে নিয়ে গেল, তারপর কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, আজ রাত বারোটার সময় এই ঘরে মৃতের জন্যে প্রার্থনার আয়োজন করো। তারপর সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

স্বপ্ন দেখা শেষ হতেই আমি চমকে উঠে পড়লাম। স্বপ্নের কথাগুলো কানের মধ্যে বাজতে লাগল। এমনকি মেয়েটার শীতল নিশ্বাসের স্পর্শ পর্যন্ত আমি অনুভব করতে পারছিলাম; সবকিছু মিথ্যে ভাববার জন্যে আমি ভালো করে চোখ রগড়াতে লাগলাম। তারপর দেওয়ালের দিকে তাকাতেই আঁতকে উঠলাম। চোখের সামনে, স্বপ্নে, কানে শোনা কথাগুলো দেওয়ালে স্পষ্ট করে লেখা রয়েছে। ঠিক সেই কথা—'মাঝরাতে এই ঘরের মৃতের জন্যে প্রার্থনা করো'। আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলাম না কী করে এই দেওয়ালে লেখা হল। তাহলে কি আমিই ঘুমের ঘোরে উঠে টেবিল থেকে পেনসিল নিয়ে দেওয়ালে লিখেছি। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল না, না এটা অসম্ভব।

আমি এসব কথা কাউকে কিছু না বলে পোশাক পরে পথে বেরিয়ে পড়লাম। ভাবলাম যেমন করেই হোক আজ রাতে প্রার্থনার ব্যবস্থা করব। পথে বেরিয়ে মনটা ভোরের ঠান্ডা মিষ্টি হাওয়ায় ভরে উঠল। মনে হল দিনের সঙ্গে রাতের কত পার্থক্য। এই কথা ভাবতেই মনে পড়ে গেল রাতের স্বপ্নে দেখা দৃশ্যগুলো,

যে কথাগুলো আমার কানের মধ্যে হাতুড়ি মারতে লাগল, মনে মনে ভাবলাম স্বপ্নের কথামতো সবই পালন করব, সকলকে বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করব। আমি নিজে ক্যাথলিক নই। আমি কখনও কোনো গোঁড়া মতের সমর্থক নই, কিন্তু বেড়াতে বেরিয়ে প্রায়ই ক্যাথালিক চার্চে যেতাম। যার ফলে চার্চের কয়েকজন যাজকের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল। আমি ভাবলাম এখান থেকে আমি সাহায্য পেতে পারি। তাই তাড়াতাড়ি ছুটে চার্চে গেলাম এবং যাজকের সঙ্গে দেখা হল। আমি জানতাম উনি খুব সহানুভূতিশীল ও খুব বুদ্ধিমান। কিন্তু আমার সব কথা শুনেও উনি বিশ্বাস করলেন না। বললেন—এসব বাজে কথা, মিথ্যে কথা! তাছাড়া তিনি আমাকে আরও বললেন—আপনার এই বাজে চেষ্টা ছেড়ে দিন। কেউই ওই ঘরে গিয়ে প্রার্থনা করবে না। আমি বলছি এই লন্ডন শহরে আপনি এমন একজনও পাদরি খুঁজে পাবেন না যিনি আপনার ইচ্ছা পূরণ করবেন।

আমি অনেকগুলো চার্চ পেরিয়ে এলাম। আর একটায়ও ঢুকলাম না। অশান্ত মনে গ্রিন পার্কে ঢুকে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। তারপর একটা বেঞ্চে বসে ভাবতে লাগলাম কী করা যেতে পারে। হঠাৎ দেখলাম একজন তরুণ পাদরি আপনমনে একটা প্রার্থনার বই পড়তে পড়তে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে সুপ্রভাত জানিয়ে হাতের বইটা বন্ধ করলেন এবং আমরা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে লাগলাম। কথা বলে এই তরুণ পাদরিটিকে আমার বেশ ভালো লাগল। ভাবলাম তাহলে ওঁনাকে আমার স্বপ্নের কথাটা বলা যেতে পারে, হয়তো উনি বিশ্বাসও করতে পারেন। তাই সাহস করে আমার স্বপ্নের কথা বললাম।

আমার কথা শুনে মনে হল, উনি পুরোপুরি বিশ্বাস করেছেন। উনি আমার দিকে তাকিয়ে একটু মৃদু হেসে বললেন—আমি আপনাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করব। আপনি আর কোনো কিছু ভাববেন না। আপনার যা যা দরকার সবই আমি করে দেব। কথা দিলাম আজ রাতে আমি আপনার বাড়িতে যাব। এই তরুণ পাদরিটি কাছ থেকে কথা পেয়ে আমি খুব নিশ্চিন্ত হলাম। মনের আনন্দে বাড়ি ফিরে এলাম।

রাত্রিবেলায় কয়েকজন বন্ধু আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। তাদের আমি এই ব্যাপারে সব কথা বললাম। বন্ধুরা সব কথা শুনে খুবই উৎসাহী হয়ে অনুরোধ করল—আমরাও এই রাতে এই ঘরে থাকতে চাই। দয়া করে তুমি পাদরিকে জিজ্ঞাসা করো প্রার্থনার সময় আমরা উপস্থিত থাকতে পারব কি না। আমারও মনে মনে ইচ্ছা এই ঘটনায় বন্ধুরা উপস্থিত থাকুক।

সবাই মিলে গল্প করতে লাগলাম। সময় হু হু করে কেটে যেতে লাগল। বারোটা বাজতে যখন পনেরো মিনিট বাকি—ঠিক সেই সময় দরজার কাছে

পাদরির পায়ের শব্দ পেলাম। ওঁনাকে আমি বন্ধুদের মনোবাসনা জানালাম। উনি বললেন—আমার কোনো আপত্তি নেই। আপনার বন্ধুরা সবাই উপস্থিত থাকতে পারেন।

পাদরির মত পেয়ে আমরা সবাই খুশি হলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা সবাই মিলে ধীরে পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলাম। অনুষ্ঠানের মধ্যে কোনো রহস্যজনক কিছুই চোখে পড়ল না। কিন্তু ঘরটায় ঢুকে মনে হল মৃত্যুর পরিবেশেই আমরা রয়েছি। কী নিস্তব্ধ, নিথর চারিদিক। মোমবাতির ম্লান আলোয় পাদরির মুখটা আমার কাছে খুবই রহস্যময় বলে মনে হল। কী নিবিষ্ট মনে প্রার্থনা করছেন। আমি শুধু সেদিকেই চেয়ে দেখতে লাগলাম। প্রার্থনা শেষ হলে সবাই আমরা নীচে নেমে এলাম। তারপর তরুণ পাদরিটি আমাদের সকলকে বিদায় জানিয়ে আস্তে আস্তে চলে গেলেন।

এইভাবে কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল। আমি মনে মনে খুবই নিশ্চিন্ত হলাম। স্বপ্ন দেখার আর কোনো উৎপাত রইল না। প্রার্থনার দিন থেকেই আমি শান্তিতে ঘুমুতে পাচ্ছিলাম। কোনো রকম গোলমাল হয়নি। বেশ সুখেই বাড়িটায় ছিলাম।

হঠাৎ একদিন সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামবার সময় দেখলাম একদল রাজমিস্ত্রি আর জলের কলের মিস্ত্রি ঘরের সঙ্গে রাস্তার যোগাযোগ করাবার জন্যে দরকারি কী সব কাজকর্ম করছিল। ওদের ঘরের মেঝের পাথর তোলবার দরকার ছিল তাই তারা পাথর উঠিয়ে মাটির তলায় একটা কুয়ো আবিষ্কার করল। সেদিন সবাই খুব অবাক হয়ে দেখেছিল কুয়োটা। আমি কিন্তু একটুও আশ্চর্য হয়নি। কারণ আমি এই মাটির তলার ঘর ও বাড়ির নীচে কুয়োর কথা সবই স্বপ্নে দেখেছিলাম।

এই ঘটনার বেশ কিছুদিন পরে একটি পত্রিকায় খবরটি প্রকাশ পায়। ঘটনাটির বিবরণ ছিল এমনি: আরম্ভের প্রথমেই ছিল—মাটির নীচে মনুষ্যদেহাবশেষ। চমকপ্রদ আবিষ্কার। কিংস বেঞ্চওয়াদের একটা বাড়ি মেরামত করবার সময় মিস্ত্রিরা একতলা ঘরের নীচে একটা কুয়ো আবিষ্কার করেছে এবং কুয়োর তলায় পাওয়া গেছে একটা তরুণীর কঙ্কাল ও একটা তরবারি। তরবারিটা পরীক্ষা করে দেখা গেছে তাতে দ্বিতীয় জেমসের রাজত্বকালের তারিখ দেওয়া আছে। এতে প্রমাণ হচ্ছে, নিশ্চয় কোনো রোমান্সজনিত ঘটনা রয়েছে। তাছাড়া রহস্যপূর্ণ নারীর মৃত্যু—এইসব মিলিয়ে এই বাড়িটায় একটা গোপন রহস্য এতদিন ধরে ছিল।

সত্যি কথা বলতে কী—এই ঘটনার পর আমার জীবন অনেকখানি পার হয়ে গেছে—তবুও যখন নির্জনে ভাবতে বসি, তখন কিছুতেই এই ঘটনার রহস্যটা খুঁজে পাই না। ভাবি, এটা কি নিছক স্বপ্ন না অন্য কিছু। আজও উত্তর পাইনি।

এখন যাঁদের দেখছি
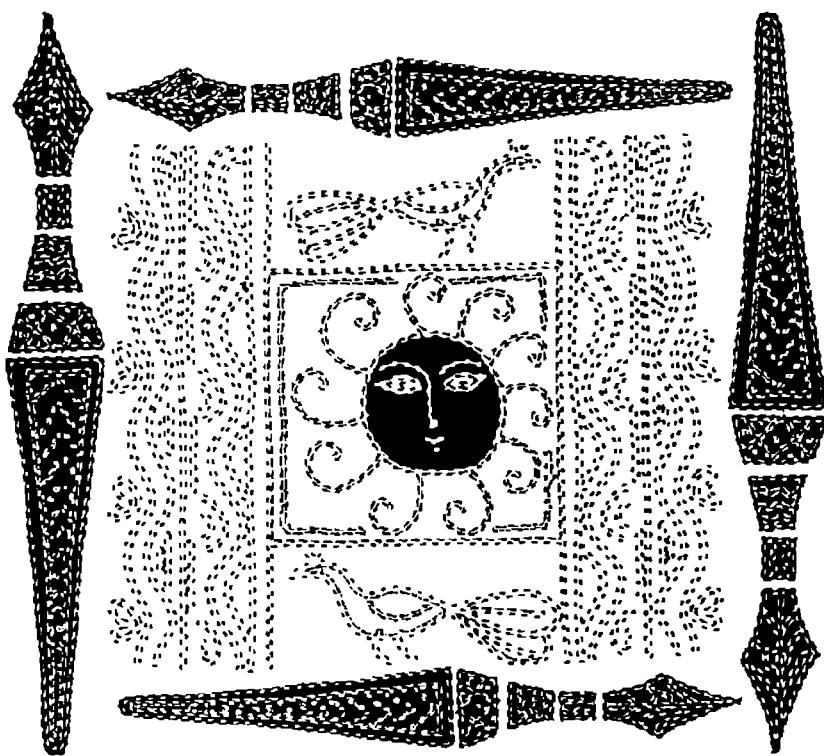
ইনি, উনি, তিনি

আমার যখন বাল্যকাল, তখন স্বর্গীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয় ছিল বর্তমান বাড়ি ছাড়িয়ে একটু উত্তর দিকে। তখনও সাহিত্যিক হইনি, কিন্তু মনের মধ্যে সাহিত্যমদিরা পানের ইচ্ছা ছিল যথেষ্ট প্রবল। কেতাব কেনবার জন্যে প্রায়ই যেতুম ওখানে। তার নাম ছিল তখন বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরি। একটি অপনাম। নাটক, নভেল ও কবিতা প্রভৃতি যেখানে প্রধান বিক্রেয়, সেখানে 'মেডিক্যাল' শব্দটির আবির্ভাব কেন, এমন প্রশ্ন জাগতে পারে অনেকেরই মনে। শুনেছি, গুরুদাসবাবু বইয়ের ব্যাবসা শুরু করেন প্রথমে ডাক্তারি কেতাব নিয়েই। তারপর ব্যবসায়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সেখানে সাহিত্য সম্পর্কীয় গ্রন্থমালাই প্রাধান্য লাভ করে এবং পুস্তকালয়ের নামও পরিবর্তিত হয়। কিন্তু লোকে সংক্ষেপে তার নাম রেখেছিল 'গুরুদাস লাইব্রেরি'।

ওখানকার বর্তমান অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে সর্বদাই দেখতুম ছেলেবেলায় বই কিনতে গিয়ে। কাঁচা বয়সেই বইয়ের ব্যবসায়ে তিনি পিতাকে সাহায্য করতেন। পরে যে আমি হব গ্রন্থকার এবং তিনি হবেন আমার অন্যতম প্রকাশক, তখন এটা ছিল আমার স্বপ্নের অগোচর। তাঁর আগেকার চেহারা আমার বেশ মনে পড়ে। আজ তিনি প্রাচীন, কিন্তু এখনও তাঁর মধ্যে সেই নবীন বয়সের আদল খুঁজে পাওয়া যায়, সাধারণত যা দেখা যায় না।

অর্ধ শতাব্দী আগে কলকাতার বড়ো বড়ো রাজপথে—এমনকি অলিগলিতেও আজকের মতো বইয়ের দোকানের ছড়াছড়ি ছিল না। সাহিত্য সম্পর্কীয় কেতাবের দরকার হলে সবাই আগে যেত গুরুদাস লাইব্রেরিতে এবং আগেকার প্রত্যেক প্রখ্যাত লেখকেরই পুস্তক প্রকাশিত বা বিক্রীত হত ওইখান থেকেই। সেই সূত্রে ওখানে আনাগোনা করতেন সেকালকার নাম-করা বড়ো বড়ো সাহিত্যিকরা। রোদ পড়ে এলে গুরুদাসবাবু পুস্তকালয়ের বাইরে আসতেন। ফুটপাথের উপরে পাতা থাকত একখানি বেঞ্চি। তারই উপরে আসীন হয়ে তিনি আলাপ করতেন সমাগত সাহিত্যিকদের সঙ্গে। গুরুদাসবাবু যখন বৃদ্ধ ও দৃষ্টিশক্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, তখনও তিনি ছাড়তে পারেননি এই পূর্ব-অভ্যাসটি। বড়ো বড়ো সাহিত্যিকদের সঙ্গে চোখের দেখা হবে, এই লোভে বালক ও কিশোর বয়সে প্রায়ই আমি গুরুদাস লাইব্রেরির সামনে দিয়ে আনাগোনা করতুম। তখন সাহিত্যিকদের ভাবতুম, ভিন্ন জগতের বিস্ময়কর মানুষ। এখন মনের মধ্যে এমন মহাপুরুষার্চনের ভাব জাগ্রত

হয় কদাচ। এখন জেনেছি, অধিকাংশ তথাকথিত সাহিত্যিকই হচ্ছেন রাম-শ্যামের মতোই সাধারণ মানুষ। উপরন্তু কোনো কোনো নামজাদা সাহিত্যিকের চেয়ে অনামা রাম-শ্যামের সঙ্গ অধিকতর প্রীতিপদ ও নিরাপদ।

পরে গুরুদাস লাইব্রেরির মতো এম. সি. সরকারের পুস্তকালয়ও পরিণত হয়েছিল সাহিত্যিকদের মিলন-ক্ষেত্রে। কেবল 'ভারতী'র দলের নয়, 'কল্লোলে'র দলের সাহিত্যিকরাও সেখানে এসে আসর জমিয়ে তুলতেন। নজরুল, অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র, বুদ্ধদেব ও নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ প্রভৃতির সঙ্গে তো আগেই পরিচিত হয়েছিলুম, ওঁদের অন্যান্য সহযাত্রীর মধ্যে জসীমউদ্দীন, হুমায়ুন কবীর, অজিত দত্ত, ভূপতি চৌধুরী ও হেমচন্দ্র বাগচীর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয় এম. সি. সরকারের পুস্তকালয়েই। কেবল 'ভারতী'র ও 'কল্লোলে'র দলের নয়, অন্যান্য বহু বিখ্যাত ব্যক্তিও ওখানে আনাগোনা করতেন বা এখনও করেন—যেমন স্বর্গীয় ডক্টর সতীশচন্দ্র বাগচী, স্যর যদুনাথ সরকার, শ্রীরাজশেখর বসু ও শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী প্রভৃতি। এ জায়গাটি ছিল প্রবীণ ও নবীনদের কলাকেলির আসর।

'কল্লোলে'র আর একজন নিয়মিত লেখক হচ্ছেন, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মাতুল এবং সাহিত্যশিষ্য। শরৎচন্দ্রের লেখা গল্প 'মন্দির' প্রকাশিত হয় ১৩০৯ সালের 'কুন্তলীন পুরস্কার' নামক বার্ষিক গ্রন্থে। কিন্তু গল্পটি তিনি চালিয়ে দিয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথেরই নামে। তিনি কলকাতার লোক নন, তবে এখানে এলেই আমরা তাঁর দেখা পেতুম। 'ভারতী'র বৈঠকে এসে আলাপ-আলোচনা করতেন। মিতভাষী, কিন্তু গম্ভীর ছোটোখাটো সৌম্যদর্শন মানুষটি। তাঁকে আমরা নিজেদের গোষ্ঠীর ভিতরেই টেনে নিয়েছিলুম। আমরা বারোজন মিলে রচনা করেছিলুম 'বারোয়ারি উপন্যাস'—তার লেখকদের নাম হচ্ছে প্রমথ চৌধুরী (বীরবল), প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও হেমেন্দ্রকুমার রায়। 'ভারতী'তেই এই শ্রেণির আয়োজন করেন প্রথমে সরলা দেবী, তারপর মণিলাল। 'বারোয়ারি উপন্যাসে'র শেষাংশের ভার নিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যখন তাঁর পালা এল তখন তিনি ইউরোপে। কাজেই শেষরক্ষা করবার ভার নেন প্রমথ চৌধুরী।

বয়সে নবীন 'কল্লোলে'র লেখকদের দলে ভিড়ে বয়সে প্রবীণ সুরেন্দ্রনাথ কিছুমাত্র অসুবিধা বোধ করেননি, এটা তাঁর মানসিক তারুণ্যেরই পরিচয় দেয়। 'কল্লোলে' তিনি ধারাবাহিকভাবে শরৎচন্দ্রের জীবনকথা লিখেছিলেন, মাসিকপত্রে

শরৎচন্দ্রের জীবন নিয়ে আলোচনা সেই বোধ করি প্রথম। তারপর 'ভারতবর্ষে' ও শরৎচন্দ্রের প্রসঙ্গ নিয়ে লেখনী চালনা করেন। তিনি একজন শক্তিশালী লেখক। উপন্যাসে ও ছোটোগল্পে রীতিমতো দক্ষতা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু একনাগাড়ে সাহিত্যশ্রম বোধ হয় তাঁর কাছে রুচিকর নয়। মাঝে মাঝে বেশ কিছুকাল ধরে কলম ছেড়ে তিনি সকলের চোখের আড়ালে বসে থাকতে ভালোবাসেন। ফলে গভীর রেখাপাত হয় না জনসাধারণের চলচিত্তে।

এম. সি. সরকারের পুস্তকালয়ে আরও দুজন আধুনিক সাহিত্যিকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, যাঁরা রচনায় বিশেষ গুণপণা দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত ভেস্তে গিয়েছেন। এঁদের একজন হচ্ছেন সদালাপী প্রসন্নমুখ শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু। 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত তাঁর 'রমলা' উপন্যাস সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাঁর অন্যান্য রচনাও আছে। আর-একজন হচ্ছেন শ্রীভূপতি চৌধুরী। 'কল্লোল' দলভুক্ত গল্পলেখক। লেখক হিসাবে এঁরা দুইজনেই সাহিত্যক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে যেতে পারতেন। কিন্তু, মণীন্দ্রলাল ব্যারিস্টার এবং ভূপতি বাস্তুকার হয়ে এখন লক্ষ্মীর ঝাঁপি থেকে অল্পবিস্তর হস্তগত করবার জন্যে এতই ব্যস্ত হয়ে আছেন যে, সরস্বতীর মুখ দেখবার ফুরসত পান না। এবং এই দলের লোক বলেই গণ্য করতে পারি হুমায়ুন কবীর ও শ্রীমণীশ ঘটককেও। তাঁদেরও বোধ হয় আর বাংলা সাহিত্যের স্বপ্ন দেখবার অবসর নেই।

সব বীজে চারা জন্মায় না। কিন্তু চারা দেখা দিয়ে বড়ো হয়ে দু-এক বার রঙিন ফুল ফুটিয়ে যদি ফুল ফুটানোর পালা অসময়েই সাঙ্গ করে দেয়, তাহলে মনে থাকে না আক্ষেপের অবধি। পুষ্পিত হতে পারি, কিন্তু পুষ্পিত হব না। শক্তি আছে, কিন্তু শক্তিকে রাখব শ্রমবিমুখ করে। এই রীতি অনুসারে চললে শিল্পী কেবল নিজের উপরে নয়, অবিচার করেন শিল্পের উপরেও।

বাংলা সাহিত্যে এই শ্রেণির দুর্ঘটনা আরও দুই বার ঘটতে ঘটতে ঘটেনি। প্রমথ চৌধুরী জীবনের পূর্বার্ধে 'বীরবল' নামের আড়ালে থেকে কালেভদ্রে দুই-একটি প্রবন্ধ রচনা করতেন কথ্য ভাষায়। একে তো সেকালকার অতিশয় সাধু সাহিত্যিকরা কথ্যভাষাকে সুপথ্য বলে বিবেচনা করতেন না, তার উপরে ন-মাসে ছ-মাসে প্রকাশিত সেই রচনাগুলির ভিতরে প্রভূত মুনশিয়ানা থাকলেও সেগুলিকে মনে করা হত, চুটকি জিনিস বা ফালতো মাল। বীরবল যদি লেখাচ্ছলে কালি ছড়িয়ে সেই পর্যন্ত এগিয়েই থেমে যেতেন তাহলে স্থায়ী সাহিত্যের মজলিসে কলকে পেতেন না নিশ্চয়ই।

সৌভাগ্যক্রমে স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় হঠাৎ তাঁর স্কন্ধে চাপিয়ে দিলেন

'সবুজ পত্রে'র ভার। সবুজের সংস্পর্শে এসে প্রৌঢ় প্রমথ চৌধুরীরও চিত্ত হয়ে উঠল শ্যামল। মেতে উঠলেন তিনি এক নূতন অনুপ্রাণনায়, ভূরি-পরিমাণ রচনায় রচনায় ছেয়ে দিলেন 'সবুজ পত্র'কে। কথ্যভাষার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন বাংলা সাহিত্যের দরবারে, এমনকি নিজের পক্ষে টেনে আনলেন রবীন্দ্রনাথকেও এবং তিনিও অবলম্বন করলেন কথ্যভাষা। সবাই পেলে প্রমথ চৌধুরীর সম্যক পরিচয়। জানলে তিনি কেবল উচ্চশ্রেণির শিল্পী ও প্রথম শ্রেণির প্রবন্ধকার নন, সেই সঙ্গে শ্রেষ্ঠ কবি ও গল্পলেখকও।

শরৎচন্দ্র সতেরো বৎসর বয়স থেকেই সাহিত্যচর্চা আরম্ভ করেন। গল্পের পর গল্প, উপন্যাসের পর উপন্যাস লিখে যান। তাঁর 'বড়দিদি', 'চন্দ্রনাথ' ও 'দেবদাস' প্রভৃতি সেই প্রথম যুগেরই রচনা। সে সব রচনা তখনকার মতো পাণ্ডুলিপির আকারেই অপ্রকাশিত থাকে। তারপর লেখার পাট তুলে দিয়ে তিনি রেঙ্গুণে গিয়ে করেন কেরানিগিরি। প্রায় এক যুগ পর্যন্ত কেটে যায়। এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অখ্যাত ও অনাদৃত হয়ে তিনি হয়তো কেরানিগিরি করেই কাটিয়ে দিতেন। পরে তাঁর আত্মীয়-বন্ধুরা অপ্রকাশিত ও অপেক্ষাকৃত কাঁচা রচনাগুলি ছাপিয়ে দিলেও শরৎচন্দ্রের নাম এমন অনন্যসাধারণ হতে পারত না।

কিন্তু তা হবার নয়। বন্ধুবান্ধবের বিশেষ পীড়াপীড়িতে এবং 'যমুনা' সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালের নির্বন্ধাতিশয়ে শরৎচন্দ্রে আবার এক যুগ পরে লেখনী ধারণ করতে বাধ্য হলেন। সঙ্গে সঙ্গে সার্থক হয়ে উঠল তাঁর পুনরাগমন, তাঁর রচনাগুলি কাজ করলে মন্ত্রশক্তির মতো, দিকে দিকে শোনা গেল বহু কণ্ঠের অভিনন্দন। তখন নতুন প্রেরণা লাভ করে মাছি-মারা কেরানি আবার এসে বসলেন রূপস্রষ্টা শিল্পীর আসনে। বাংলা সাহিত্য বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের পরে, আবার লাভ করলে একজন প্রথম শ্রেণির ঔপন্যাসিককে। প্রমথ চৌধুরী ও শরৎচন্দ্রের মন ফিরেছে দৈব ঘটনার জন্যে। তা না হলে কত মহান দান থেকে বঞ্চিত হতে বাংলা সাহিত্য।

'কল্লোলে'র আর এক আড্ডাধারী হচ্ছেন শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। সাহিত্যক্ষেত্রে বিচরণ করছেন বহুকাল, 'কল্লোল' সম্পাদক ছাড়া দলের আর সকলের চেয়ে বয়সেও বড়ো। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে এবং নানা সাহিত্য-বৈঠকে আনাগোনা করে তিনি বাংলা দেশের অধিকাংশ প্রখ্যাত সাহিত্যিকের সঙ্গে স্থাপন করেছেন বন্ধুত্বের সম্পর্ক। তাঁর রচনাশক্তিও আছে, কিন্তু অনুবাদের দিকেই ঝোঁক বেশি। তিনি অনেকগুলি বিদেশি বই তর্জমা করেছেন।

কবি জসীমউদ্দীনের চেহারাখানিও মেঠো এবং সাধারণত রচনাও করেন

মেঠো কবিতা। তাঁর এক-একটি কবিতা নগরের ইষ্টককোটরে বহন করে আনে গ্রাম্য মাটির সোঁদা গন্ধ। নিজের জন্যে তিনি বেছে নিয়েছেন বিশিষ্ট একটি পথ—তার উপরে আছে মুক্ত নীলিমার আশীর্বাদ এবং ছায়াতরুর স্নিগ্ধ প্রসাদ; তার দুই পাশে আছে দিগন্তে বিলীন তেপান্তর ধানের খেতের হরিৎ ফসল আকাশ-নীল সরোবর। শহর-পালানো মন পায় ছুটির আমোদ।

'কল্লোলে'র অধিকাংশ লেখক উপন্যাস, গল্প ও কবিতা রচনার দিকে যতটা দৃষ্টি দিয়েছেন, প্রবন্ধ রচনা ও সমালোচনার দিকে ততটা দেননি। কেবল গল্প ও পদ্য নিয়ে কোনো সাহিত্যই পরিপূর্ণতার দাবি করতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকাররূপেও প্রচুর খ্যাতিলাভ করেছেন।

'কল্লোল' গোষ্ঠীর ভিতরে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের বেলায় এর ব্যতিক্রম দেখি। প্রবন্ধের সঙ্গেই তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এবং তাঁর অনেক প্রবন্ধই গল্পের মতো চিত্তহারী ও কবিতার মতো উপভোগ্য। ওই দলের আর-একজন লেখক হচ্ছেন শ্রীঅজিত দত্ত। অদ্যাবধি তাঁর সাহিত্যসেবা অব্যাহত আছে। কিছু লাজুক, শান্তশিষ্ট, সুদর্শন চেহারা। বুদ্ধদেবের বাল্যবন্ধু, অল্পবয়স থেকে একসঙ্গে সাহিত্যচর্চা শুরু করেন তাঁরা দুজনেই। অজিত একাধারে কবি ও প্রবন্ধকার। কিছুদিন আগে 'বৈরত' ছদ্মনামে তাঁর রচিত একখানি বই পড়েছি, তার নাম 'মনপবনের নাও'। প্রধানত সাহিত্য ও চারুকলা নিয়ে সাতাশটি নিবন্ধের সমষ্টি। দৃষ্টি তাঁর রসিক সমালোচকের। তাঁর সব মতই যে সকলের মনের মতন হবে, এমন আশা কেউ করে না। কিন্তু তিনি যা কিছু দেখেছেন, যা কিছু বলেছেন, মুক্ত দৃষ্টি আর মুক্ত মন নিয়েই দেখেছেন এবং বলেছেন। তাঁর ভাষার ও বক্তব্যের দুই টুকরো নমুনা দি।

১) 'তথাকথিত মাইনর লেখকেরা প্রত্যেক দেশের কাব্যসাহিত্যের একটা বিশিষ্ট অংশের রচয়িতা। অন্যান্য সাহিত্যের মতো বাংলা সাহিত্যের একটা উৎকৃষ্ট ও বৃহৎ অংশ যে অজ্ঞাতনামা লেখকদের লেখা একথা কে না জানে? লোকসাহিত্য এবং পদাবলী সাহিত্যের অজ্ঞাত ও প্রচ্ছন্ননামা লেখক তো অসংখ্য। এখানে নামজাদা বা মেজর-মাইনরের প্রশ্ন ওঠে না। ভালো-মন্দ লেখার প্রশ্নই সর্বপ্রধান।'

২) 'কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীদের বিশেষ করে নির্জনতা খুঁজে বেড়াতে হয় চোখের দেখা মানুষগুলোকে মনের দেখা দেখবার জন্য। সেই দেখা না দেখলে তাদের নিয়ে সৃষ্টি হয় না, আঁকা যায় না তাদের স্পষ্ট করে। বাইরের দেখা, বাইরের শোনা, বাইরের পাওয়া না ফুরোলে মনের দেখা মনের শোনা মনের পাওয়া শুরু হয় না।'

রাজারাও ধীরেন্দ্রনারায়ণ

বাংলা দেশে এমন সব সাহিত্যিকের অভাব নেই, যাঁদের ভূষণ হচ্ছে রাজা বা মহারাজা উপাধি। বিশেষভাবে কয়েকজনের নাম মনে পড়ে।

নাটোরের রাজবংশ বহুদিন থেকেই রচনাশক্তির জন্যে বিখ্যাত। রানি ভবানীর পুত্র মহারাজা রামকৃষ্ণ রায় সংগীত রচনায় প্রভূত কৃতিত্ব প্রকাশ করে গিয়েছেন। গায়কদের বৈঠকে আজও শোনা যায় তাঁর রচিত কোনো কোনো গান। যেমন—

'মন যদি যায় ভুলে।
তবে বালির শয্যায় কালীর নাম
দিও কর্ণমূলে।'

মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় ছিলেন উচ্চশ্রেণির কবি, সন্দর্ভকার ও সম্পাদক। তাঁর পুত্র মহারাজা শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়ও কবি। যোগীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার শ্রীজয়ন্তনাথ রায় রচিত কাব্যপুস্তক 'স্বর্ণরেখা' আমি পাঠ করেছি। কবিতাগুলির মধ্যে দক্ষ হাতের ছাপ লক্ষ করা যায়। বাংলা গদ্যসাহিত্যের অন্যতম স্রষ্টা ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। সাহিত্যিকরূপে প্রথম জীবন আরম্ভ করে পরে রাজা বা মহারাজা খেতাব পেয়েছেন তিনজন সুপরিচিত ব্যক্তি—রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও রাজা স্যর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। মাত্র ষোলো বৎসর বয়সেই সৌরীন্দ্রমোহন নাটক ('মুক্তাবলী') রচনা করেছিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব 'শব্দকল্পদ্রুমে'র জন্যে অক্ষয় খ্যাতি অর্জন করেছেন। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবেরও ইংরেজি ভাষায় লিখিত গ্রন্থ আছে। বর্ধমানের মহারাজা বিজয়চন্দ্র মহতাব কয়েকখানি পুস্তকের লেখক। কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দীও গ্রন্থকার। সুসঙ্গের রাজা কুমুদচন্দ্রও ছিলেন সাহিত্যিক।

লালগোলার কুমার ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় যখন 'রাজা' উপাধি লাভ করেননি, তখন থেকেই একান্তভাবে সাহিত্যসেবা করে আসছেন। এই সাহিত্যানুরাগের উৎস কোথায় তা অনুমান করা কঠিন নয়। তাঁর পিতামহ দানবীর মহারাজা রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় অবাঙালি হয়েও বাংলা দেশে এসে মনেপ্রাণে খাঁটি বাঙালি হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি যে বাংলা সাহিত্যের কতবড়ো বন্ধু ছিলেন, সে কথা এখানে নতুন করে বলবার দরকার নেই। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে তাঁর স্মরণীয় অবদান আছে। অসংখ্য সাহিত্যিক অলংকৃত করতেন তাঁর আসর। এমনকি সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত কিছুদিনের জন্যে তাঁর আতিথ্য স্বীকার করে রাজবাড়িতে বসে রচনা করেছিলেন 'আনন্দমঠে'র কিয়দংশ। এই পরিবেশের

মধ্যে সুকুমার বয়স থেকে মানুষ হয়ে ধীরেন্দ্রনারায়ণেরও চিত্তে উপ্ত হয়েছিল সাহিত্যের বীজ।

তারপর তিনি দীর্ঘকালব্যাপী ছাত্রজীবন যাপন করেন আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর অধীনে এবং তাঁর কাছেই ধীরেন্দ্রনারায়ণের সাহিত্যশিক্ষা আরম্ভ হয়। এমন অসাধারণ সাহিত্যবীরকে উপদেশকরূপে লাভ করেই তিনি বঙ্গবাণীর পরম ভক্ত না হয়ে পারেননি। রামেন্দ্রসুন্দর ও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন পরস্পরের অনুরাগী এবং দুজনেই আনাগোনা করতেন দুজনের আলয়ে। সেই সময়ে প্রায়ই উপস্থিত থাকতেন কিশোর ধীরেন্দ্রনারায়ণ এবং দুই সাহিত্যশিল্পীর কলালাপের ফাঁকে ফাঁকে আবৃত্তি করতেন রবীন্দ্রনাথের কবিতা। তাঁর তরুণ কণ্ঠে স্বরচিত কবিতার আবৃত্তি শুনে রবীন্দ্রনাথ আনন্দপ্রকাশ করতেন।

সুতরাং বোঝা যায়, সাময়িক খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্যে তিনি হঠাৎ সাহিত্যিক হয়ে ওঠেননি। সাহিত্য তাঁর আবাল্য সাধানার বস্তু। দীর্ঘকাল ধরে তিনি লেখনী চালনা করে আসছেন। গল্প লিখেছেন, উপন্যাস লিখেছেন, কবিতা ও সংগীত রচনা করেছেন। একদিন বাড়িতে ফিরে এসে দেখি, আমার লেখবার টেবিলের উপরে পড়ে রয়েছে একটি হস্তলিখিত কবিতা। পাঠ করে বুঝলুম, ধীরেন্দ্রনারায়ণ এসেছিলেন, কিন্তু আমার দেখা না পেয়ে সেইখানেই বসে কবিতাটি রচনা করে রেখে গিয়েছেন। কিছুকাল আগে তিনি 'নীল শাড়ি' নামে একখানি স্বরচিত নাটকও পাঠ করে শুনিয়ে গিয়েছেন। নাটকখানি আমার ভালো লেগেছিল। তাঁর দুইখানি উপন্যাসের নাট্যরূপ রঙ্গমঞ্চের উপরে প্রদর্শিত হয়েছে। কিন্তু এই মৌলিক নাটকখানি এখনও পাদপ্রদীপের সামনে স্থাপিত হয়নি।

নাট্যজগতের দিকেও তাঁর আকর্ষণ খুব প্রবল। শুনেছি লালগোলায় তিনি বড়ো বড়ো ভূমিকায় শৌখিন অভিনেতারূপে দেখা দিয়েছেন। তাঁর কোনো অভিনয় দেখবার সুযোগ আমার হয়নি বটে, কিন্তু কলকাতার বিভিন্ন রঙ্গালয়ের প্রেক্ষাগৃহে নাট্যরসিক দর্শকরূপে তাঁকে উপস্থিত থাকতে দেখেছি।

স্টার থিয়েটারের প্রেক্ষাগৃহেই তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। ঊনত্রিশ-ত্রিশ বৎসর আগেকার কথা। লক্ষ করলুম, একটি সুদর্শন, দীর্ঘদেহ যুবক দূর থেকে ঘন ঘন আমার দিকে তাকিয়ে দেখছেন। তারপর তিনি নিজেই আমার কাছে এসে আলাপ করলেন। পরিচয় পেয়ে জানলুম, তিনি হচ্ছেন লালগোলার কুমার ধীরেন্দ্রনারায়ণ। বললেন, 'আমি আপনার পরম ভক্ত।' কী গুণে আমি তাঁকে আকৃষ্ট করেছিলুম জানি না, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক হয়ে উঠল অত্যন্ত নিবিড়। লালগোলা থেকে কলকাতায় এলেই তিনি

আমার বাড়িতে ছুটে আসতেন। দীর্ঘকাল ধরে গল্পসল্প চলত—আজও চলে। আমি আজকাল বাড়ির বাইরে পারতপক্ষে পা বাড়াই না, কিন্তু তিনি আমার বাড়িতে এসে উপস্থিত হন যখন তখন এবং অভিযোগ করেন, কেন আমি তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করি না?

একদিন সন্ধ্যায় আমাকে নিয়ে তিনি বেড়াতে বেরিয়ে গঙ্গার ধারে গিয়ে পড়লেন। তারপর দুইজনে গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে বসলুম গড়ের মাঠের এক বেঞ্চের উপরে। আমি টানতে লাগলুম সিগারেট, তাঁর জন্যে অনুচর নিয়ে এল আলবোলা।

ধীরেন্দ্রনারায়ণ বললেন, 'উঁহু, খালি ধোঁয়া খেয়ে তো পেট ভরে না দাদা! আপনাকে কিছু নিরেট খাবার খেতে হবে।'

আমি বললুম, 'এই গঙ্গার ধারে খাবার কোথায় পাবেন?'

'আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখনই আসছি'—বলেই তিনি আবার গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। তারপর নিজে চাঙ্গুয়া হোটেলে গিয়ে খাবার কিনে আবার হাসতে হাসতে ফিরে এলেন। সঙ্গে অনুচর ছিল, গাড়ির চালক ছিল, কিন্তু তবু তিনি খাবার কেনবার ভার দিলেন না তাদের হাতে। স্বহস্তে খাবার না কিনে এনে তাঁর তৃপ্তি হল না।

তাঁর বন্ধুপ্রীতি ও আন্তরিকতার আরও কত প্রমাণই যে পেয়েছি! আমার সহধর্মিণী যখন পরলোকে গমন করেন, তখন তিনি শিলং-এ গিয়েছিলেন বায়ু পরিবর্তনের জন্যে। কিন্তু খবর পেয়েই তিনি কলকাতায় ফিরে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে করুণ স্বরে বললেন, 'দাদা, আপনার এই সর্বনাশের কথা শুনে না এসে থাকতে পারলুম না।'

নানা ব্যসনের জন্যে ধনিকদের নাম হয় কুবিখ্যাত। ধীরেন্দ্রনারায়ণেরও যদি কোনো ব্যসন থাকে এবং যদি তাকে ব্যসন বলা যায়, তবে তা হচ্ছে, সাহিত্য ও শিল্প। সাহিত্যিক ও শিল্পীদের সাহচর্য লাভ করবার জন্যে সর্বদাই তিনি প্রভূত আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন। এবং তাঁদের সঙ্গে মেলামেশা করেন সমকক্ষ, নিরভিমান, অমায়িক সুহৃদের মতোই। ভালোবাসা তাঁর সোদরপ্রতিম। কেবল ভালোবাসা নয়, দুঃস্থ সাহিত্যিকদের অভাব-অভিযোগের কথা শুনলে তৎক্ষণাৎ তিনি হন মুক্তহস্ত। কত সাহিত্যিককে তিনি যে গোপনে অর্থসাহায্য করেছেন, এ কথা বাইরে কোনো দিন প্রকাশ পায়নি।

জমিদারি প্রথা তুলে দেওয়া হল। এ প্রথা ভালো কি মন্দ, তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাই না। কিন্তু এ প্রথা উঠে গেলে দেশে আর কেউ কাশিমবাজারের

মণীন্দ্রচন্দ্র ও লালগোলার যোগীন্দ্রনারায়ণের মতো দান-শৌন্ড মহারাজার নাম শুনতে পাবে না। মহারাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ গোপনে যে বিপুল অর্থদান করে গিয়েছেন, কাকপক্ষীকেও তা টের পেতে দেননি। কিন্তু তাঁর যে অন্যান্য দানের হিসাব পাওয়া যায়, তার পরিমাণ হবে প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকা!

এমন মহাদাতার পৌত্র হয়ে ধীরেন্দ্রনারায়ণও যে বংশের ধারা বজায় রাখবার চেষ্টা করবেন সে কথা অনায়াসেই অনুমান করা যায়। সাধারণ সৎকার্যে অকাতরে অর্থব্যয় করবার জন্যে সর্বদাই তিনি প্রস্তুত। বীরভূম জেলার কলেশ্বর নামক স্থানে পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করে প্রকাণ্ড এক শিবমন্দির নির্মাণ করে তিনি নিজের ধর্মপ্রাণতার পরিচয় দিয়েছেন। বাংলা দেশের বয়েজ স্কাউটদের জন্যেও দান করেছেন পঞ্চাশ হাজার টাকা। তাঁর সমগ্র দানের পরিমাণ আমার জানা নেই বটে, তবে এ কথা আমি জানি যে, বহু আশ্রম, বহু প্রতিষ্ঠান ও বহু অভাবগ্রস্ত পরিবারকে দরাজ হাতে সাহায্য করতে কুণ্ঠিত হননি। আজ তাঁর জমিদারির অধিকাংশ হয়েছে পাকিস্তানের কুক্ষিগত, কিন্তু এখনও হতে পারেননি তিনি হাতভারী।

মনের জোরও তাঁর কম নয়। ইংরেজ আমলে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিলে উপাধিকারী পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণকে যথেষ্ট বিপন্ন হতে হত। তিনি কিন্তু নির্ভয়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। লবণ আইন সংক্রান্ত সত্যাগ্রহের সময়ে স্বয়ং অগ্রণী হয়ে সর্বপ্রথমে নিষিদ্ধ লবণ ক্রয় করতে বিরত হননি। এজন্যে সরকারপক্ষ থেকে অভিযোগ এসেছিল স্বর্গীয় মহারাজের কাছে। এমনকি তাঁর বন্দুকের লাইসেন্স পর্যন্ত বাতিল করে দেবার প্রস্তাব হয়েছিল। তিনি কিন্তু ভয় পাননি। বহরমপুরের জেলখানায় গিয়ে রাজনৈতিক বন্দিদের সঙ্গে দেখা করতেন। প্রহরীদের উৎকোচে বশীভূত করে আড়ালে সরিয়ে দিয়ে বন্দিদের মধ্যে করতেন অর্থবিতরণ।

একবার 'মিলনী' সমিতি স্টিমার-পার্টির আয়োজন করে, ধীরেন্দ্রনারায়ণ তখনও রাজা উপাধি পাননি। রবীন্দ্রনাথকে আসবার জন্যে আমন্ত্রণ করা হয়, তিনি কিন্তু অনিচ্ছুক। তখন ধীরেন্দ্রনারায়ণ তাঁকে ধরে আনতে গেলেন এবং তিনিও হাসিমুখে ধরা দিতে আপত্তি করলেন না। বালক ধীরেন্দ্রনারায়ণ তাঁর কাছ থেকে আদর পেয়েছেন এবং শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ও লালগোলার মহারাজের কাছে ঋণী। এ দানের কথা বাইরের কেউ জানত না, প্রকাশ পেয়েছে কেবল রবীন্দ্রনাথেরই এক পত্রে: 'লালগোলার রাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের বদান্যতায় আমাদের বিদ্যালয় রক্ষা পাইয়াছে।' কাজেই ধীরেন্দ্রনারায়ণের হস্তে আত্মসমর্পণ করে রবীন্দ্রনাথ এসে উপস্থিত হলেন স্টিমার-পার্টিতে।

ধীরেন্দ্রনারায়ণ বললেন, 'আপনার স্পর্শ পেয়ে আমাদের তরী আজ সোনার তরী হয়ে উঠেছে।'

রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, 'তুমি সুন্দর কথা বলেছ।'

সেখানে হাজির ছিলেন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রও। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁরও ফোটো তোলা হল।

শরৎচন্দ্র খুশি হয়ে ধীরেন্দ্রনারায়ণকে বলেছিলেন, 'কুমার, আপনার কাছে আমি ঋণী। আমার অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল রবীন্দ্রনাথের পাশে বসে ফোটো তুলি। আপনারই জন্যে আমার সে ইচ্ছা এতদিনে পূর্ণ হল।'

একবার মুর্শিদাবাদে গিয়েছিলুম বাংলার হতভাগ্য নবাব সিরাজদ্দৌলার সমাধি দেখবার জন্যে। সেখান থেকে লালগোলা খুব কাছে। ধীরেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম।

তখন প্রায় দুপুরবেলা। প্রাসাদের ফটক পেরিয়ে সুদীর্ঘ চবুতর অতিক্রম করে গাড়ি-বারান্দার কাছে এসে দেখি, হাঁটুর উপরে তোলা একখানা ময়লা কাপড় পরে ধীরেন্দ্রনারায়ণ আদুর গায়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, ভৃত্য তাঁর সর্বাঙ্গে তেল মাখিয়ে দিচ্ছে। প্রথমটা এমন অবাক হয়ে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন, যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারলেন না—যেন পর্বত এসে উপস্থিত হয়েছে মহম্মদের কাছে।

তারপর আমার রচিত একটি গানের পংক্তি উদ্ধার করে বলে উঠলেন, 'নয়ন য'দিন রইবে বেঁচে তোমার পানেই চাইব গো!' এবং বিপুল আনন্দে সেই এক-গা তেল মাখা অবস্থাতেই দীর্ঘ দুই বাহু বিস্তার করে আমাকে আলিঙ্গন করবার জন্যে ছুটে এলেন। বহু কষ্টে তাঁর সেদিনকার ভালোবাসার অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষা করতে পেরেছিলুম।

তারপর সে কী যত্নাদর, যার তুলনা হয় না। আধ ঘণ্টা পরেই এল এতরকম খাবার যে, আসনে বসে হাত বাড়িয়ে সব পাত্রের নাগাল পাওয়া যায় না।

বৈকালের পরে আমাকে তিনি টেনে নিয়ে গেলেন পাখি শিকার করবার—অর্থাৎ দেখবার জন্যে। তরুশ্যামল লালগোলার উপকণ্ঠ। তৃণহরিৎ প্রান্তর। এখানে-ওখানে থই থই করছে জল। সূর্য অস্তাচলে। সন্ধ্যা আসন্ন। শুনেছি 'স্নাইপ' বা কাদাখোঁচা পাখি শিকার করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু সেই প্রায়ান্ধকারেই ধীরেন্দ্রনারায়ণ উপরি উপরি বন্দুক ছুড়ে স্নাইপদের মাটির উপরে পেড়ে ফেললেন, একবারও তাঁর লক্ষ্য ব্যর্থ হল না।

ধীরেন্দ্রনারায়ণের বন্ধুত্বলাভ, আমার জীবনের একটি স্মরণীয় আনন্দ।

উদয়শংকরের আত্মপ্রকাশ

শিষ্ট বাঙালিরা মিষ্ট লাগলেও নৃত্যকে ভদ্র কাজ বলে মনে করতেন না। রঙ্গালয়ে 'আলিবাবা', 'আলাদীন' ও 'আবুহোসেন' প্রভৃতি নৃত্যগীতপ্রধান পালার জনপ্রিয়তা দেখে বেশ বোঝা যায়, নাচ দেখতে তাঁরা ভালোবাসতেন। মড অ্যালান ও আনা পাবলোভা প্রভৃতি নর্তকীরা কলকাতায় এসে বাঙালিদের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন প্রভূত অভিনন্দন। ভদ্রসমাজে তরফাওয়ালীদেরও কম কদর ছিল না। কিন্তু শিক্ষিত সমাজের ছেলেমেয়েরা যে নাচবেন বা নাচ শিখবেন, এটা ছিল আগে স্বপ্নেরও অগোচর। যদিও শিশুবয়সে আমরা সকলেই নৃত্য করেছি, কিন্তু তার কারণ হচ্ছে সহজাত প্রবৃত্তি। বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই এ প্রবৃত্তিকে আমরা দমন করে ফেলতুম পরম সাবধানে।

তখন মেয়েদের মধ্যে নাচ ছিল পতিতাদের নিজস্ব। থিয়েটারের মধ্যে যে দুই-চারজন পুরুষ নৃত্যচর্চা করতেন, তাঁরা ছিলেন 'বখাটে' বলে কুবিখ্যাত। রাস্তায় রাস্তায় নিম্নশ্রেণির পুরুষরা গান গেয়ে নেচে বেড়াত, কিন্তু সে সব ছিল সঙের নাচ। সাত-আট বৎসর বয়সে এই রকম সঙের নাচে আমি সর্বপ্রথমে পুরুষ নাচিয়েকে দেখি। নাচের গানটির প্রথম কলিটি আজও আমার মনে আছেঃ

'বাংলাদেশের রংলা মুলুক
আমরা এনেছি।'

তখনকার থিয়েটারেও পুরুষদের নাচ ছিল অধিকাংশ স্থলেই সঙের নাচেরই মতো। পথে পথে পুরুষদের আর একরকম নাচ দেখা যেত। বাউল নাচ।

মধ্যযুগের বাংলা দেশে পুরুষদের মধ্যে উচ্চাঙ্গের নৃত্য প্রবর্তন করেছিলেন স্বয়ং চৈতন্যদেব। তাঁর জীবনী পাঠ করলেই বুঝতে বিলম্ব হয় না যে তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ নর্তক। কিন্তু ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন পুরুষদের উচ্চশ্রেণির নৃত্য বোধ করি এদেশে কোনোকালেই প্রচলিত ছিল না। গত শতাব্দীতে রামকৃষ্ণদেবও নৃত্য করতেন বটে, কিন্তু তারও মধ্যে ছিল ধর্মভাবের উন্মাদনা।

কিন্তু এদেশে যখন আর কোনো শিক্ষিত পুরুষ নাচের নূপুর পরেননি, তখনও আমি সম্ভ্রান্ত সমাজে দুইজন পুরুষের নাচ দেখবার সুযোগ পেয়েছি। প্রথমে নাচতে দেখেছিলুম স্বর্গীয় শিল্পী ও নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের সহচর যতীন্দ্রনাথ বসুকে। তারপর দেখেছিলুম রবীন্দ্রনাথকে, 'ফাল্গুনী' নাটকের অন্ধ বাউলের ভূমিকায়।

সাতাশ কি আটাশ বৎসর আগেকার কথা। রবীন্দ্রনাথ তখন বাংলা নৃত্যকলাকে

জাতে তোলবার চেষ্টা করছেন এবং তাঁরই তত্ত্বাবধানে শান্তিনিকেতনের কোনো কোনো তরুণী নাচের ভূমিকায় দেখা দিয়েছেন কোনো কোনো নাট্যাভিনয়ে। শিক্ষিত সমাজের বাঙালি ছেলেরা তখনও নাচের ডাকে সাড়া দেননি। সাড়া দেবেন কী, সাড়া দিতেও ভয় পেতেন। নিজে নাচা তো দূরের কথা, যবনিকার অন্তরালে থেকে সাহিত্যিক হয়েও শিশির-সম্প্রদায়ের জন্যে আমি কয়েকটি নৃত্য পরিকল্পনা করেছিলুম বলে একাধিক পত্রিকার দ্বারা বার বার তীব্র ও নোংরা ভাষায় আক্রান্ত হয়েছিলুম।

এমনি সময়ে একদিন ভারতবিখ্যাত প্রমোদ-পরিবেশক স্বর্গীয় হরেন ঘোষ, একটি চারুদর্শন তরুণ যুবককে নিয়ে আমার বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন।

হরেন বললেন, 'দাদা, এর নাম উদয়শংকর। ইনি ইউরোপ-আমেরিকায় আনা পাবলোভার নৃত্যসঙ্গী হয়ে নেচে এসেছেন। এখানেও ইনি নাচতে চান, কিন্তু কোথাও পাত্তা পাচ্ছেন না। কী উপায় করা যায় বলুন তো?'

অবাক হয়ে উদয়শংকরের দিকে তাকালুম। সুশ্রী মুখ, সুগঠিত দেহ—নাচের পক্ষে আদর্শ চেহারা বটে। আর পাবলোভার বিশ্ববিখ্যাত সম্প্রদায়ে যিনি স্থান পেয়েছেন, তাঁর নৃত্যনিপুণতা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না। কিন্তু বাংলা দেশে পুরুষের নাচ শিক্ষিতদের আসরে জমবে কি?

বললুম, 'হরেন, এঁকে একেবারে জনসাধারণের সামনে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করানো সমীচিন হবে না। তোমরা আগে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের কাছে যাও। আমার বিশ্বাস, তিনি কোনো একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন।'

আমার বিশ্বাস ভ্রান্ত হল না। অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করার পর স্থির হল, তিনি প্রাচ্য-কলা-সংসদের প্রকাণ্ড হলঘরটি উদয়শংকরের নাচের জন্যে ছেড়ে দেবেন এবং নাচের দিনে আমন্ত্রণ করা হবে কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিকদের।

ইতিমধ্যে ইউরোপের বিভিন্ন পত্রিকার উদয়শংকরের নাচের সমালোচনা পাঠ করে তাঁর সাফল্য সম্বন্ধে আমার মনে আর কোনো সন্দেহ রইল না। প্যারিসের La Grifie বলেছে: 'ছন্দ হচ্ছে এই সুন্দর নর্তকের অঙ্গবিশেষের মতো, ছন্দহিল্লোলে তিনি পরিপূর্ণ; তাঁর পিত্তলবর্ণ দেহের সমস্ত মাংসপেশি তাঁরই বশীভূত।' বার্লিনের Tempo বলেছে: 'এক উপভোগ্য অলৌকিক ব্যাপার! দেবতারা ধরায় অবতীর্ণ হয়েছেন এবং যেসব গতির দ্বারা নিজেদের চিত্তকে ব্যক্ত করেছেন, তার সঙ্গে কেবল ফুল ও দেবযানীর তুলনা চলতে পারে।' ভিয়েনার Neness Wiener Tageblatt বলেছে: 'উদয়শংকরের মূর্তি হচ্ছে যৌবনের মূর্তি—পাতলা, দেহ হিসাবে নিখুঁত এবং সেই সঙ্গে ভালো ইস্পাতের

মতো নমনশীল। তাঁর সকল গতিই নমনীয় লীলায় সুন্দর। তাঁর নৃত্যচিত্রগুলি গভীর রেখায় চমৎকার।'

উদয়শংকর কোনো সম্প্রদায় নিয়ে কলকাতায় আসেননি। এমনকি তাঁর প্রধান নৃত্যসঙ্গিনী সিমকিও তখন ছিলেন ইউরোপে। সুতরাং একক নৃত্য ছাড়া আর কিছু দেখাবার উপায় তাঁর ছিল না। তার উপরেও ছিল আর এক মস্ত অসুবিধা। নাচের সঙ্গে চাই বাজনার সঙ্গত। ঐকতানের ব্যবস্থা হবে কেমন করে?

হাতে সময় নেই, ঐকতানের ব্যবস্থা হল না। কোনোরকমে সে অভাব পূরণ করবার জন্যে গ্রেপ্তার করে আনা হল স্বর্গীয় কুমার গোপিকারমণ রায়ের বিদ্যাবতী, কলাবতী ও রূপবতী কন্যা (তিনিও ছিলেন নৃত্যগীতপটীয়সী) স্বর্গীয়া গৌরী দেবীকে। নাচের সঙ্গে তিনি বাজাবেন পিয়ানো।

১৩৩৭ খ্রিস্টাব্দের আষাঢ় মাসের তেইশে তারিখে প্রাচ্য-কলা-সংসদের হলঘরটি বিশিষ্ট ও বিদগ্ধ স্ত্রী-পুরুষের জনতায় পরিপূর্ণ হয়ে গেল। সকলেরই মুখে আগ্রহ ও কৌতূহলের চিহ্ন। তাঁরা থিয়েটারে পুরুষদের সঙের নাচ দেখেছেন, তার সঙ্গে এ নাচের পার্থক্য হবে কীরকম?

না আছে রঙ্গমঞ্চ, না আছে ঐকতান, না আছে নৃত্যসঙ্গী এবং না আছে আলোকপাতের ব্যবস্থা। কিন্তু একটিমাত্র পিয়ানোর তালে তালে একটিমাত্র শিল্পী সেদিন আসর রাখলেন যে বিচিত্র কৌশলে, সকলেরই কাছে তা ছিল ধারণাতীত। সেইদিনই বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল, নৃত্য হচ্ছে একটি স্বাধীন আর্ট, তা দৃশ্যপট, আলোকপাত বা ঐকতানের মুখাপেক্ষা করে না। রুশীয় ব্যালের দেখাদেখি আজকাল ইউরোপীয় নৃত্যেও দৃশ্যপট এবং ঐকতান প্রভৃতির বাড়াবাড়ি হয়েছে বটে, কিন্তু রুশীয় নৃত্যনাট্যসম্প্রদায় যাঁরা গঠন করেছিলেন, তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল একাধারে তিনটি আর্টের (নৃত্য, সঙ্গীত ও চিত্র) সম্মিলন দেখানো।

কলকাতায় তখনও কেউ মণিপুরি ও কথাকলি প্রভৃতি নাচ দেখেনি। উত্তর-ভারতীয় পুরুষদের কথক নাচ দেখবার সুযোগ কারুর কারুর হয়েছিল বটে, কিন্তু নানা কারণে তা শিক্ষিত বাঙালিদের আকৃষ্ট করত না। কথক নাচে উচ্চতর পরিকল্পনা ও ভঙ্গি-বৈচিত্র্য নেই, তার মধ্যে যথেষ্ট কাব্যরস ও নাটকীয় ক্রিয়ার অভাব এবং তা আধুনিক যুগের উপযোগীও নয়।

কথক নাচে যা ছিল না, তাই পাওয়া গেল উদয়শংকরের নাচে। জটিল তবলার বোলের সঙ্গে প্রাণপণে নূপুরের ধ্বনি মেলাবার জন্যে তিনি গলদঘর্ম হবার চেষ্টা করলেন না, অবলীলাক্রমে ধারাবাহিকভাবে নূপুর-গুঞ্জনের ছন্দে ছন্দে গতিশীল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা নয়নাভিরাম ভঙ্গির রেখায় রেখায় প্রকাশ

করে গেলেন সুপরিকল্পিত নৃত্যনাট্যের কাহিনি। যেমন অপূর্ব তাঁর নমনীয় দেহ, তেমনি আশ্চর্য তাঁর লীলায়িত বাহু—কাঁধ থেকে আঙুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত বইতে থাকে যেন অপরূপ রূপের তরঙ্গ, এমন বাহু নাচের আসরে আর কখনও দেখা যায়নি।

সেদিন তিনি দেখিয়েছিলেন ইন্দ্র নৃত্য, গন্ধর্ব নৃত্য ও তাণ্ডব নৃত্য প্রভৃতি। সকলের চোখের সামনে তারাও এনে দিলে অভাবিত বিস্ময়। মনে হল যেন অজন্তা ও ইলোরার চিত্র ও ভাস্কর্যের ভিতর থেকে জীবনলাভ করে আত্মপ্রকাশ করছে পৌরাণিক যুগের দেবতাদের মূর্তিগুলি।

উদয়শংকর যখন নৃত্যশিল্পীরূপে এদেশে পদার্পণ করেননি, তখনই আমি মৎসম্পাদিত 'নাচঘর' পত্রিকায় (২৬ বৈশাখ, ১৩৩১) বলেছিলুম: 'পাশ্চাত্য দেশে গ্রিস, রোম ও মিশরের প্রাচীন মন্দিরাদিতে ক্ষোদিত ভাস্কর্য দেখে পুরাতন নাচের ভঙ্গিগুলিকে আবার বাঁচিয়ে তোলা হয়েছে। আমাদের দেশেও তো উপাদানের অভাব নেই, তবে সে চেষ্টা হয় না কেন? আমাদের হাতের কাছে কেবল উৎকলের মন্দিরগাত্রের মূর্তিগুলি দেখলেই যে কতরকম চমৎকার নাচের ভঙ্গি পাওয়া যায়, তা আর বলবার নয়। যদি কোনো নৃত্যশিক্ষক রঙ্গালয়ে সেই সব ভঙ্গি কাজে লাগাতে পারেন, তবে দু-দিনেই তিনি বিখ্যাত হয়ে উঠবেন। ...আসল কথা আমাদের রঙ্গালয়ের নৃত্যশিক্ষকদের শিক্ষাই এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। রঙ্গালয়ে কার্য গ্রহণ করবার আগে তাঁদের উচিত, ভারতের নানা প্রদেশে গিয়ে নানা ভঙ্গির নৃত্যপদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করা। প্রাচীন মন্দিরাদির ভাস্কর্য থেকেও সাহায্য গ্রহণ না করলে চলবে না।'

আমাদের কথা পরিণত হয়েছিল অরণ্যে রোদনে। পরে 'সীতা' নাট্যাভিনয়ের সময়ে আমরা নিজেরাই ওই পদ্ধতিতে নৃত্য পরিকল্পনা করবার সুযোগ পাই। আমার রচিত 'মঞ্জুল মঞ্জুরী নব সাজে' গানের সঙ্গে যে নাচটি ছিল, তা পরিকল্পিত হয় অজন্তা ও ইলোরার চিত্রে ও ভাস্কর্যে লিখিত মূর্তির বিশেষ ভঙ্গিমা অবলম্বন করে। বাংলা নাচে এদিক দিয়ে সেই হয়েছিল প্রথম প্রচেষ্টা।

এই নূতন পদ্ধতিতে আধুনিক ভারতীয় নৃত্য পরিকল্পনার সময়ে উদয়শংকরের সামনে ছিল কার আদর্শ? তিনি বেশ কিছুকাল ধরে আনা পাবলোভার নৃত্য-সম্প্রদায়ে কাজ করেছিলেন। পাবলোভা যখন ভারতবর্ষে আসেন, তখন এখানকার প্রাচীন মন্দির শিল্পের দিকে অত্যন্ত আকৃষ্ট হন। এবং তারই ফলে তাঁর 'অজন্তার ফ্রেস্কো' প্রভৃতি ভারতীয় নৃত্যের জন্ম। আমার অনুমান সত্য কি না জানি না, তবে হয়তো পাবলোভারই প্রভাব পড়েছিল উদয়শংকরের পরিকল্পনার উপরে।

উদয়শংকরের দৃশ্যসংগীত

উদয়শংকর প্রথম যেদিন আমার সঙ্গে আলাপ করতে আসেন সেদিন তাঁর মুখেই শুনেছিলুম, ইউরোপে থাকতে একাধিক ভারতীয় রাজা-মহারাজা তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, স্বদেশে ফিরে এলে তাঁরা তাঁকে সাহায্য করতে ত্রুটি করবেন না।

কিন্তু কাজে পরিণত হয়নি তাঁদের মুখের কথা। স্বদেশে প্রত্যাগমন করে উদয়শংকর কোনো রাজা-মহারাজাকেই লাভ করেননি পৃষ্ঠপোষকরূপে। কিন্তু কাঞ্চনকৌলীন্যগর্বিত খেতাবি ধনিকের পরিবর্তে যে মনস্বী শিল্পাচার্য এই তরুণ শিল্পীর সহায়করূপে এগিয়ে এলেন, তথাকথিত কোনো রাজা-মহারাজার সাহায্যই তার চেয়ে ফলদায়ী হত না। প্রাচ্যকলা-সংসদে প্রথম দিন যাঁরা আমন্ত্রিত হয়ে নাচ দেখতে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন সাহিত্যে, ললিতকলায় ও সংস্কৃতির জন্যে বিখ্যাত বহু ব্যক্তি। তাঁরা সকলেই উদয়শংকরের অভাবিত নৃত্য-নৈপুণ্য দেখে যখন একবাক্যে মৌখিক অভিনন্দন দান করলেন, তখনই ভবিষ্যতের জন্যে আমাদের মনে রইল না আর অণুমাত্র সন্দেহ।

বাংলার প্রথম ও প্রধান 'ইম্প্রেসারিও' হরেন ঘোষও তখন ভরসায় বুক বেঁধে মাসখানেক পরে নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে উদয়শংকরের নাচ দেখাবার ব্যবস্থা করলেন। সেবারেও উদয়শংকর একা এবং তিনি উচিতমতো ঐকতানের সাহায্যও পেলেন না। মি. ফ্রাঙ্গোপোলোর নেতৃত্বে যে বিলাতি অর্কেস্ট্রা বেজেছিল, তা আহত করেছিল ভারতীয় নৃত্যের ছন্দকে। কেবল একটি নাচে শোনা গিয়েছিল শ্রীতিমিরবরণের দেশীয় ঐকতান এবং সেইজন্যেই তার সার্থকতাও হয়েছিল নিখুঁত।

প্রেক্ষাগৃহে দেখলুম বৃহতী জনতা এবং শুনলুম টিকিট না পেয়ে ফিরে গিয়েছেও শত শত লোক। বুঝলুম প্রাচ্যকলা-সংসদে অনুষ্ঠিত অপূর্ব নৃত্য-প্রদর্শনীর খ্যাতি এর মধ্যেই শহরের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে; নইলে বাংলা দেশের অনভ্যস্ত দর্শকরা একটিমাত্র অপরিচিত পুরুষ-নর্তকের নাচ দেখবার জন্যে কখনোই এমন বিপুল আগ্রহ প্রকাশ করত না।

এবং একাই সকলকে অভিভূত করলেন উদয়শংকর। প্রথমেই তিনি 'technique and rhythm of the body-movements'—দেখিয়ে দর্শকদের চমৎকৃত করে দিলেন। সকলে অবাক হয়ে দেখলেন, ভালো নাচতে হলে দেহের ও মাংসপেশির উপরে নর্তকের কতখানি প্রভুত্ব থাকা দরকার! তাঁর আঙুলের, বাহুর, গ্রীবার ও

কটিদেশের নমনীয়তা অত্যন্ত বিস্ময়কর—না দেখলে বিশ্বাস করাই অসম্ভব। ইচ্ছা করলেই দেহের বিশেষ কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাংসপেশির ভিতর দিয়ে তিনি যেন ছন্দের স্রোত প্রবাহিত করতে পারেন, অত্যন্ত অবহেলায়।

তারপর শুরু হল তাঁর নাচ—কখনও ইন্দ্র সেজে, কখনও গন্ধর্ব সেজে, কখনও শিব সেজে। তিনি দেখালেন ছোরা-নাচ ও অসিনৃত্য। আবার নারী সেজে লাস্যলীলাতেও সকলের মনকে মাতিয়ে তুললেন। সে রকম নাচ বাঙালির চোখ তার আগে আর কখনও দেখেনি। তারপর জনসাধারণের মধ্যে উদয়শংকরকে দেখবার আগ্রহ এতটা বেড়ে উঠল যে, পরে আরও দুই দিন পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে নাচ দেখাবার আয়োজন করতে হল।

তারপরের কথা আর বিস্তৃতভাবে বর্ণনা না করলেও চলবে। কিছুকাল পরে উদয়শংকর যখন সম্প্রদায় গঠন করে রীতিমতো প্রস্তুত হয়ে আবার কলকাতায় আত্মপ্রকাশ করলেন, তখন ভাবীকালের জন্যে ভারতীয় নৃত্যকলার আসরে নির্দিষ্ট হয়ে গেল তাঁর চিরস্থায়ী আসন। তাঁর সম্মান দেখে নৃত্যভীত বাঙালির ছেলেরা সাহস সঞ্চয় করে দলে দলে যোগ দিতে লাগল নাচের আসরে। উদয়শংকর না থাকলে এটা সম্ভবপর হত না। তিনি আগে পৃথিবী জয় করে দেশে ফিরেছেন বলেই বাংলার নৃত্যকলাকে এত সহজে জাতীয় করে তুলতে পেরেছেন।

তার আর্ট ঠুনকো নয়। নাচকে আগে এখানে সাধারণত লঘু বা চটুল বলেই মনে করা হত। উদয়শংকর কিন্তু একাধিক স্মরণীয় নৃত্যনাট্য রচনা করে আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন, জীবনের গুরুতর সমস্যাগুলিও নাচের ছন্দের ভিতর দিয়ে ফুটিয়ে তোলা যায় এবং প্রকাশ করা যায় একটা সমগ্র জাতির আশা ও আকাঙ্ক্ষা। সে সব আসরে হালকা মন নিয়ে হাজির হলে দর্শকদেরও হতে হবে উপভোগ থেকে বঞ্চিত। তাঁর এই শ্রেণির কোনো কোনো নাচে দেখা যায় রুশীয় ব্যালের অল্পবিস্তর প্রভাব। কিন্তু এটা নিন্দনীয় নয়। আর্টের ক্ষেত্রে এমন লেনদেনের প্রথা চিরকালই প্রচলিত আছে। বাংলা সাহিত্যের সর্বত্রই দেখা যায় ইউরোপীয় প্রভাব। কিন্তু সেজন্যে বাংলার সাহিত্য হয়ে ওঠেনি ইউরোপের সাহিত্য। পাশ্চাত্য চিত্রকলার উপরে পড়েছে জাপানি, মিশরীয়—এমনকি অসভ্য কাফ্রিদেরও শিল্পের প্রভাব। তবু পাশ্চাত্য আর্ট হারিয়ে ফেলেনি নিজের জাত।

উদয়শংকরের জনপ্রিয়তার মূলে আছে আরও কোনো কোনো কারণ। তিনি দেশ-বিদেশের নাচের সঙ্গে সুপরিচিত হবার জন্যে ব্যয় করেছেন বহু সময়, বহু পরিশ্রম। নিজে ক্লাসিকাল নৃত্য যে জানেন, সে কথা বলাই বাহুল্য। দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্যাচার্য শংকরম নম্বুদিরির কাছে গিয়ে মুদ্রাপ্রধান 'কথাকলি' নাচও

শিক্ষা করেছেন। ইউরোপে বাস করে ও রুশ নৃত্যসম্প্রদায়ে যোগ দিয়ে তিনি যে ইউরোপীয় নাচের বিশেষত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছেন, এটুকুও অনুমান করা যায় অনায়াসে। কিন্তু কোনো বিশেষ পদ্ধতিই তাঁর সক্রিয় মস্তিষ্ক ও স্বকীয় পরিকল্পনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারেনি। যখনই দরকার মনে করেছেন তখনই তিনি যেখান থেকে খুশি তিল তিল সৌন্দর্য আহরণ করে গড়ে তুলতে চেয়েছেন আপন পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পূর্ণ নূতন এক তিলোত্তমাকে।

নৃত্যপ্রধান চলচ্চিত্র 'কল্পনা' দেখিয়ে তিনি তাঁর মুনশিয়ানার আর এক পরিচয় দিয়েছেন। এই ছবিতে তিনি দেখাতে চেয়েছেন শিল্পীর উদ্ভট কল্পনাবিলাস, ইংরেজিতে যাকে বলে 'ফ্যান্টাসি'। ও বস্তুটির প্রকৃত অর্থ এদেশের অনেকেই জানে না, তাই ছবিখানির আখ্যানভাগের আসল মর্ম হয়তো অনেকের কাছেই স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। কিন্তু পাশ্চাত্য সাহিত্যে ও ললিতকলায় আছে 'ফ্যান্টাসি'র বহু স্মরণীয় উদাহরণ। 'কল্পনা'কে একাধারে 'ফ্যান্টাসি' ও 'ডকুমেন্টারি' ছবির শ্রেষ্ঠ উদাহরণরূপে গ্রহণ করা যায়, কারণ তার মধ্যে আছে আজব কল্পনার খেলার সঙ্গে ভারতীয় নৃত্যের অজস্র নমুনা। ধরতে গেলে প্রধানতঃ নানা শ্রেণির নাচ দেখাবার জন্যেই কল্পনাকে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে পটভূমির মতো। ছবিখানি কেবল এদেশেই নয়, পৃথিবীর নানা দেশের সমালোচকদের কাছ থেকে প্রশস্তি অর্জন করতে পেরেছে।

উদয়শংকরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, চিত্রপরিচালনার অভিজ্ঞতা আপনি কোথা থেকে সঞ্চয় করলেন? উত্তরে তিনি এ দেশের অধিকাংশ হামবড়া চিত্রপরিচালকের মতো ফাঁকা বুলির ঝুলি না ঝেড়ে, নিজের স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ের সঙ্গে অম্লানবদনে বলেছিলেন, 'চিত্রপরিচালনার কোনো অভিজ্ঞতাই আমার ছিল না।'

তবু ছবি হিসাবে কল্পনা এমন উতরে গেল কেন? তথাকথিত বাঙালি পরিচালকদের মতো উদয়শংকরও পাশ্চাত্য ছবির বাজার থেকে পরিকল্পনা সংগ্রহ করেননি বা ব্যক্তিগত বদখেয়াল মেটাবার জন্যে যা খুশি তাই দেখাতে চাননি। একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনাকে পরিপূর্ণ করে তোলবার জন্যে তিনি স্বাধীনভাবেই মস্তিষ্ক চালনা করেছেন এবং এমন নিপুণভাবে কাজে লাগিয়েছেন নিজের সহজ বুদ্ধিকে যে কোথাও হয়নি আধিক্যেতা বা ছন্দপাত।

নাচের আসরে তিনি প্রমাণিত করেছেন আর একটি সত্য। এদেশি নৃত্যধুরন্ধররা যখন প্রাচীন বা প্রাদেশিক নানা শ্রেণির নাচ নিয়ে খুব খানিকটা ধোঁয়াভরা বড়ো বড়ো কথার ফানুস ওড়াতে ও তর্কাতর্কি করতে নিযুক্ত ছিলেন, উদয়শংকর

তখন মানুষের সত্যকার হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করবার জন্যে লোকনৃত্যের সাহায্যে রচনা করতে লাগলেন দৃশ্যকাব্যের পর দৃশ্যকাব্য। নাচের ওস্তাদরা যে সব লোকনৃত্যের আভিজাত্য স্বীকার করতে নারাজ, উদয়শংকরের নৃত্য-প্রতিভায় সেইগুলিই হয়ে উঠেছে বিদগ্ধজনের উপযোগী, বেগবান, বলিষ্ঠ ও বিচিত্র জীবনের উৎস এবং রূপে, রসে, বর্ণে ও দৃশ্যসংগীতে অনুপম। কে বলতে পারে এই লোকনৃত্যের গতি ও ছন্দের ভিতর থেকেই আত্মপ্রকাশ করবে না ভবিষ্যতের ভারতীয় প্রধান নৃত্য?

কিন্তু দক্ষিণ ভারতের একাধিক নৃত্যবাচস্পতি বাঙালি উদয়শংকরের প্রতিভাকে স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। শিল্প-সমালোচক শ্রীভেঙ্কটাচলমের মতে, 'কথাকলি ও ভারতনাট্যমের শিল্পীদের কাছে উদয়শংকর হচ্ছেন শিক্ষার্থী ও শৌখিন (নভিস অ্যান্ড অ্যামেচার) মাত্র।'

যিনি বাল্যকাল থেকে একান্তভাবে নৃত্যসাধনা করে আজ অর্ধশতাব্দী পার হয়ে এসেছেন এবং যিনি ভারতের এবং ইউরোপ-আমেরিকার দেশে দেশে লাভ করেছেন অতুলনীয় অভিনন্দন, তিনিই নাকি 'শিক্ষার্থী ও শৌখিন'! এর চেয়ে অতিবাদ শোনা যায় না।

কিন্তু কেন? উদয়শংকরের আর্ট জটিল, দুর্বোধ ও কষ্টসাধ্য নয় বলে? আমরা এতদিন জানতুম, যে আর্ট নিজের কৃত্রিমতা ও জটিলতা গোপন করে সহজ, স্বাভাবিক ও সুবোধ্য হয়ে উঠতে পারে, তাকেই যথার্থভাবে বলা চলে উচ্চশ্রেণির। প্যাঁচালো কায়দা দেখিয়ে গলদঘর্ম হওয়াই প্রকৃত শিল্পীর লক্ষণ নয়। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৃত্যগুরুর কাছে উদয়শংকর কথাকলি নৃত্য শিক্ষা করেছেন, কিন্তু কথাকলির অতিরিক্ত মুদ্রাপ্রাধান্যকে আমল দিয়ে নিজের আর্টের বা নাচের সরলতা ক্ষুণ্ণ করতে চাননি। বর্তমান যুগে যিনি মধ্যযুগের ফতোয়া প্রতি পদে মাথা পেতে মেনে নেবেন, তাঁর মনীষা ও সার্থকতা আমি স্বীকার করতে নারাজ।

হরেন ঘোষ ও উদয়শংকরের আমন্ত্রণে একটি ঘরোয়া বৈঠকে অতুলনীয়া নর্তকী বালাসরস্বতীর নাচ দেখবার সুযোগ পেয়েছিলুম। সেই জটিল নাচে শ্রীমতীর অপূর্ব কৃতিত্ব দেখে বিস্মিত হলুম। কেবল কি তাই? ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে সেই বহুশ্রমসাধ্য কঠিন ও প্যাঁচালো নাচে তিনি একাই যে শক্তি জাহির করলেন, তা অভাবিত বললেও অত্যুক্তি হবে না।

উদয়শংকর আমার পাশেই বসেছিলেন। তিনি নিজের স্বভাবসিদ্ধ বিনয় প্রকাশ করে বললেন, 'দাদা, চেষ্টা করলেও আমি একা এতক্ষণ ধরে এমন কঠিন নাচ নাচতে পারতুম না।'

তিনি যে চেষ্টা করলে পারতেন না, এ কথা বিশ্বাস করি না। কিন্তু তিনি সে চেষ্টা করেননি বলে ভগবানকে ধন্যবাদ দি। কারণ সে চেষ্টায় সফলতা অর্জন করে তিনি প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যকলার অন্যতম প্রধান শিল্পী বলে পরিচিত হলেও যুগান্তকারী প্রতিভাধর স্রষ্টা বলে স্বীকৃত এবং সার্বজাগতিক আসরে নেমে এমনভাবে অভিনন্দিত হতে পারতেন না।

সহধর্মিণীরূপেও তিনি নির্বাচন করেছেন আর এক অনুপম নৃত্যশিল্পীকে— শ্রীমতী অমলা দেবী। এমন অপূর্ব মিলন দেখা যায় না, রাজযোটকও বলা চলে।

এক নাচের আসরে উদয়শংকরকে বলেছিলুম, 'অমলা দেবীকে সহনর্তকীরূপে পাবার পর থেকে আপনার সম্প্রদায়ে বিশেষভাবে হাসির আবির্ভাব হয়েছে।'

অমলা দেবী হাসতে হাসতে বললেন, 'তাতে কোনো দোষ হয়েছে কি?'

আমি বললুম, 'নিশ্চয়ই নয়! আগেও এ দলের মেয়েরা নাচতেন যথেষ্ট, কিন্তু তাঁদের হাসি ছিল না পর্যাপ্ত।'

নৃত্য যেখানে আনন্দের উচ্ছ্বাস, মন চায় সেখানে হাসির শোভন প্রাচুর্য।

চন্দ্রাবতী

বেশ কিছুকাল আগেকার কথা। সুকিয়া স্ট্রিট অঞ্চলের একটি গলিতে এক সাহিত্যিক বন্ধুর বাড়িতে বসে গল্প করছিলুম। হঠাৎ সামনের বাড়িতে দেখলুম দুটি সুন্দরী তরুণীকে। বন্ধুর কাছে মেয়ে দুটির পরিচয় জানতে চাইলুম।

বন্ধু বললেন, 'বড়োটির নাম কঙ্কাবতী, ছোটোটির নাম চন্দ্রাবতী। মেয়ে দুটি কেবল রূপসী নয়, বিদূষীও।'

তার কিছুকাল পরে কঙ্কাবতীর দেখা পেলুম 'নাট্যমন্দিরে'। তাঁর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হল। দেখলুম, এম এ পড়তে পড়তে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর জ্ঞানার্জনের স্পৃহা কিছুমাত্র কমেনি। অবসর পেলেই ইংরেজি ও বাংলা নানা শ্রেণির পুস্তক নিয়ে নিযুক্ত হয়ে থাকেন।

কঙ্কাবতী অল্পদিনের মধ্যেই অভিনেত্রী ও সুগায়িকা বলে নাট্যজগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। কিন্তু বহুকাল পর্যন্ত চন্দ্রাবতী থেকে যান লোকের চোখের আড়ালে, তাঁর মধ্যেও যে উপ্ত আছে নাট্যবীজ, কেউ করতে পারেনি এ সন্দেহ। বৃথাই নষ্ট করেছেন তিনি জীবনের কয়েকটি মূল্যবান বৎসর।

রাধা ফিল্ম 'দক্ষযজ্ঞ' ছবি তুলেছেন কত বৎসর আগে? ঠিক মনে পড়ছে না, উনিশ-কুড়ি বৎসর হবে হয়তো। আমার উপরে পড়েছিল গান রচনার,

চিত্রনাট্যে পরিবর্তন, পরিবর্জন ও পরিবর্ধনের এবং নৃত্য পরিকল্পনার ভার। দৃশ্য-সংস্থাপককেও সাহায্য করেছিলুম অল্পবিস্তর।

চন্দ্রাবতী নির্বাচিত হলেন সতীর ভূমিকার জন্যে। স্টুডিয়োয় তাঁর সঙ্গে প্রথম মৌখিক আলাপ হল। বেশ ধীর, স্থির, শান্ত, নম্র মেয়েটি। মহলা দেখে বুঝলুম। তাঁর মধ্যে আছে যথেষ্ট সম্ভাবনা। গানের গলাও ভালো।

মেয়েদের নাচ শেখাতে শুরু করেছি, এমন সময়ে চন্দ্রাবতী বললেন, 'হেমেন্দ্রবাবু, সতী কি নাচতে পারেন?'

—'কেন পারবেন না?'

—'তাহলে আমিও নাচতে চাই।'

—'বেশ তো, সে ব্যবস্থাও হবে।'

কিন্তু সে যাত্রা চন্দ্রাবতীকেও নাচতে হয়নি, আমাকেও নৃত্য পরিকল্পনা শুরু করেই ক্ষান্ত হতে হয়েছিল। কারণ বলি।

তার আগে চন্দ্রাবতী কোনো দিন নাচেননি। কিন্তু সেজন্যে ছিল না আমার কিছুমাত্র দুশ্চিন্তা। কারণ একাধিক নৃত্যে অনভিজ্ঞা তরুণীকে অল্পদিনের ভিতরেই আমি নাচে পোক্ত (অন্তত কাজ চালাবার উপযোগী) করে তুলতে পেরেছি। কিন্তু গোল বাধল অন্য কারণে।

আমার পরিকল্পনা অনুসারে চন্দ্রাবতী নাচ অভ্যাস করলেন দুই কি তিন দিন। তার পরেই বেঁকে বসে বললেন, 'ও নাচ-টাচ আমার দ্বারা হবে না।'

আমি বললুম, 'ব্যাপার কী?'

চন্দ্রাবতী বললেন, 'নাচলে যে গায়ে এত ব্যথা হয়, আমি তা জানতুম না। উঃ, আমার সর্বাঙ্গ ফোড়ার মতো টাটিয়ে উঠেছে। বাবা, আমার আর নাচ শিখে কাজ নেই।'

চন্দ্রাবতী পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন, আমাকেও দিতে হল অন্য কারণে।

প্রাচীন ভাস্কর্য থেকে আদর্শ সংগ্রহ করে আমি সতীর কবরীর জন্যে করেছিলুম একটি বিশেষ পরিকল্পনা। কিন্তু স্টুডিয়োর বেশকার সে রকম কেশবিন্যাসে অভ্যস্ত ছিল না, সে চেষ্টা করেও শেষটা নিজের অক্ষমতা জানাতে বাধ্য হল। অগত্যা আমাকেই উপস্থিত থাকতে হল সাজঘরে এবং আমার ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে বেশকার অবশেষে বহুক্ষণের পর সেই বিশেষ ধরনের কবরীটি রচনা করতে পারলে। সে ধাঁচে খোঁপা বেঁধে চন্দ্রাবতীকে দেখাচ্ছিল চমৎকার।

ছবি তোলার সময়ে সেটে গিয়ে দেখি, সতীর মাথায় ঘোমটা, আমাদের এত যত্নশ্রমে বাঁধা কবরী অদৃশ্য!

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'সতীর মাথায় কাপড় কেন?'

স্টুডিয়োর অধ্যক্ষ মুরুব্বির মতো বললেন, 'হিন্দুর মেয়ে, মাথায় ঘোমটা থাকবে না?'

আমি বললুম, 'সতী হচ্ছেন হিমালয়কন্যা, সেখানকার মেয়েরা আজও মাথায় ঘোমটা দেয় না।'

ভদ্রলোক তবু নিজের গোঁ ছাড়তে নারাজ। তাঁর অজ্ঞতা দেখে আমারও মেজাজ গেল বিগড়ে। তৎক্ষণাৎ স্টুডিয়ো ছেড়ে চলে এলুম। আর ওদিক মাড়াইনি।

'দক্ষযজ্ঞ' পালাটি অত্যন্ত লোকপ্রিয় হয়ে ছবির মালিকের ঘরে আনলে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা এবং সেই সময় থেকে চিত্রাভিনেত্রীরূপে চন্দ্রাবতীর আসন হয়ে গেল সুপ্রতিষ্ঠিত।

কিছুকাল পরে আবার চন্দ্রাবতীর সংস্রবে আসতে হল। এক ভদ্রলোক খুব ফলাও করে নূতন একটি চিত্রপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবেন বলে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে প্রকাণ্ড এক বাগান ভাড়া নিয়ে বসলেন, আজ পর্যন্ত আর কোনো চিত্র-সম্প্রদায় অতবড়ো বাগান বা জমির অধিকারী হতে পারেননি। স্টুডিয়ো নির্মাণের কাজও শুরু হয়ে গেল। ছবির জন্যে নির্বাচিত হল মৎপ্রণীত 'ঝড়ের যাত্রী' উপন্যাস। চন্দ্রাবতীকে দেওয়া হল নায়িকার ভূমিকা এবং পরিচালনার ভার গ্রহণ করলেন শ্রীহেমচন্দ্র চন্দ্র। একে একে অন্যান্য শিল্পীরাও নির্বাচিত হতে লাগলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত অভিনেতা স্বর্গীয় রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়ও। আমরা প্রায়ই সবাই মিলে সেখানে গিয়ে করতুম প্রভূত জল্পনা-কল্পনা। নিমন্ত্রিতদের এনে ভূরিভোজনের ব্যবস্থাও যে হয়নি, এমন মনে করবেন না। কিন্তু গর্জন হল বিস্তর, বর্ষণ হল সামান্য। মালিক ছিলেন ভিতর-ফোঁপরা, দু-দিনেই কাবু হয়ে পড়লেন। নিজস্ব স্টুডিয়ো নির্মাণের কাজ বন্ধ হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত অরোরা ফিল্ম স্টুডিয়োতে ছবি তোলা হতে লাগল বটে, কিন্তু ছবির কাজ শেষ হবার আগেই মালিক হলেন একেবারে ফতুর। সেই অসমাপ্ত ছবিখানি আজও অরোরা ফিল্মের গুদামঘরে বন্দি হয়ে আছে। 'অরোরা'র স্বত্বাধিকারী স্বর্গীয় বন্ধুবর অনাদিনাথ বসু আমাকে ছবিখানার জন্যে একটা ব্যবস্থা করতে বলেছিলেন, কিন্তু কোনো ব্যবস্থাই হয়নি। তাকে আজ আর কেউ কাজে লাগাতেও পারবেন না। কারণ নায়িকার ভূমিকায় চন্দ্রাবতীকে আর নামানো চলবে না, আজকের চন্দ্রাবতীর সঙ্গে আগেকার চন্দ্রাবতীর দৈহিক পার্থক্য আছে যথেষ্ট। অন্যান্য নট-নটীদের সম্বন্ধেও ওই কথা। কেউ কেউ গিয়েছেন পরলোকে। ছবি শেষ করতে হলে প্রেততত্ত্ববিদদের সাহায্যে তাঁদের পরলোক থেকে টেনে আনতে হয়।

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, 'ঝড়ের যাত্রী'র দুর্ভাগ্য ওইখানেই ফুরিয়ে যায়নি। আর-একজন প্রযোজক নূতন নূতন নট-নটীর সাহায্যে আবার ওই উপন্যাসখানির চিত্ররূপ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যাঁর অর্থানুকূল্যে ছবি তোলবার কথা, কয়েক হাজার টাকা উড়ে যাবার পর তাঁরও মন থেকে ছবি তৈরি করবার উৎসাহ উপে যায় কর্পূরের মতো।

তারপর চন্দ্রাবতী দেখা দিয়েছেন ছবির পর ছবিতে, সেগুলির সংখ্যার হিসাব রাখিনি। কখনও নবীনা এবং কখনও প্রবীণার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। তাঁর প্রত্যেক ভূমিকা দেখবার অবসর আমার হয়নি বটে, কিন্তু যতগুলি দেখেছি তার উপরে নির্ভর করেই চন্দ্রাবতীর কলানৈপুণ্য সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা করতে পেরেছি। তিনি সুন্দরী। কিন্তু কী সাধারণ রঙ্গালয়ে আর কী চিত্রজগতে কেবল দৈহিক সৌন্দর্যকে কোনো দিনই অভিনয়ের মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করা হয়নি। সুগঠিত তনু, সুশ্রী চেহারা ও মিষ্ট মুখ নিয়ে বহু তরুণীই পাদপ্রদীপের আলোকে বা ছবির পর্দায় দেখা দিয়েছেন, কিন্তু দর্শকদের চোখ ভুলিয়েও তাঁরা তাদের মনের উপর কিছুমাত্র রেখাপাত করতে পারেননি। বিশ্ববিখ্যাত ফরাসি অভিনেত্রী সারা বার্নাড এবং এ দেশের তারাসুন্দরী ও সুশীলাবালা সুন্দরী ছিলেন না মোটেই। পাশ্চাত্য দেশের খ্যাতনামা চিত্রতারকাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন যাঁরা কুরূপা না হলেও সুরূপা নন। তবে অভিনেত্রীরা যদি হন একসঙ্গে রূপসুন্দর ও গুণসুন্দর, তাহলে বেশি তাড়াতাড়ি তাঁরা প্রভাব বিস্তার করতে পারেন দর্শকদের হৃদয়ের উপরে। এ শ্রেণির অভিনেত্রী সুলভ নন। চন্দ্রাবতী হচ্ছেন এই শ্রেণির অভিনেত্রী। ভাবের অভিব্যক্তি দেখাবার বিস্ময়কর দক্ষতা অর্জন করেছেন তিনি। দিনে দিনে উন্নত হয়ে উঠেছে তাঁর কলানৈপুণ্য। বাংলা দেশের চিত্রাভিনেত্রীদের মধ্যে তাঁকে অতুলনীয়া বললেও অত্যুক্তি করা হবে না।

আমার নিজস্ব একটি মত আছে। এর সঙ্গে সকলেরই ঐকমত্য হবে, এমন আশা করি না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সাধারণ রঙ্গালয়ের অভিনয়ের চেয়ে চিত্রাভিনয় উচ্চশ্রেণির নয় এবং তার প্রধান কারণ হচ্ছে, ছবির অভিনয়ে নেই সেই ধারাবাহিকতা, যার প্রসাদে আর্ট হয়ে ওঠে পূর্ণাঙ্গ। রঙ্গালয়ের অভিনয়কলা প্রথমে মুকুলিত হয়ে তারপর ধীরে ধীরে পাপড়ি ছড়িয়ে একটি গোটা ফুল হয়ে ফুটে ওঠে অবশেষে। নিজেদের আর্টের সূচনা থেকে ধারাবাহিকভাবে চরম পরিণতি দেখাবার ভার গ্রহণ করতে হয় মঞ্চাভিনেতাদের, তার মধ্যে আকস্মিকতা বা খাপছাড়া কোনো কিছুই থাকতে পারে না।

কিন্তু চিত্রাভিনেতাদের কর্তব্য হচ্ছে অন্যরকম। আদ্য-মধ্য-অন্ত নিয়ে মাথা

ঘামাতে হয় না তাঁদের। গোড়াতেই তাঁরা হয়তো করেন শেষদিককার অভিনয়, আবার প্রথম অংশ দেখান হয়তো একেবারে সর্বশেষে এবং সবটাই তাঁদের দেখাতে হয় টুকরো টুকরো করে। হঠাৎ হাসবার বা কাঁদবার বা চলবার-ফেরবার নির্দেশ পেলে তাঁরা হাসেন বা কাঁদেন বা চলেন-ফেরেন। নিজেদের স্বাভাবিক ভাবের আবেগে বা অনুভূতি অনুসারে তাঁরা বেশি কিছু করতে পারেন না। অভিনেতাদের পক্ষে ছবির অভিনয় অনেকটা যেন পরের মুখে ঝাল খাওয়ার মতো। তাঁরা যেন পরিচালকের হাতে কলের পুতুল। দর্শকরা ছবির মধ্যে যে ধারাবাহিকতার রস পায়, তার ভালো মন্দ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে কেবল পরিচালকের ও সম্পাদকের কৃতিত্বের উপরে। চিত্রাভিনয়ের ভুলত্রুটি শিল্পীরা অনায়াসে শুধরে নিতে পারেন, খারাপ অংশ বাতিল করে দ্বিতীয়বার বা তৃতীয়বার বা যতবার খুশি ছবি তোলা যায়, নটনটীদের ভুলচুক দর্শকদের চোখে পড়ে না, এ সুবিধা মঞ্চাভিনেতার নেই। এমনি সব নানা কারণে নিছক চিত্রনটরা মঞ্চের উপরে গিয়ে দাঁড়ালে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজেদের অত্যন্ত অসহায় বলে মনে করেন এবং অনেকেই হয়তো অভিনয়ই করতে পারবেন না।

আমার বিশ্বাস, চন্দ্রাবতী এই শ্রেণির অভিনেত্রী নন, মঞ্চে নামলেও দিতে পারবেন নিজের গুণের পরিচয়। এবং এই ধারণা পোষণ করতেন অধুনালুপ্ত 'নাট্যভারতী'র সুযোগ্য কর্ণধার, বন্ধুবর শ্রীশিশিরকুমার মল্লিকও। শিশিরবাবু একদিন আমাকে একখানি নাটক লেখবার জন্যে অনুরোধ করে বললেন, প্রধান ভূমিকায় তিনি হয়তো চন্দ্রাবতীকে নামাতে পারবেন। শুনে আমি উৎসাহিত হয়ে একখানি গীতিবহুল নাটক রচনা করেছিলুম, নাম তার 'চোখের জল।' কিন্তু আমার চিত্রে রূপায়িত উপন্যাসের নায়িকার ভূমিকার মতো আমার নাটকের নায়িকার ভূমিকাতেও মঞ্চের উপরে তাঁকে দেখবার সুযোগ আর হল না। 'নাট্যভারতী' ভালোভাবেই চলছিল। কিন্তু বাড়ির মালিক রঙ্গালয়টিকে চিত্রগৃহে পরিণত করবেন বলে চলতি 'নাট্যভারতী'র অস্তিত্ব হল বিলুপ্ত, সেখানে আর আমার রচিত পালা খোলাও সম্ভব হল না। সেই অনভিনীত নাটকের পাণ্ডুলিপি শিশিরবাবুর কাছেই গচ্ছিত আছে। আমার হয়েছে পণ্ডশ্রম।

ব্যক্তিগত জীবনে চন্দ্রাবতী আমার কন্যার মতো। আমার বাড়িতে এসেছেন বহুবার। তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ করে আনন্দ পেয়েছি, উপভোগ্য তাঁর আচরণ। আগে পূর্ণিমার চাঁদনি রাতে মাঝে মাঝে তিনি আমার কাছে আসতেন, গঙ্গাজলে জ্যোৎস্নার খেলা দেখবার জন্যে। তাঁকে নিয়ে ত্রিতলের ছাদে গিয়ে বসতুম, তিনি খুশি কণ্ঠে বলতেন, 'কী চমৎকার জায়গায় আপনার বাড়ি!'

আমি বলতুম, 'চন্দ্রা, গান শোনাও।'

চন্দ্রাবতী গাইতেন—

'সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে
ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা।'

তটিনীর কলতানের সঙ্গে চন্দ্রাবতীর কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের কাব্যবাণী শুনতে শুনতে তাকিয়ে থাকতুম গঙ্গার বুকে উচ্ছলিত চন্দ্রাবলীর দিকে।

পরিচালক প্রবোধচন্দ্র গুহ

নট না হয়েও নাট্য-পরিচালনার দ্বারা অক্ষয় যশ অর্জন করা যায়। প্রমাণ, ইউরোপের রাইনহার্ড সাহেব। বাংলা দেশেও এই বিভাগে দুজন লোক প্রভূত খ্যাতি লাভ করেছেন। স্বর্গীয় মহেন্দ্রকুমার মিত্র ও শ্রীপ্রবোধচন্দ্র গুহ।

মিনার্ভা থিয়েটার গৌরবের উচ্চশিখরে উঠেছিল মহেন্দ্রকুমারের পরিচালনাগুণে। গিরিশচন্দ্রের শেষ বয়সের সমস্ত বিখ্যাত নাটকই (বলিদান, সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশিম, ছত্রপতি শিবাজি, শাস্তি কি শান্তি, শংকরাচার্য, অশোক, তপোবল ও গৃহলক্ষ্মী প্রভৃতি) মহেন্দ্রকুমারের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের দুর্গাদাস, নূরজাহান, সোরাব-রুস্তম, মেবার পতন, সাজাহান ও চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধেও ওই কথাই বলা যায়। সেই সময়েই দানীবাবুর নাট্যপ্রতিভা যতটা চরমে উঠতে পেরেছিল, আর কখনও তা পারেনি। গিরিশচন্দ্র যখন দানীবাবু এবং মিনার্ভার অধিকাংশ প্রখ্যাত শিল্পীদের নিয়ে কোহিনূর থিয়েটারে চলে যান, তখন সকলেই মনে করেছিলেন, অতঃপর মিনার্ভা থিয়েটারের পতন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু মহেন্দ্রকুমার পরিচালিত মিনার্ভার প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ হয়নি। এর থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাবে, কোনো রঙ্গালয়ের পক্ষে শ্রেষ্ঠ নাটক ও শ্রেষ্ঠ অভিনেতার মতো শ্রেষ্ঠ পরিচালকের প্রয়োজনীয়তাও কতখানি।

প্রবোধচন্দ্র রঙ্গালয়ের সংস্রব ত্যাগ করেছেন অনেক দিন আগেই, কিন্তু এখনও নাট্যজগতের সকলেরই মুখে মুখে ফেরে তাঁর নাম। মহেন্দ্রকুমারের মতো তিনিও নটও নন, নাট্যকারও নন। মহেন্দ্রকুমার ছিলেন হাইকোর্টের উকিল এবং তিনি ছিলেন ডাক-বিভাগের পদস্থ কর্মচারী। কিন্তু দুইজনেরই নাট্যানুরাগ ছিল এমন প্রবল যে, নাট্যজগতে প্রবেশ না করে থাকতে পারেননি এবং এই নাট্যানুরাগের ফলেই প্রবোধচন্দ্রকে শেষ পর্যন্ত সরকারি আপিসের সম্পর্ক পর্যন্ত

ত্যাগ করতে হয়েছিল। তারপর থেকে নাট্যসাধনাই হয়ে উঠেছিল তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত।

প্রথমে তিনি স্টার থিয়েটারে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতা করেন। তারপর হন আর্ট থিয়েটার লিমিটেডের অন্যতম প্রধান কর্মকর্তা। সেই সময়ে 'কর্ণার্জ্জুনে'র অভাবিত জনপ্রিয়তার জন্যে তিনি নিজেও দাবি করতে পারেন অনেকখানি প্রশংসাই। ১৩৩৬ সালে তিনি হন মনোমোহন থিয়েটারের মালিক ও পরিচালক। ওখানে তাঁর পরিচালনায় দুইখানি নাটক ('গৈরিক পতাকা' ও 'কারাগার') আশ্চর্য সাফল্য লাভ করে। তারপর তাঁর হাতেই গড়ে ওঠে নূতন রঙ্গালয় 'নাট্য-নিকেতন'। এখানেও বিক্রির দিক দিয়ে সবচেয়ে স্মরণীয় নাটক হচ্ছে শচীন্দ্রনাথের 'সিরাজদ্দৌলা', যার জনপ্রিয়তা গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা'কেও ছাড়িয়ে উঠেছে বললে অত্যুক্তি হবে না।

তাঁর কর্মকুশলতাকে অদ্ভুত বলা যেতেও পারে। এ সম্বন্ধে একটি গল্প শুনেছি। যখন তিনি আর্ট থিয়েটার ছেড়ে দিয়েছেন, তাঁর আর্থিক অবস্থা তখন ভালো ছিল না। একদিন তাঁর পকেটে আছে মাত্র কয়েক গন্ডা পয়সা, তিনি 'আজ একটা কিছু করব'ই বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে বেরিয়ে পড়েন। তারপর বাসায় যখন ফিরলেন, তখন তিনি মনোমোহন থিয়েটারের মালিক।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ। স্টার থিয়েটারে প্রায়ই অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে যেতুম। সেই সময়েই প্রবোধচন্দ্রের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। কিন্তু সে আলাপ তখনও বন্ধুত্বে পরিণত হয়নি। দেখতুম একটি সুশ্রী যুবককে, দুই হাত তাঁর কাজে জোড়া, মুখ কিন্তু মুখর। সর্বদাই কর্মে ব্যস্ত এবং কাজ করতে করতে সর্বদাই মিষ্টমুখে সকলের সঙ্গে গল্প করতে প্রস্তুত। লাট্টুর মতো সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু হাতেরও কামাই নেই, মুখেরও কামাই নেই। এই হলেন প্রবোধচন্দ্র। আজ বৃদ্ধ হয়েছেন বটে, কিন্তু স্বভাব তাঁর বদলায়নি। কর্মতৎপরতাও ক্ষুণ্ণ হয়নি। আলস্য তাঁকে আক্রমণ করতে পারে না। কাজ, কাজ, সর্বদাই কাজ চাই। একাই হতে চান একশো।

শিশিরকুমার নিজের সম্প্রদায় নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন। আমরাও সবান্ধবে যোগ দিলুম তাঁর সঙ্গে। ফলে স্টার থিয়েটারে আমাদের যাতায়াত প্রায় বন্ধ হয়ে গেল, কারণ ওখানকার আর্ট সম্প্রদায় প্রতিযোগী শিশির-সম্প্রদায়কে প্রীতির চক্ষে দেখতেন না। আমরা প্রকাশ করলুম সাপ্তাহিক 'নাচঘর' পত্রিকা, তার পাতায় থাকত শিশিরকুমারের গুণপনার পরিচয়। স্টার থিয়েটারের অনুগত ছিল আর-একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা, সে নিয়মিতভাবে আমাদের বিরুদ্ধে বিষোদগার

করত; এবং তাকে যে উৎসাহিত করতেন প্রবোধচন্দ্রই, মনে মনে আমি এই সন্দেহ পোষণ করতুম। কাজেই আমার মন যে তাঁর প্রতি অল্পবিস্তর বিরূপ হয়ে উঠেছিল, এ কথা অস্বীকার করব না।

তারপর কয়েক বৎসর কেটে যায়। কিছুদিনের জন্যে রঙ্গালয়ের একঘেয়ে প্রতিবেশ আর ভালো লাগে না, বাড়িতে একান্তে বসে সাহিত্যচর্চা করি। সেই সময়েই প্রবোধচন্দ্র নিয়েছেন মনোমোহন থিয়েটারের ভার।

এক সকালে বৈঠকখানায় বসে খবরের কাগজ পড়ছি, হঠাৎ কণ্ঠস্বর শুনলুম—'চলুন'।

মুখ তুলে দেখি, সামনে দাঁড়িয়ে আছে স্বর্গীয় অভিনেতা সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তার বালক বয়স থেকেই তাকে আমি চিনতুম। গোবরবাবুর আখড়ায় কুস্তি লড়ে বপুখানি তার বিপুল হয়ে ওঠে। তারপর কুস্তি ছেড়ে থিয়েটারে ঢোকে। বুদ্ধি কিছু মোটা, কতকটা গোঁয়ারগোবিন্দ মানুষ।

সতীশ আবার বললে, 'চলুন।'

আমি বললুম, 'চলুন মানে? কোথায় যাব?'

সতীশ বললে, 'মনোমোহন থিয়েটারে। আপনাকে নিয়ে যাবার জন্যে প্রবোধবাবু আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

বললুম, 'আমি যাব না। আমার আর থিয়েটার ভালো লাগে না।'

সতীশ চোখ পাকিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বললে, 'যাবেন না কী, আপনাকে যেতেই হবে। প্রবোধবাবু বলে দিয়েছেন, আপনি যেতে না চাইলে আপনাকে যেন কোলে করে তুলে নিয়ে আসা হয়।'

বুঝলুম ষণ্ডামার্কা সতীশের সঙ্গে বেশি কথা কাটাকাটি করে লাভ নেই। আমাকে কোলে তুলে নিতে তাকে একটুও বেগ পেতে হবে না এবং সে দৃশ্য হবে দশজনের পক্ষে যথেষ্ট হাস্যকর। অতএব গেলুম তার সঙ্গেই।

প্রবোধবাবুকে বললুম, 'আচ্ছা চ্যালাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন যা হোক, একেবারে নাছোড়বান্দা।'

তিনি হাসতে হাসতে বললেন, 'সতীশ যখন গিয়েছে, তখন যে তোমাকে আসতে হবেই, এ আমি জানতুম।'

—'কিন্তু ব্যাপার কী? হঠাৎ আমাকে স্মরণ করেছেন কেন?'

—'জানো তো, এখানকার ভার নিয়েছি আমি। উপর-উপরি দু-খানা বই খুলতে হবে—'জাহাঙ্গির' আর 'মহুয়া'। নজরুল গান লিখছে। তোমাকে দিতে হবে নাচ। 'না' বললে চলবে না।'

তাই হল। 'না' বলা চলল না। আবার থিয়েটার বাঁধলে মায়ার বাঁধনে। এ আনন্দের বটে, কিন্তু সাহিত্যচর্চার পক্ষে সুবিধাজনক নয়। আর্টের সেবা করছি বলে মনকে প্রবোধ দিয়েছি, কিন্তু ক্ষুণ্ণ হয়েছে সাহিত্যচর্চা।

তারই কয়েক বৎসর আগে শিশিরকুমারের অনুরোধে 'বসন্তলীলা', 'সীতা' ও 'হাসুনো হানা' পালার জন্যে কয়েকটি গান রচনা করেছিলুম বটে, কিন্তু তারপর অনেককাল পর্যন্ত থিয়েটারের জন্যে আর কোনো গান বাঁধিনি। কিন্তু এখন থেকে প্রবোধচন্দ্র আমার উপরে দিতে লাগলেন গানের পর গানের বরাত। যতদিন তিনি রঙ্গালয়ের সম্পর্কে ছিলেন, ততদিন ধরেই কত নাট্যকারের কত নাটকের জন্যে রাশি রাশি কত যে গান রচনা (এবং সেই সঙ্গে নৃত্য পরিকল্পনা) করেছি, সে হিসাব আর আমার মনে নেই। তবে এইটুকু অনায়াসেই বলতে পারি, নবযুগের আর কোনো কবিই রঙ্গালয়ের জন্যে আমার মতো এত বেশি গান রচনা করেননি।

ওই মনোমোহন থিয়েটার থেকেই প্রবোধচন্দ্রের সঙ্গে আমি অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ববন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি। অনেক দিনই দিবারাত্র একসঙ্গে কাটিয়ে দিয়েছি—একসঙ্গে কাজ করা, একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া, একসঙ্গে শোয়া-বসা। দুজনেই পরস্পরকে ভালো করে চিনতে পেরেছি। এবং ওই মনোমোহন থিয়েটারেই নাট্যপরিচালনায় তাঁর অদ্ভুত কৃতিত্বের সঙ্গে ভালো করে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছি। তিনি কেবল নাটক নির্বাচন করতেন না, তার পরিবর্তন, পরিবর্জন ও পরিবর্ধনেরও ভার গ্রহণ করতেন। তারপর দৃশ্যপট, সাজপোশাক ও মঞ্চসজ্জার পরিকল্পনা, আলোক-নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মিতভাবে মহলা দেবারও ভার থাকত তাঁর উপরে। নাচ, গান ও সুরের উপযোগিতার দিকেও থাকত তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। রঙ্গালয়ে তাবৎ ব্যাপার নিয়ে বিশেষরূপে মস্তিষ্কচালনা করতেন একমাত্র তিনিই। রঙ্গালয়ে একখানি পূর্ণাঙ্গ নাটক মঞ্চস্থ করবার জন্যে যে কী বিপুল পরিশ্রম ও চিন্তাশীলতার প্রয়োজন হয়, বাইরের কেউ তা কল্পনাতেও উপলব্ধি করতে পারবেন না। নট-নটী, দৃশ্য-পরিকল্পক, নৃত্যবিদ, গীতি-রচয়িতা, সুরশিল্পী, আলোকনিয়ন্তা ও নাট্যকার আপন আপন বিশেষ বিভাগ নিয়েই অবহিত হয়ে থাকেন বটে, কিন্তু একটি মূল ভাব ফুটিয়ে তোলবার জন্যে প্রত্যেককে অবিচ্ছিন্নভাবে একটি নির্দিষ্ট পরিণামের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গেলে পরিচালককে অনন্যসাধারণ সংগঠন-শক্তির পরিচয় দিতে হয়। ভাবুক, কবি, সমালোচক এবং বিভিন্ন শ্রেণির শিল্পীর বিশেষত্ব সম্বন্ধে অল্পবিস্তর জ্ঞান না থাকলে কেহই হতে পারেন না সার্থক পরিচালক। কেবল বাছা বাছা রসিকের নয়; তাঁকে রাখতে হয় জনসাধারণের মনের খবরও।

প্রবোধচন্দ্র সম্বন্ধে আগেই বলেছি, তিনি যেন একাই একশো। তাঁর অসাধারণ কর্মদক্ষতা ও শ্রমশক্তি দেখে বারংবার বিস্মিত না হয়ে পারিনি। নূতন নাটক প্রস্তুত করবার সময়ে দৈনন্দিন জীবনের অন্য কোনো কথাই তাঁর মনে থাকত না, স্নানাহার ভুলে তিনি একটানা কাজ করে যেতেন সতেরো-আঠারো ঘণ্টা ধরে। নিজেই কখনও তুলি ধরে দৃশ্যপটের উপরে বর্ণলেপনে নিযুক্ত হয়েছেন, কখনও কাঁচি ধরে সাজপোশাক তৈরি করেছেন, আবার সে সব ফেলে ছুটে গিয়েছেন মহলার আসরে, অভিনেতাদের নির্দেশ দিতে দিতে লক্ষ করেছেন নাটকের মধ্যে নূতন কী পরিবর্তনের দরকার, আবার আমার কাছে এসে নাচ দেখতে দেখতে জানিয়েছেন, আমি তাঁর মনের ভাব ধরতে পারিনি, নাচের কোন কোন অংশ বদলে দিলে ভালো হয় এবং তারপরেই হয়তো সুরকার বা আলোকনিয়ন্তাকে নিয়ে পড়েছেন। কাজের পরে কাজ, এক কাজের পরে আর এক কাজ, কিন্তু মুখে তবু শ্রান্তি বা বিরক্তির একটু লক্ষণ নেই, হাসতে হাসতে সকলকেই করছেন সাদর সম্ভাষণ; এবং এই কাজের ভিড়ের মধ্যে অন্য ব্যাপারও আছে—তাঁর কাছে যা আনন্দকর, কিন্তু আর কারুর পক্ষে উপসর্গ। সবাইকে নিজের হাতে রেঁধে খাওয়াতেও বড়ো ভালোবাসেন। কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে দৌড়ে চলে যাচ্ছেন রান্নাঘরের ভিতরে, সেখানে মস্ত হাঁড়ায় চড়েছে মাংস, খানিকক্ষণ হাতা নেড়ে আবার দ্রুতপদে ফিরে আসছেন নূতন কোনো কাজ করবার জন্যে। সত্য বলছি, এমন আমুদে কাজের মানুষ আমি আর দেখিনি।